বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ] অগ্রহায়ণ। [২য় সংখ্যা।

তুমি ও আমি।

চঞ্চলে! একবার স্থির হইয়া সম্মুখে দাঁড়াও দেখি। আমি তোমায় নয়ন ভরিয়া একবার দেখিব। তোমায় ভাল করিয়া—কখন দেখা হয় নাই। কবে—সুষুপ্ত অতীতের কোন্ অনির্দ্দেশ্য, অননুনেয় ক্ষুব্ধ মুহূর্ত্তে, অনন্তের কোন্ তমোময় নিভৃত কক্ষে, কি অদৃষ্ট উদ্দীপনায়—অজ্ঞাত সঙ্কেতে, হৃদয়-নিহিত জন্মান্তরীণ অসমাপ্ত প্রণয়ের সুপ্তসুখস্মৃতির চকিত স্পন্দনে শিহরিয়া তুমি যে সেই অনন্তরসরুচির, অনন্তকুসুমরাগবিচিত্র, মোহমদিরাসিক্ত সুকুমার বরমাল্যে [illegible]ললাটে আমায় বেষ্টন করিয়াছ, আমি ত সেই দিন হইতে তোমারই অঞ্চল ধরিয়া তোমারই পশ্চাতে দিবানিশি ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আমি স্বভাবতঃ অচঞ্চল হইলেও—তুমি যে স্বভাবতঃ চঞ্চলা! তুমি ত এক তিল আমায় স্থির হইতে দাওনা। তাই ভাল করিয়া কখন তোমায় দেখা হয় নাই। উন্মদে! তোমার আগুল্ফবিলম্বিত বিশাল কেশ-কলাপ পৃষ্ঠদেশে দোলাইয়া একবার আমার পানে চন্দ্রবদন ফিরাইয়া দাঁড়াও দেখি। তোমার সম্মুখে পশ্চাতে, সব্যে দক্ষিণে, উর্দ্ধে নিম্নে, অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বাবয়বে [illegible] আজ প্রাণ ভরিয়া তোমার রূপসুধা পান করিব। আজ [illegible]ের সাধ, জন্মজন্মান্তরের কামনা আজ পূর্ণ করিব।

চতুরে! যে দিন আমায় বুকে করিয়া তুমি এই অকূল অনন্তে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলে, আমি বেলাহীন অনন্ত দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া

ISSUE(S) MISSING

উঠিয়াছিলাম, অফুরন্ত পথ দেখিয়া হতাশ হইয়া কাঁদিয়াছিলাম; বিশ্রামের জন্য পান্থনিবাস নাই, দিক্‌নিরূপণের উপায় নাই, দিক্‌দেশের পরিচ্ছেদ নাই, আলম্বনহীন অবলম্বনরহিত নিরবচ্ছিন্ন অচল শূন্য ধূ ধূ করিতেছে দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, শ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়াছিল। তোমার পায়ে ধরিয়া কত মিনতি করিয়াছিলাম, তুমি শুন নাই; "আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি অত দূর যাইতে পারিব না, অজানা অচেনা পথে আমাকে ফেলিয়া দিও না" বলিয়া কত রোদন করিয়াছিলাম, তুমি গ্রাহ্য কর নাই। তুমি তখন আমার সম্মুখে তোমার ইন্দ্রজালের পসরা খুলিয়া বসিলে, যাদুমন্ত্রে আমাকে মুগ্ধ করিলে, চাতুরীজালে আচ্ছন্ন করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিলে। স্তম্ভিত, মুগ্ধ, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, তুমি যাহা দেখাইলে তাহাই প্রকৃত বলিয়া মানিলাম; যাহা বুঝিলে, তাহাই বর্ণে বর্ণে, মাত্রায় মাত্রায় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম। অবলে! তোমারই জয় হইল।

তার পর সেই দিন—যে দিন তুমি আমায় বন্দীবাসে বদ্ধ করিলে, আমার স্বাধীনতা হরণ করিয়া, গৌরব চূর্ণ করিয়া, প্রভুত্ব পদদলিত করিয়া, তোমার নর্ম্মসহচর বিলাসকিঙ্কর করিয়া রাখিলে, সেই দিন—তুমি নবীনা কিশোরী, সুমধুর বয়ঃসন্ধিপথে পদার্পণ করিয়াছ, সুকুমার তনু সুবিভক্ত, সুগঠিত সুবিকশিত হইতেছে; দেহযষ্টিতে অলৌকিক লাবণ্যের ছায়াপাত হইয়াছে, মাধুরী উঁকি মারিতেছে, লালিত্য লুকাচুরি খেলিতেছে; রূপাবেশের রেখা টানিয়া, বিলাস বিভ্রমের তুলিকা বুলাইয়া, লালসাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া, অনঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে আপন অধিকারসীমা আঁটিয়া লইতেছে; প্রাণে বসন্ত-সমীরণের সোহাগ লাগিয়াছে; হৃদয়বীণায় বসন্তরাগের ঝঙ্কার উঠিয়াছে, মনে কত নব নব আশা নাচিয়া উঠিতেছে, কত কল্পনালহরী উছলিয়া চলিতেছে, কত প্রাক্তন অতৃপ্ত কামনা ভাসিয়া উঠিতেছে; মর্ম্মে মর্ম্মে কত যুগ যুগান্তরের সূক্ষ্ম সুখস্মৃতির ক্ষীণ পীযূষধারা বহিয়া যাইতেছে; তুমি ক্ষণে ক্ষণে অকারণ পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছ, অহেতুক আনন্দে ঢলিয়া পড়িতেছ, অনিমিত্তক সোহাগে গলিয়া পড়িতেছ; অন্তরের চাঞ্চল্য নয়নে খেলিতে দিবে না, সরমের আবরণে তাহা ঢাকিতে চাহিতেছ, কিন্তু সরমের অনুরাগ, হায়! সরমেই আরও ফুটিয়া উঠিতেছে; প্রাণের তৃষ্ণা হা হা করিয়া উঠিতে না উঠিতে, অধরপল্লবের সুধাটুকু, নয়নকমলের পরিমলটুকু, আরক্ত গণ্ডযুগলের লালিমাটুকু তাহার মুখে ঢালিয়া দিয়া

শুষ্কবদনে সরিয়া দাঁড়াইতেছ. কিন্তু হায়! প্রভাতের মলিন শশাঙ্ক পশ্চাতে অরুণ-তাপের প্রতিই লক্ষ্য করিতে বলিতেছে; ভাবতরঙ্গ হৃদয়-বেলা অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়পথে উছলিয়া উঠিতেছে, অঙ্গে অঙ্গে পশিয়া গদ গদ অলস গলিত অভিনয় করিতেছে, তুমি তাহা সংযত করিতে কতই ব্যগ্র হইতেছ, সংযত করিতে পারিতেছ না বলিয়া কত লজ্জিত হইতেছ, কিন্তু হায়! ঐ লজ্জা, ঐ ব্যগ্রতাই চোর ধরাইয়া দিতেছে, গুপ্ত রত্নের সন্ধান বলিয়া দিতেছে; তোমার দেহে মনে বিষম অসামঞ্জস্য, অন্তরে বাহিরে ঘোরতর দ্বন্দ্ব; অন্তর ছুটিয়া বাহির হইতেছে, বাহির তাহাকে সবলে ভিতরে ঠেলিয়া দিতেছে, লুকাচুরির একটা অবিশ্রান্ত অভিনয় চলিতেছে, সেই দিন—কি সুখের দিন! কি অভিসম্পাতের দিন! মনোমোহিনি! কি অপরূপ রূপই দেখাইয়াছিলে! বালার্করাগে উদ্ভাসিত, বালেন্দু কিরণে সুকুমার, বালনক্ষত্রালোকে সুস্নিগ্ধ, বাললতাপাদপকুসুমকিশলয়রাগে সুরঞ্জিত কি অতুলনীয় সে সৌন্দর্য্য! কি অলৌকিক মাধুরী! কিশোরি! তুমি যখন এই রূপনির্ম্মাল আমার পদে প্রণয়োপহার দিলে, পলক মধ্যে আমার মস্তক ঘুরিয়া গেল, বুকের ভিতরে বিষম একটা ঝটিকা উঠিয়া আমাকে তোলপাড়, উলট পালট করিয়া দিল, ঘোর আগন্তুক—বিকারে অজ্ঞান, আত্মবিস্মৃত করিয়া ফেলিল, আমর নির্ম্মল কান্তি বিবর্ণ করিল, নির্ম্মল আনন্দ পঙ্কিল করিল, নির্ম্মল শান্তা বিমলিন করিল; দেখিতে দেখিতে ধৈর্য্যের অটল বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, গাম্ভীর্য্যের অচল সেতু ধসিয়া গেল, জিতেন্দ্রিয়তার সুদৃঢ় সোপান চূর্ণ বিচূর্ণ হইল, ঔদাসীন্য মুছিয়া গেল, অনাসক্তি ধুইয়া গেল, ভোগবিমুখতা উড়িয়া গেল, আমার আমিত্ব—আমার সর্ব্বস্ব অতল জলে ডুবিয়া গেল। তখন মনে হইল, যাউক—আমার সর্ব্বস্ব মাটিতে মিশিয়া যাউক। আমাকে লইয়া আমি কি করিব? কি আছে আমার? কিসের যত্ন? কিসের আত্মা-? কিসের স্বাধীনতা? কিসের স্বতন্ত্রতা? কিসের আত্মরক্ষা? কে আমি? আমি কল্পনা, স্বপ্ন, ঘুমঘোর; আমি অলীক, অসার, মিথ্যা। আমাতে আজ কি? আমি ঐ অস্ফুট লাবণ্যের অমিয় জ্যোৎস্নায় ডুবিয়া মরিব, ঐ চঞ্চল মাধুরীর লীলাময় অঙ্কে লুকাইয়া রহিব, ঐ মুকুলিত সৌকুমার্য্যের সুকোমল ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িব, ঐ লাজুক লালিত্যের লুকাচুরির খেলাঘরে হারাইয়া যাইব, ঐ জ্বলনোন্মুখ রূপের অনলে পুড়িয়া ছাই হইব। সুন্দরি! এমনই কুহকে তুমি আমাকে মজাইলে; মনই এ কৌশলে অন্তঃপুর ভেদ করিয়া

সুখ দুঃখ, আর অশেষ তৃপ্তিনিবৃত্তি ; ইহাকে বিশ্রাম-গৃহই বল, আর কারা-গৃহই বল। আমি এত অসার নহি যে, লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন সীমাহীন, অন্তহীন, সুখদুঃখতৃপ্তিনিবৃত্তিরচিত তোমার এই বন্ধুর বর্ত্মে অনন্তকাল নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইব। যাহাদের স্ত্রীপুত্র, ঘরগৃহস্থালি নাই, যাহারা পিতামাতার ত্যাজ্যপুত্র—বড় ঘরের বওয়াটে ছেলে, যাহারা তোমাতেই মজিয়া গিয়াছে, তোমাকেই সার করিয়াছে, তুমি ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে যে অন্য কিছু আছে, ভ্রমেও ইহা চিন্তা করে না, তুমি কখন্ প্রসন্ন হইয়া একবার প্রীতির কটাক্ষে চাহিবে, একটু সোহাগের হাসি হাসিবে, সেই লালসায় তোমার কষাঘাত, পদাঘাত অঙ্গভূষণ করিয়াছে, সুখ-অনুরাগে অনুদিন দুঃখ-শৃঙ্খল পায়ে পরিতেছে, তুমি তাহাদিগ[illegible] লইয়া রঙ্গতেস মনের সুখে চির দিন বিহার কর, আমি শান্ত, শিষ্ট, [illegible]হ, নিরন্তর রোদন, এক [illegible] করিয়া এ যাত্রা ছাড়িয়া দাও, আমি ঘ[illegible]র ছেলে[illegible] একবার[illegible] চলিয়া যাই।

সুন্দরি! তোমার চিরসহচর হইতে পারে, এমন দুই চারি জনকে আমি ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিতেছি। তুমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছ, [illegible] দেখ—মুগ্ধ নয়নে তোমার পানে চাহিয়া আছে, মৃদু নৃত্যতরঙ্গে লাবণ্যলতা কেমন তালে তালে নাচিতেছে—প্রস্ফুটিত হাবভাবের মধুময় কুসুমভরে কেমন গলিয়া গলিয়া, ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে—কিশলয়ে কমলরাগের ন্যায়, কমলে মণিপ্রভার ন্যায়, তোমার অধরে নয়নে কেমন বিজলিছটা খেলিতেছে—দেখিতে দেখিতে একবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে, আর সুললিত ছন্দোময়, পরিশুদ্ধ তাল মানসঙ্গত, তোমার সুমধুর সংগীতরাগে উন্মাদিত, বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, উহাকে সঙ্গে টানিয়া লও—ও প্রিয় সখাভাবে চিরদিন তোমার পাশে পাশে থাকিবে। ঐ দেখ—কি কৌশলে তোমার ষোল আনা দেহটা মুষ্টির ভিতরে পূরিয়া স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিবে, কিরূপে একা তোমাকে একচেটিয়া করিবে, দিবানিশি কেবল এই চিন্তায় উন্মত্ত রহিয়াছে, তুমি পরমাণু কি পর্ব্বত, রেণু কি মরুভূমি, সলিলবিন্দু কি মহাসাগর, বাষ্পকণা কি জলদজাল, কি কি উপাদানে তোমার বরবপু বিনির্ম্মিত, কি নিয়মে পরিচালিত, কতই বা বল, কত গুরুত্ব, কোন্ অঙ্গটি কেমন ভাবে আয়ত্ব করিতে পারিলে, কোন্ শক্তিটি কি ভাবে নিয়োজিত করিতে পারিলে, সংসারযাত্রায় সুখের পরাকাষ্ঠা হয়, অনুক্ষণ কেবল এইরূপ আন্দোলনেই ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে, উহাকে ছাড়িও না—ও চিরদিন তোমার বহির্ব্বাটীর ম্যানেজার থাকিবে। ঐ দেখ—কি কৌশলে তোমার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসিবে, কেমন করিয়া তোমার মনের মানুষ হইবে, কি উপায়ে তোমার অন্তঃপুরের কক্ষে কক্ষে সুখে চিরদিন বিহার করিবে, অহরহ ঝিম হইয়া কেবল এই চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে, ঐ ক্ষীণকায় সূক্ষ্মদর্শীটিকে ছাড়িও না—ও চিরকাল তোমার অন্দরের দেওয়ান থাকিবে। আর ঐ দেখ—লাস্যতাণ্ডববেগে তোমার দেহযষ্টি কি ভাবে কতবার আবর্ত্তিত হইল, এক এক আবর্ত্তনে কত পথ অতিক্রান্ত হইল, নৃত্যবেগে ঘূর্ণ্যমান তোমার শীর্ষস্থ প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যান, তাহাতে মনোহর কুসুমচক্র, কুসুমাবৃত বিস্তীর্ণ পথ, কুসুমালঙ্কৃত বিচিত্র কুঞ্জ, কি নিয়মে, কত বেগে, কত দূর ব্যাপিয়া ঘুরিল ফিরিল, উর্দ্ধ নয়নে সারানিশি কেবল এই আলোচনায় ডুবিয়া রহিয়াছে, উহাকেও ছাড়িও না—ও যাবজ্জীবন তোমার এষ্টেটের একাউণ্ট্যাণ্ট থাকিবে। আমাকে ছাড়িয়া দাও—আমি তোমার কোন চাকুরিই করিতে পারিব না, চাকুরি কখনও করি নাই।

রূপগর্ব্বিতে! রূপের অহঙ্কারে মাটিতে তোমার পা পড়ে না—কিন্তু হায়! রূপ ত কেবল উপরেই ভাসিতেছে ; লতা হৃদয়ে শিশিরমালার ন্যায়, শিশিরবক্ষে কৌমুদীমালার ন্যায়, লাবণ্য ত কেবল উপরেই টলটল করিতেছে। রূপের অন্তরালে, লাবণ্যের পশ্চাতে, কণ্টকিত দারু, কঠিন শিলা, মলিন মৃত্তিকা, কর্কশ কঙ্কাল, শুষ্ক ত্বক লুক্কায়িত আছে, কে জানিত? তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে লাবণ্যযষ্টি আলিঙ্গন করিয়াছি, অমনই বিষম আঘাতে বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; মাধুরী পান করিতে গিয়া অধর ছিঁড়িয়া গিয়াছে, লালিত্য লেহন করিতে গিয়া রসনা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, সৌকুমার্য্য সেবন করিতে গিয়া নয়ন কণ্টকবিদ্ধ হইয়াছে, কোমলতা মাখিতে গিয়া সর্ব্বাঙ্গ বিছুটি দংশনজ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হায় রে রূপ! ইহাই নাকি ট্রয় ছারখার করিয়াছিল, কনকলঙ্কা ভস্মীভূত করিয়াছিল, বীরবর এণ্টনিকে কুসুম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া আনিয়া বিলাসবতী ক্লিওপেট্রার পদতলে লুটাইয়া দিয়াছিল, আর ইহারই প্রভাবে এই অভাগার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। রূপসি! তুমি শুধু রূপ, শুধু লাবণ্য হও নাই কেন? জ্যোৎস্না দিয়া তোমাকে গড়ে নাই কেন? আধার আধেয় অভিন্ন হয় নাই কেন? রূপের উপরে রূপ, লাবণ্য-হৃদয়ে লাবণ্য, মাধুরী-অঙ্কে মাধুরী,

লালিত্যের কোলে লালিত্য, সৌকুমার্য্য-অঙ্গে সৌকুমার্য্য—এ অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয় নাই কেন ?

আর রসবতি ! তোমার মধুর রস—তাহাই কি অনায়াসলভ্য ? নিংড়াইয়া লইতে না পারিলে তাহা ত পাওয়া যায় না। সৌরভ—তাহাও ত ঘষিয়া লইতে হয়, পিষিয়া লইতে হয়, না হয় মলয়-হিল্লোল দিয়া উড়াইয়া লইতে হয়। স্পর্শ অতদূরে ত্বকের উপরে কেন ? এত ভালবাসি, এত ভালবাস—প্রাণে প্রাণ স্পর্শ করিতে পার না ? মরমে মরম ছুইতে পার না ? ছি ! কেবল মুখের ভালবাসা। শব্দ—ভাষা—সে দুঃখ আর কাহাকে বলিব ? কে বলে তুমি মুখরা ? যে বলে বলুক, কি আমার অদৃষ্টে তুমি বোবা। অঙ্গুলি পীড়িত না করিলে, চিম্‌টি না কাটিলে, তুমি ত কথাটি কও না। অনাঘাতে শব্দের উদ্ভব, অনুদ্দীপনায় ভাষার স্ফুরণ, আমি ত কখনও দেখি নাই। বল দেখি, ইহাতেও কি মন থাকে ?

তোমার আকৃতি—সে ত এক বিষম সমস্যা। একত্র এতদিন বাস করিতেছি, তবুও আজিও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না—তুমি এক কি নানা, সান্ত কি অনন্ত, ক্ষুদ্র কি বিশাল, স্থূল কি সূক্ষ্ম। পলে পলে বিকৃতি, দণ্ডে দণ্ডে পরিণতি, ক্ষণে—বিস্তৃতি. ক্ষণে সঙ্কোচ, ক্ষণে উন্মীলন—ক্ষণে নিমীলন, ক্ষণে সৃষ্টি—ক্ষণে লয়—কেমন করিয়া বলিব, কেমন তোমার আকার। এখনই যাহা দেখিলাম, পরক্ষণে তাহা নাই, বিকৃতি গর্ভে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে ; এখনই যাহা সত্য বলিয়া অনুমান করিলাম, পরক্ষণে তাহা নাই—বিবর্ত্ত প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। আবার কখন যাহা দেখি নাই, কখন যাহা ভাবি নাই, এরূপ নব নব দৃশ্য বিবর্ত্তন-স্রোতে অবিরল ফুটিয়া উঠিতেছে ; সেই একই উপাদান বিভিন্ন প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট হইয়া নিত্য নূতন নূতন আকৃতির সৃজন করিতেছে—তবে কেমন করিয়া জানিব, তুমি কিম্ভূত কিমাকার—সাকার কি নিরাকার ? যখন তোমার আকৃতির নিশ্চয় নাই, যখন একটি আকৃতি—ঠিক তেমনইটি অনন্তকালেও বুঝি একাধিকবার প্রস্ফুটিত হয় না, তখন তোমার কোন্ মূর্ত্তি সত্য, কোন্ মূর্ত্তিই বা মিথ্যা বলিব ? এ হিসাবে সকলগুলিই সত্য, সকলগুলিই মিথ্যা। আর যদি স্থিরতা অনুসারে সত্যতা স্বীকার করিতে হয়, তবে ত কেবল মূল উপাদানগুলিই সত্য, আর প্রত্যেক উপাদানের যদি কোন নির্দ্দিষ্ট আকার থাকে, তবে তাহাও সত্য। বাকি সমস্তই

মিথ্যা। তুমিও মিথ্যা। আবার যখন ভাবি, অবিশ্রান্ত বিবর্ত্তন-স্রোতে, অবিরাম সংযোগ বিয়োগে, অনন্ত আকৃতি-বিকাশের চঞ্চল অভিনয় সমভাবে অনন্তকাল চলিয়া আসিতেছে, তখন বুঝিতে পারি—তোমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তা ক্ষণস্থায়ী হইলেও, বিরাট অনন্তরূপিনী তুমি কখনও মিথ্যা নও। তরঙ্গমালা ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মহাসাগর মিথ্যা নহে। বুঝিতে পারি—ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাঞ্চল্যও অনিয়ত, উচ্ছৃঙ্খল নহে ; এক অনন্তদীর্ঘ, অনবচ্ছিন্ন অচঞ্চল, সুদৃঢ় সূত্র ইহাদিগকে মাল্যবদ্ধ পুষ্পরাশির ন্যায় গাঁথিয়া রাখিয়াছে। অচল, গম্ভীর, অবিনাশী, সমষ্টিবক্ষে চঞ্চল ব্যষ্টিনিচয় বুদ্বুদের ন্যায় উঠিতেছে, পড়িতেছে। কিন্তু—

রাক্ষসি ! তুমি ও কি করিতেছ ? এই বুঝি তোমার স্নেহ ? এই তোমার মমতা ? তুমি প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধানলে আপন সন্তানের অস্থিমাংস আহুতি দিতেছ ? নিদারুণ পিপাসায় লহলহ রসনায় আপন রক্ত আপনি পান করিতেছ ? ভুজঙ্গী-বাৎসল্যের তুমিই বুঝি শিক্ষয়িত্রী ? আবার এ কি ? প্রদীপ্ত কোপে উন্মত্তার ন্যায় আপন কেশ আপনি ছিঁড়িতেছ, আপন ললাট আপনি ভাঙ্গিতেছ, আপনার বক্ষ আপনি চিঁড়িয়া রুধিরধারা ছুটাইতেছ, আপনার অঙ্গুলি আপনি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছ, আর যুগল করপল্লবে সুধামুখী-সম্মার্জ্জনী ধরিয়া আমার আপাদমস্তক ঝাড়িয়া দিতেছ।

দুঃশীলে ! কে তুমি—কি তুমি—যে তোমার নিগ্রহ চিরদিন ভোগ করিব ? তুমি জড় প্রকৃতি—আমারই আশ্রয়ে থাকিয়া আমাকেই পোড়াইবে, আর আমি তাহা সহ্য করিব ? তোমার সহিত আমার কিসের সম্বন্ধ ? তুমি গায়ে পড়িয়া একটা সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়াছ বৈত নয় ? ভ্রমে পড়িয়াই আমি তোমাকে আমার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, যাহাতে তুমি সুখী হইয়াছ, তাহাই করিয়াছি ; কিন্তু তুমি ছোট লোকের মেয়ে, প্রশ্রয় পাইয়া, আদর পাইয়া একবারে মাথায় চড়িয়াছ। ভ্রমে পড়িয়াই তোমাতে আমি মাখিয়া গিয়াছি, ছড়াইয়া পড়িয়াছি ; তোমাকে সুখী করিবার জন্য একা একশত হইয়া তোমার মস্তিষ্কে, হৃদয়ে, ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে, কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বাবয়বে ধীরে ধীরে জড়াইয়া গিয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিওনা যে, আমি তোমাকে আর ছাড়িতে পারি না। তুমি নাকি বড়ই চতুরা ; পাছে চিরদিন তোমার সঙ্গে আমার

বনিবনাও না হয়, পাছে কোন্ দিন তোমায় চিনিয়া ফেলি, তাই পরিহাস ছলে আপনা হইতেই অপবাদ, অধ্যারোপ, সংযোগ প্রভৃতির প্রসঙ্গ তুলিয়া হাসিয়াই তাহা উড়াইয়া দিয়াছিলে; কিন্তু এখন দেখিতেছি—তুমি ত সত্য সত্যই আমাকে ভেড়া করিয়াছ। আর তোমার সহিত আমার নিত্য সংযোগই বা কিসে? জড় নিরপেক্ষ চৈতন্যের স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা দেখিতে পাই না বলিয়া কি? প্রকৃতি পণ্ডিতে! সময়ান্তরে তোমার সহিত এ বিচারে প্রবৃত্ত হইব। এখন না হয় মানিয়া লইতেছি, তোমার সঙ্গে আমার নিত্য সম্বন্ধই বটে। কিন্তু তাহাতেই বা কি? তোমার তমোময় দেহাভ্যন্তরের যেখানে যেখানে আমার জ্যোতি-বিম্ব প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, আমি কি তাহা একে একে কুড়াইয়া আনিয়া আপন অক্ষয় ভাণ্ডারে পুনরায় সঞ্চিত করিতে পারি না? তোমার চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া, গিরি দুর্গ অধিকার করিয়া, তোমাকে পরাভূত করিয়া, তোমারই অন্তঃপুরে রাজরাজেশ্বরের ন্যায় বিরাজ করিতে পারি না? তোমারই মধ্যে থাকিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না? ঐ মৃৎপঙ্কসলিলের ভিতরে নির্ম্মল সুখকুঞ্জ রচনা করিতে পারি না? কে না জানে—রাজর্ষি মিথিলাপতি তোমাকে সম্মুখ সংগ্রামে বন্দিনী করিয়া চিরকাল আপন শয়নকক্ষে শুশ্রূষাকারিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন? কে না জানে—কত মহাতেজা তপোধন মহর্ষির গম্ভীর আশ্রমপদে তুমি সভয়ে দিবানিশি পরিচারিকা ভাবে উপস্থিত থাকিতে? কে না জানে দুইবার দুইটি সুকুমার দেবশিশু আনন্দ-কাননে খেলা করিতে করিতে পথ ভুলিয়া তোমার রাজ্যে আসিয়া পড়িবা মাত্র তুমি তাহাদিগকে কয়েদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে; কিন্তু বিশ্ববিজয়ী কুমারযুগলের প্রত্যেক তর্জ্জনী হেলনে অবহেলায় তোমাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল? আর মনে আছে—পুরাকালে সেই গোঁসাই তোমাকে কেমন জব্দ করিয়াছিল? তুমি পূর্ব্বাবধি কত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিয়াও তাহাকে অতিক্রম করিতে পার নাই। ভূমি স্পর্শ করিয়াই সে এরূপ বেগে উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল যে, তুমি চিরকাল পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়াও তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পার নাই।

দেখ—আমি শত ধৌত, শত পরীক্ষিত, অভ্রান্ত, অখণ্ড স্বাধীন সত্যস্বরূপ হইয়াও, তোমার সাহায্যে এখন কুসংস্কারাপন্ন, মলিন, ভ্রান্ত, জীবভূত চৈতন্য প্রতিবিম্ব মাত্রে পরিণত হইয়াছি; আর তুমি নির্জ্জীব জড়পিণ্ড

হইয়াও আমার সহায়তায় ত্রিভুবন জয় করিয়া বেড়াইতেছে। সুন্দরি! নাক তুলিও না; ইহা আমার কথা নহে। তুমি আমিই সব নহি। আর একজন তিনি আছেন। উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ ব্যতীত এক অদ্বিতীয় প্রথম পুরুষ আছেন। প্রথমে তিনি পরে আমরা। তোমার ও আমার সম্বন্ধে তিনি কি বলিতেছেন, শুন।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেবচ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেঽপরাং।
জীবভূতাং..... ..যয়েদং ধার্য্যতেজগৎ॥"

আবার বলিতেছেন:—

"ইদং শরীরং .....ক্ষেত্র মিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যোবেত্তিতং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥"

এই প্রসঙ্গে তিনি আত্মপরিচয় দিতেও বিস্মৃত হন নাই। বলিতেছেন:—

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপিমাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু...।" *

শুনিলে? তুমি নিকৃষ্টা জড় প্রকৃতি, আর আমি জীবভূত উৎকৃষ্ট প্রকৃতি; এ অখিল বিশ্ব আমিই ধরিয়া রাখিয়াছি। তুমি ক্ষেত্র, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ, আর তিনি নিখিল ক্ষেত্রজ্ঞের সমষ্টিভূত মহামহিমাময় পরম পুরুষ। তবেই দেখ—তোমার চেয়ে আমার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। তাঁহার সংক্ষেপই আমি। তাঁহার করুণা পাইলে আমি তোমাকে হাঁকাইয়া দিতে পারি। ইহাও তিনিই অঙ্গীকার করিয়াছেন।

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥"

গুণময়ি! শুনিলে? তুমি দুরত্যয়া, একবারে অনত্যয়া নও। তাঁহার শরণাপন্ন যে হইবে, সেই তোমাকে পায়ে ঠেলিতে পারিবে। এখন একবার নিত্য সংযোগের আপত্তিটা মনে কর।

---

* উদ্ধৃত শ্লোকগুলির যে যে অংশ উপস্থিত প্রস্তাবের পক্ষে অনাবশ্যক, তাহা বর্জ্জিত হইয়াছে।

লেখক।

কলঙ্কিনি! তবে আর তোমাকে ভয় কি? আমি ত প্রাণভরা অভয় বাণী পাইয়াছি। এই আমি তোমার পানে পিছন ফিরাইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু হায়! এদিকেও যে অকূল মহাসাগর, উত্তাল তরঙ্গ, বেগবান্ প্রতিকূল প্রবাহ; ভয় কি? ঐ অভয়বেণু বাজিতেছে—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া-মেতাং তরন্তিতে।" কত মহান্ সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, কত মহতী জাতির সমাধিক্ষেত্র পার হইয়া আসিয়াছি, কত মহিমাময়ী দেবভাষার নিস্পন্দ দেহ পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি; হায়! এদিকেও যে অফুরন্ত পথ! চিন্তা কি? ঐ অভয়বীণায় ঝঙ্কার উঠিতেছে—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।" আগেই ত বলিয়াছি, আমার প্রাণের ভিতর হাহাকার উঠিয়াছে; আহা! আমার প্রাণপ্রতিমা প্রণয়িনী সুধাময়ী শান্তি বুঝি বিরহ শোকে দুশ্চর তপস্যায় গিরিগুহা আশ্রয় করিয়াছেন, আমার প্রাণাধিক সুকুমার শিশু আনন্দ বুঝি অনাথের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইতেছে, আমার সোহহংবাদী বন্ধুগণ বুঝি আমার দুর্গতি স্মরণ করিয়া দিবা নিশি হায় হায় করিতেছেন, আমার সমুজ্জ্বল সুখ নিকেতন বুঝি শ্মশানের গভীর কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া খা খা করিতেছে; আর কি আমি স্থির থাকিতে পারি? আর কি মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিতে পারি? স্বদেশ উদ্দেশে এই উজান স্রোতে বুক পাতিয়া দিলাম, দেখ—কে এই প্রবাস প্রত্যাগত পথিকের গতি রোধ করে। ঊর্দ্ধে ঐ দৈবী অভয়বাণীর সুমধুর নিনাদ, হৃদয়ে ঐ অভয়দাতা দেবতার সুমধুর মূর্ত্তি, আর সম্মুখে ঐ দারা-পত্যসুহৃদের উন্মাদক বিলাপধ্বনি——এখনও আবার ভয়?

পাঠক! আপনি কি আমার সহযাত্রী হইতে পারেন না? আসুন না, উজানে দুঃখের কাহিনী কহিতে কহিতে উজানে অগ্রসর হইব, কথায় কথায় পথশ্রান্তির লাঘব করিব, কথায় কথায় গভীর দুঃখ যামিনী পোহাইব। ভয় কি? ঐত শুনিতেছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।"

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

...ও বাবা...

মলিন, ভ্রান্ত, জীব-

তুমি নির্জ্জীব জড়পিণ্ড

বীরভূমির ইতিবৃত্ত।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

বীরভূমের নামতত্ত্ব ও সীমানা।

বীরভূমির জরাজীর্ণ ঘনান্ধকারময় দুর্গম ইতিবৃত্ত মন্দিরে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, ইহার নামকরণ এবং পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান আয়তন সম্বন্ধে আলোচনা করা অতীব প্রয়োজনীয়। বীরভূমি, আপন বর্ত্তমান আখ্যা, কি প্রকারে কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার এক প্রবাদ ভিন্ন অপর ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই;—বোধ করি, থাকিতেও পারে না। আমরা এতৎসম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ বা জনশ্রুতি নিম্নে প্রকটিত করিলাম; বিজ্ঞ পাঠকবর্গ ইহাদিগের সার্থকতা বিচার করিয়া দেখিবেন।

বীরভূমি, চিরকাল বীরজনয়িত্রী বলিয়া গৌরবান্বিতা। এই জন্য ইহার নাম 'বীরভূমি'। কত পরাক্রমশালী ব্যক্তি, স্বকীয় বীর্য্য প্রভাবে অদূর বিস্তৃত বেষ্টনী মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ সৃজন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছেন। অসভ্য বর্ব্বরগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অপেক্ষাকৃত সভ্য বীরভূমবাসিগণ ও সাধারণতঃ সমধিক বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিল। এইরূপ বলশালী ও সাহসী হইবার, আমরা দুইটি প্রধান কারণ দেখিতে পাই।

প্রথম। দেশের অবস্থা অনুসারে অধিবাসীগণের প্রকৃতি সংগঠিত হইয়া থাকে। নদী বা সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী মানবেরা নৌ-সঞ্চালনে অভ্যস্ত; পার্ব্বত্য প্রদেশীয়গণ স্বভাবতঃ কষ্টসহিষ্ণু। আবার যাহারা অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর ক্ষেত্রে বাস করিয়া অপরের মৎসরতা উদ্রিক্ত করিতে থাকে, অকালে বিপদ্ সম্পাতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া দস্যু বা আক্রমণকারীকে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত, তাহারা অসি বা লগুড় সঞ্চালনে সমধিক পটু এবং বল বীর্য্য ও সাহসে অধিকতর উজ্জীবীত। বীরভূমি, পূর্ব্বে বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও আয়ত বহু বিস্তৃত ছিল। যদিও অনুর্ব্বর শৈলরাজি ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা শ্রেণীবদ্ধভাবে বহুদূর ব্যাপিয়া প্রস্তর বক্ষে দণ্ডায়মান ছিল এবং হিংস্র ও ভয়াবহ জন্তুর আবাসভূমি নিবিড় অরণ্যরাজি বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া দেশ

আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি দামোদর, অজয়, হিংলা, ভাগীরথী প্রভৃতি নদ নদীর শুভ প্রসাদে অনুর্ব্বর ক্ষেত্রও বলিয়া, বীরভূমের অপবাদ কোন কালেই রটিত হয় নাই। অধিকন্তু ধনধান্যশালী বলিয়া ইহার খ্যাতি দূরদেশ পর্য্যন্তও প্রচারিত হইয়াছিল। তখন এখানে ধান্য, ইক্ষু, সর্ষপ, পাট, কার্পাস, শণ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন এবং নীলবড়ী ও রেসমের কারবার পূর্ণ মাত্রায় পরিচালিত হইত। অরণ্যমধ্যে সুবৃহৎ কাষ্ঠের অসদ্ভাব ছিল না; নদীগর্ভে বালুকণার সহিত বিমিশ্রিত সুবর্ণরেণু সৌরকরোদ্ভাসিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত এবং সেই অতি পুরাকালেও কয়লা ও লৌহের ব্যাপার প্রায় এমনি ভাবে প্রচলিত ছিল। *

মধ্যভারত, বঙ্গদেশ অপেক্ষা অতিশয় অনুর্ব্বর এবং অসভ্য ও বর্ব্বর জাতির আবাসভূমি। এই অসভ্যজাতি সমূহ মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া হঠাৎ অক্রমণ করিয়া দেশের ধনরত্ন শস্য প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিত। পরিশ্রমের ফল এই প্রকারে বৃথা নষ্ট হইতে লাগিল। এখনকারমত তখন একছত্র রাজার শাসন ছিল না এবং কেহ কাহারও সাহায্যার্থে প্রবৃত্ত হইত না। অগত্যাই নিজের প্রাণ এবং ধনরত্নাদি রক্ষার ভার নিজেকেই গ্রহণ করিতে হইত। দলবদ্ধ দস্যুদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সময় ক্রমে একক শক্তির প্রয়োজন হইত। এজন্য বীরভূমবাসীদিগকে দায়ে পড়িয়া "বীর" হইতে হইয়াছিল। ইহা অতি প্রাচীন কালের কথা।

দ্বিতীয়। অনেকেই "সাতাত্তরের মন্বন্তরের" কথা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। ভবিষ্যতে, আমরা এই মন্বন্তরের কথার অবতারণা করিয়া বিশদরূপে আলোচনা করিব। ১১৭৭ সালে (১৭৬৯-৭০ খৃঃ) দেশব্যাপী মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ ত্যাগ করে। ইংরাজরাজ তখন সবে মাত্র, কয়েক বৎসর হইল, রাজত্বের সূত্রপাত আরম্ভ করিয়াছেন! দেশের অবস্থা যাহাই হউক, এই দুর্ভিক্ষ বৎসরেও নানাবিধ অত্যাচারের পর বীজধান্য পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া পূর্ণ মাত্রায় রাজস্ব সংগৃহীত হইল। কত রাজা ও কত জমীদার অর্থাভাবে কারারুদ্ধ হইলেন। এই সময় অধিকাংশ লোকই গৃহত্যাগ করিয়া দূরদেশে ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। রীতিমত

* Hunter's Annals of Rural Bengal p 2-3.

দস্যুদল সংগঠিত হইল এবং জমীদারগণ ও অনন্যোপায় ভাবিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদানে জীবিকা সংস্থানের উপায় করিয়া লইল। কালে এই জঘন্য বৃত্তিই তাহারা দেশকাল বুঝিয়া, জীবিকা উপার্জ্জনের প্রশস্ত উপায় ভাবিয়া আপনাপন বংশধরগণকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপ দস্যুবৃত্তিকেই তাহাদের স্পর্দ্ধা ও গৌরবের কথা বলিয়া নিজমুখে ব্যক্ত করিতে ঘৃণা বা লজ্জাবোধ করিত না। ইংরাজরাজ বহু কষ্টে অতি কঠোর দণ্ডের বিধান করিয়াও ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের কমে এই দস্যুবৃত্তির দমন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। * যে প্রকার ক্ষিপ্রকারিতা ও সাহসিকতার সহিত এই দস্যুগণ একবারে চারি পাঁচ শত জন একত্র হইয়া নগর বা গ্রাম আক্রমণ করিত, তাহাতে শিক্ষিত সৈন্য অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বলবীর্য্যশালী বলিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ফলতঃ বিপাকে পড়িয়া, দস্যুবৃত্তির ঘৃণিত অপরাধে অপরাধী না হইলে তাহারা যে যথার্থই "বীর" নামে আখ্যাত হইতে পারে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, উক্ত বিবরণ, "বীরভূমি" নামের সার্থকতার পরিপোষক।

এই বীরভূমি নামের অনুরূপ পার্শ্ববর্ত্তী স্থলে আমরা আরও অনেকগুলি নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা,—মল্লভূমি, সিংহভূমি, শিখরভূমি, বরাহভূমি, ধনভূমি, ভঞ্জভূমি, ব্রাহ্মণভূমি, গোপভূমি ইত্যাদি। ইহাদেরও বীরভূমির ন্যায়, কোন না কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া নামের সার্থকতা আছে।

বীরভূমবাসিগণের বীর্য্যবত্তা সম্বন্ধে একটি ঠাকুরদিদীর গল্প প্রচলিত আছে। একদা, বিষ্ণুপুরাধিপতি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া স্বরাজ্যের শৈলময় সীমান্তপ্রদেশে, একটি বলাকা শীকার করিবার মানসে, আপনার সুশিক্ষিত বাজপক্ষীকে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করেন। বলাকা, বাজপক্ষীর কবলে পতিত না হইয়া এমনই উগ্রভাবে তাড়না করিল যে বাজপক্ষীটি আর কোন মতেই অগ্রসর হইতে না পারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল এবং বলাকাও পূর্ব্বমত নিজ উদর পূরণে মনোনিবেশ করিল। রাজা স্বচক্ষে এই ঘটনা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং যে দেশের একটি সামান্য ইতর জাতীয় খেচর এতদূর সাহসী ও বলশালী, সে দেশের মনুষ্যেরা

* Hunter's Annals of Rural Bengal p p72-75.

না জানি কতই বলশালী হইবে, এই ভাবিয়া সেই প্রদেশকে "বীরমাটী" বা "বীরভূমি" নামে অভিহিত করিলেন। তদবধি এই নাম প্রচলিত হইয়াছে।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে বীরসিংহ ও চৈতন্য সিংহ নামক দুই ভ্রাতা বীরভূমে আগমন করিয়া অসভ্য আদিম নিবাসীদিগকে পরাজিত করেন। বীরসিংহ বর্ত্তমান সিউড়ীর তিন ক্রোশ পশ্চিমে আপনার নামানুসারে বীরসিংহপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বীরসিংহ রাজাই, বীরভূমে আদি হিন্দু (ব্রাহ্মণ) রাজা বলিয়া খ্যাত। ইনি স্বীয় বাহুবলে দেশ জয় করিয়া রাজত্বের পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরে, মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন এবং রাজমহিষীও অত্যাচারের ভয়ে এক পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই পুষ্করিণী এখনও রাণীর বিষাদময় দুর্ঘটনা স্মরণ করাইয়া "রাণীরবান্দ" নামে ধ্বনিত হইয়া থাকে। রাজা বীরসিংহ স্বীয় রাজধানীতে যে শ্রীশ্রী৺ গোপালজী ও কালীমাতার বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং রাজধানীর অপর অংশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া 'ভাণ্ডীর বন' নামে পরিচিত আছে।

বীরসিংহ রাজার বীরপণা সম্বন্ধে আর একটি অন্যবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। তিনি এতদূর বলশালী ছিলেন যে, অঞ্জলি মধ্যে সর্ষপ নিষ্পেষিত করিয়া তৈল নিষ্কাশিত করিতেন এবং তাহাই সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতেন। তাঁহার কামদার খাঁ ও নামদার খাঁ নামক দুই মুসলমান দ্বারবান ছিল।* রাজমহিষীর, এই দ্বারবানদ্বয়ের মধ্যে একের প্রতি অবৈধ আসক্তি ছিল; সেইজন্য তাহারা রাজাকে নিহত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা যে প্রকার বিক্রমশালী, তাহাতে তাঁহাকে নিহত করা দুই এক জনের কর্ম্ম নহে। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার জীবন নাশ করিবার এক গুপ্ত রহস্য ছিল, তাহা একা রাজমহিষী ব্যতীত অপর কেহই পরিজ্ঞাত ছিল না। মহিষী এই নারকীয় ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী; তিনি সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াদিলেন। রাজা বীরসিংহ নগরের রাজপ্রাসাদে তৈল মর্দ্দনান্তর পুণ্যতোয়া ভাগীরথী সলিলে অবগাহন করিয়া নাতি বিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন এবং আহার করিবার পূর্ব্বেই এক নিভৃত কক্ষে উপবেশন করিয়া আহ্নিক ক্রিয়াদি সমাপন করিতেন। প্রহরীদ্বয় পূর্ব্ব হইতেই কক্ষমধ্যে লুক্কায়িত

* কেহ কেহ বলেন, আলিলকি খাঁ ও জহরজ্জমা খাঁ। লেখক।

থাকিয়া, রাজা যেমন 'আহ্নিক' করিবার মানসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবেন, অমনি ব্যাঘ্রলম্ফনে উভয়েই রাজাকে আক্রমণ করিয়া গ্রীবাদেশে তরবারী * প্রোথিত করিয়া দিল। তরবারী নির্দ্দিষ্ট স্থানের কিয়ৎ পরিমাণে অন্তরে বিদ্ধ হওয়ায়, রাজা তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ না করিয়া, তাহাদের সহিত সপ্ত দিন ধরিয়া ক্রমিক মল্লযুদ্ধ করেন। অবশেষে, রাজমহিষীর ইঙ্গিতে একজন প্রহরী রাজাকে লইয়া অদূরস্থিত কূপমধ্যে নিপতিত হইল। রাণীর ইচ্ছা পূর্ণ হইল; আপনার প্রিয়তমকে লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। রাজা ও প্রহরী উভয়েই কূপ মধ্যে প্রোথিত রহিয়া গেল। এই সময় অবধি বীরভূমে মুসলমান রাজত্বের সূচনা আবদ্ধ হয়। ইত্যাদি।

অনেকেই বলেন, এই বীরসিংহ রাজার নাম হইতেই "বীরভূমি" নামের উৎপত্তি।

সাঁওতালী ভাষায় "বির্" শব্দের অর্থ 'জঙ্গল' এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, "বীরভূমি" শব্দ সাঁওতালী ভাষা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।† পূর্ব্বে এই দেশ যে প্রকার জঙ্গলময় ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে যে পরিসর অধিকার করিয়া জঙ্গল বর্ত্তমান আছে, তাহাতে বীরভূমিকে "বীর ভূঁইয়্যা" বা 'জঙ্গলময় ভূমি' বলিয়া অভিহিত করা বিচিত্র নহে।‡

সম্রাট আকবরের সময়, বীরভূমি মাদারুন সরকারের অন্তর্ভূত ছিল।§ অনেকগুলি মহাল একত্র করিয়া এক একটি সরকার গঠিত হইত। পরবর্ত্তী সময়ে বীরভূমির সীমানা সঙ্কুচিত ও সম্প্রসারিত হইয়া এক্ষণ বীরভূমির অধীনে তাণ্ড সরকারের দাউদসাহী, স্বরূপসিং, কমার প্রতাপ, গোরাঘাট সরকারের ফতেপুর প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হইলে বীরভূম এক্ষণ স্বতন্ত্র হইয়াছে মাদারুণ সরকারের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে চলিল। তবে পরগণার নাম এখনও রক্ষিত আছে এবং বহুদিন ধরিয়া বোধ হয় থাকিতে

* এই তরবারীর একটুকু বিশেষত্ব ছিল। ইহা অতিশয় দীর্ঘ ছিল, কিন্তু ইহাকে কুক্ষি মধ্যে গুটাইয়া রাখিতে পারা যাইত। লেখক।

† Imperial Gazetteer of India, Vol III.

‡ পূর্ব্বে বীরভূমে বীরাচার সম্মত ধর্ম্মানুষ্ঠান সমধিক প্রচলিত ছিল। তারাপুর, নলহাটী, লাভপুর প্রভৃতি পীঠস্থান তাহার প্রমাণ। অনেকের মতে বীরাচারের স্থান বলিয়া বীরভূমি নাম হইয়াছে। বীঃ সঃ।

§ Ayeen Akbary Luksem Jmmn of Subah of Bengal.

পারে। এই সকল পরগণা অধিকাংশই কোন না কোন ব্যক্তির নামানুসারে ধ্বনিত হইয়া থাকে ; যথা—আকবরসাহী, আলি নগর, বারবকসিং, ফতেপুর, এব্রাহিমপুর, স্বরূপসিং, সাজেহাপুর প্রভৃতি।

চীন পরিব্রাজক হিয়াঙসাঙের গ্রন্থে "কিরণ সুবর্ণ" নামক স্থানের উল্লেখ আছে। এই 'কিরণ-সুবর্ণ' তাম্রলিপ্তির (বর্ত্তমান তমলুক) সাত শত লী বা ১১৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। কানীংহাম সাহেব বলেন, এই 'কিরণ-সুবর্ণ' সিংভূমে অবস্থিত। ফারগুসন্ সাহেবের মতে বীরভূমির অন্তর্গত নগর নামক স্থানই প্রাচীন 'কিরণ সুবর্ণ'* কিন্তু এই মত অকাট্য বা অভ্রান্ত নহে। নগরকে পারশী গ্রন্থে "লক্ষুর" নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়।†

বীরভূমির বর্ত্তমান রাজধানী সিউড়ী, 'শুরী' শব্দের অপভ্রংশ।‡ ইংরাজী ভাষায় এখনও 'সিউড়ী' না লিখিয়া 'শুরী' লিখিত হয়। এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, "শুরী" ও "বীরভূমি" পরস্পর নামের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সার্থকতা প্রকাশিত করিতেছে।

পাদরী লং সাহেব, তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বীরভূমিকে Switzerland of Bengal আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।§ বীরভূমির সমুন্নত ভূমিচত্বর ও দূর দেশ হইতে যাতায়াতের অসুবিধা উপলক্ষ করিয়াই বোধ হয় এই রূপ নাম প্রদান করিয়া থাকিবেন ।॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

সিউড়ী—বীরভূমি।

---

* সাহিত্য ১০ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ২০৮ পৃষ্ঠা।

† ঐতিহাসিক চিত্র ১ম ভাগ ২য় খণ্ডে রিয়াজউস্ সালতিলে সংযোজিত পাদবীকা। ১৮৫ পৃঃ

‡ Statistical Account of Birbhum,

§ Foot note, p2. Annals of Rural Bengal.

॥ আধুনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বীরভূমির আভ্যন্তরীণ উন্নতির মন্থরগতির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ইহাকে Boetia of Bengal বলিয়া থাকেন। উন্নতিশীল গ্রীসের মধ্যে Boetia নাকি তৎকালে সকল বিষয়েই পশ্চাৎপদ ছিল। লেখক।

অদ্বৈতবাদ।

একের বহু বিকাশ দর্শন করা, কিম্বা সমুদয় দ্রব্য "এক" স্থানে প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহা উপলব্ধি করাকে অদ্বৈতবাদ কহে। অথবা জ্ঞানের দুই মুখ কিম্বা দুই পথ দর্শন করাকে অদ্বৈতবাদ কহে।

মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক হউন না কেন, কোন মীমাংসা বা তর্কের জন্য গোটাকতক "তারপর" "তারপর" বলিলেই তাঁহার জ্ঞান এমন এক স্থানে গিয়া দাঁড়াইবে যে, তথা হইতে আর উত্তর দিতে পারিবে না। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কিন্তু দুইটি মুখ আছে। ইহার এক মুখ বা এক পথের নাম দ্বৈতবাদ, অপর পথের নাম অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের প্রকৃত অর্থ একাকার দ্বৈতবাদ অর্থাৎ পরস্পর পৃথক পৃথক। অদ্বৈতবাদ বেদান্ত। দ্বৈতবাদ তন্ত্র।

একটি সর্ষপাপেক্ষা ক্ষুদ্র বীজের ভিতর এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে। বৃক্ষ যখন "বীজের অবস্থায়" থাকে, তখন তাহার ভিতর একাকার! তাহার পর সেই বীজে গাছ হইলে, তখন দেখিবে, প্রত্যেক শাখায় শাখায় পত্রে পত্রে ঠিক মিল নাই, অবশ্য রূপে! যেমন এক জনের মুখের মত অপর জনের মুখ জগতে সৃষ্টি হয় না, সেইরূপ গাছের পত্র বাহির হইলেই উহা আমাদের জ্ঞানের অপর পথে আসিল। বীজ হইতে বৃক্ষ যে পথে আসিল, এই পথকে দ্বৈতবাদ বলে। বৃক্ষ যখন বীজাবস্থায় থাকে, তখন উহার দুই মুখ বা দুই পথ একস্থানে থাকে। কিন্তু উহা অঙ্কুরিত হইলেই উক্ত দুই মুখ বাহির হইয়া এক মুখ আকাশ পথে অপর মুখ মৃত্তিকা পথে চলে। প্রথম মুখকে বৃক্ষের "গোড়া" এবং দ্বিতীয় মুখকে "আগা" বলে। আগাগোড়া না থাকিলে, গাছ থাকিতেই পারে না। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে, এই বুঝা যায় যে, বৃক্ষের "আগা" এবং "গোড়া" এক ধর্ম্মাক্রান্ত নয়। এই বিষয়ের যে স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিলে বুঝা যায় যে,"আগা গোড়া" এক ধর্ম্মের নয়; সেই স্থানটাকে দ্বৈতবাদ বলে। যেমন মুক্তির বিষয় বুঝিবার অগ্রে বদ্ধর বিষয় বুঝিতে হয়, সেইরূপ দ্বৈতবাদ না বুঝিলে অদ্বৈতবাদ বুঝা যায় না। যেমন অন্ধকার না থাকিলে আলোক প্রকাশ পায় না। এখন বুঝিয়া দেখুন, বৃক্ষের আগা গোড়া এক ধর্ম্মাক্রান্ত কি না? প্রথম দেখুন, গোড়া মৃত্তিকার রস টানিতে পারে, আগা উহা পারে না

আগা আলোক বায়ু গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু গাছের গোড়া তাহা পারে না। দেখিলে ত! এক গাছের দুই মুখের দুই কার্য্য। পটোল গাছের ঊর্দ্ধাংশ লোকে খায়, কিন্তু উহার গোড়া বা শিকড় খাইলে লোকের এমন বিরেচন ক্রিয়া হয় যে, তাহাতেই মৃত্যু ঘটিতে পারে। তবেই বৃক্ষ এক অদ্বৈত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার ভিতর দ্বৈত ভাবও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা দেখা চাই।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, প্রত্যেক দ্রব্য তিনবার দেখ, তাহা হইলে প্রকৃত দেখা হইবে। "এটি কি ?"

"প্রদীপ।"

প্রদীপের জন্মদাতা বা পূর্ব্ব পুরুষ কে ?

উত্তর। মাটী।

তবেই হইল, প্রদীপ প্রথম দেখা। তাহার পর দূরদৃষ্টি বা পুনরায় দেখা হইল "মাটী।" ইহাই দ্বিতীয় দেখা ; তৎপরে ফের দেখ ; প্রদীপ নষ্ট হইয়া কি হইবে ?

উত্তর মাটী হইবে।"

এই হইল তৃতীয় দেখা। প্রথম দেখা "উপস্থিত।" দ্বিতীয় দেখা "চিন্তা" তৃতীয় দেখা "পশ্চাতে।" প্রথম দেখ বর্ত্তমান ; তৎপরে দেখ ভূত ; তৎপরে দেখ ভবিষ্যৎ। আবার বলি, প্রথম দেখ নিকটবর্ত্তী ; তৎপরে দূরবর্ত্তী ; তৎপরে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ দেখ। আবার বলি, প্রথমে কর্ম্মফল, তৎপরে দেখ পূর্ব্বজন্ম, তৎপরে পরজন্ম। কাপড় দেখিয়া কাপড়ের জন্মদাতা বৃক্ষকে দেখিবে, তৎপরে কাপড়ের পরিণাম অথবা পরজন্ম কাগজকে দেখিবে। তাহা হইলেই একস্থানে তিন পুরুষকে দেখিতে পাইবে।

এইবার নিকটে দেখ। একের ভিতরে তিনের ছায়া। কাগজ সময়ে এমন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে যে, সে মাটী হইতেছে। কাগজের শেষ পরিণাম মাটী। তৎপরে এই মাটী হইতে বৃক্ষ হইতেছে, বৃক্ষ হইতে তুলা, তুলা হইতে কাপড়, কাপড় হইতে কাগজ এবং কাগজ হইতে শেষে মাটী। এক মাটী কত অবস্থায় পরিবর্ত্তন হইল, শেষে যে মাটী সেই মাটীই রহিল। এই পরিবর্ত্তনগুলিই দ্বৈতভাব ; নচেৎ মূল অদ্বৈতভাব। জগতের সমস্ত দ্রব্যের জন্ম এবং জন্মান্তর এইরূপ ঘোরাঘোরী ব্যাপার! এখানে এক পুরুষের ভিতর সমস্ত পুরুষ! একের কোটি কোটি অবস্থা!

মূলে আমাদের সেই এক অদ্বৈত পুরুষ রহিয়াছেন। মূল কি ? যে কোন দ্রব্যকে ভাঙ্গ, গড়াও, পোড়াও, কিম্বা পিটাইয়া দেখ, সে তবু তাই থাকিবে। এই শ্রেণীর দ্রব্যগুলিকে মুল দ্রব্য বলে। যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি ধাতুকে আমরা মূল ধাতু বলি। কিন্তু পিত্তল, কাঁসা মূল ধাতু নহে, উহা যৌগিক ধাতু। কারণ যে দ্রব্যকে বিশ্লেষ করিলে, অপরাপর মূল দ্রব্য বাহির হয়, তাহাকে যৌগিক দ্রব্য কহে। আমরা যৌগিক দ্রব্য। ঐ বৃক্ষপত্রটি যৌগিক দ্রব্য, কারণ উহাকে দগ্ধ করিলে, ভস্ম এবং কয়লা প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়ে। কয়লা মূল দ্রব্য নহে, কারণ উহাকে পুনরায় দগ্ধ করিলে, ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু ভস্মকে দগ্ধ করিলে ভস্মই তাহার অবশিষ্ট, অতএব ভস্ম মূল দ্রব্য। জগতের সমুদয় দ্রব্যকে দগ্ধ কর, দেখিবে, ভস্ম প্রভৃতি যে গুলি মূল দ্রব্য, তাহাই অবশিষ্ট পড়িবে। আম্র, কাঁঠাল, গোলাপজাম, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ এবং মানুষ, গাধা, বানর প্রভৃতি জন্তু যাহাকেই দগ্ধ করিবে, শেষে ছাই পড়িবে। সেই ছাই অদ্বৈত ভাবাপন্ন ! এই ছাই দেখিলে, বলিতে পারা যায় না যে, ইহা কিসের ছাই ! মানুষের ছাই কি কোন জন্তুর ছাই, কিম্বা ইহা অশ্বত্থ গাছের ছাই। কাজেই এখানে আমাদের অদ্বৈত জ্ঞান। কিন্তু যথায় বলা চলিবে যে, ইহা অমুক দ্রব্যের ভস্ম, তথায় আমাদের দ্বৈত জ্ঞান জানিতে হইবে।

কোন চিন্তা করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাওয়ার নাম অদ্বৈতবাদ। এবং তথা হইতে ক্রমে ক্রমে চিন্তা করিতে করিতে নামিয়া আসার নাম দ্বৈতবাদ। যেমন জল লইয়া চিন্তা করিলে, উহার তাপ, উহার কঠিনাবস্থা, তৎপরে জলের বাষ্পাবস্থায় গিয়া দাঁড়াইলে এই দেখা যায় যে, তথায় দুইটি মূল বাষ্প, যথা—হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ; অবশিষ্ট যাহা পড়িয়াছে, ইহার ঊর্দ্ধে মানুষের যাইবার অধিকার নাই। জলের মূল হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ইহা বাহির হইল, অতএব জল যৌগিক পদার্থ। তাহার পর, আমরা যদি জলের বাষ্পাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে চিন্তা করিতে করিতে নামিয়া আসি, তাহা হইলে দেখিব যে, ঐ বাষ্পদ্বয় এখানে একটি তরল শৈত্যগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য হইয়া পড়িয়াছে, আবার উহার তাপ হরণ করিলে, ঐ তরল, কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বরফ নাম পাইয়াছে। এখন জল, বরফ, এবং হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, বাষ্প মূলে এক দ্রব্য হইলেও স্থূলে উহারা স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে।

এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবকেই দ্বৈতবাদ এবং মূল এক হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ভাবকে অদ্বৈতবাদ বলা হইয়া থাকে।

"কাপড়" বলিলে, এক অদ্বিতীয় বস্ত্রকে বুঝাইয়া যায়, অতএব উহা বলা অদ্বৈত ভাব, তৎপরে সেই বস্ত্র দ্বারা যখন জামা চাদর, গামোছা রুমাল ইত্যাদি হয়, তখন্ত কাপড়ের দ্বৈতাবস্থা! কাহার সঙ্গে কাহার মিল নাই। জামার কার্য্য রুমাল করে না, এবং রুমালের কার্য্য জামা দ্বারা হয় না। দেখ, সেই এক অদ্বিতীয় বস্ত্র দ্বৈতাবস্থায় পড়িয়া, কেহ গাত্রে, কেহ পরিধানে, কেহ গাত্রমাছার কার্য্যে, কেহ বা মস্তকে পাগড়ী বা টুপি রূপে কেহ বা পদসেবার জন্য মোজা রূপে বিরাজিত। আমাদের পরমেশ্বর সেইরূপ এক অদ্বিতীয় হইয়া, কোন মূর্ত্তিতে আমাদের মস্তক অধিকার করিয়াছেন, কোন মূর্ত্তিতে আমাদের অঙ্গশোভা সম্পাদন করিতেছেন; আবার কোন মূর্ত্তিতে তিনি আমাদের পদানত দাসরূপে, দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। এই জগৎ, ঠাকুরের দ্বৈত লীলার ভূমি!

যাহাহউক, এক্ষণে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, যেমন বৃক্ষের এক মুখের (গোড়ার) কার্য্যের সঙ্গে অপর মুখের (আগার) কার্য্যের মিল নাই, সেই রূপ দ্বৈতাবস্থার কার্য্যের সঙ্গে অদ্বৈতাবস্থার কার্য্যের মিল নাই। মিল না থাকিলেও যেমন দুই মুখের দুই কার্য্য লইয়া বৃক্ষ জীবিত, সেইরূপ জ্ঞানের দুই মুখ; যথা, দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ লইয়াই এই বিশ্বসংসার পরিপুষ্ট! মানুষের জ্ঞান শুদ্ধ অদ্বৈতবাদে থাকিতে পারে না। এবং শুদ্ধ দ্বৈতবাদেও মানুষ থাকে না, থাকিতে পারে না। শুদ্ধ অদ্বৈতবাদে থাকিতে হইলে, মানুষকে মরিয়া যাইতে হয়,—স্বর্গে যাইতে হয়,—ঈশ্বর পাইতে হয়। এবং শুদ্ধ দ্বৈতবাদে থাকিতে গেলে, মানুষকে এত পরিশ্রান্ত হইতে হয় যে, তাহাই তাহার মৃত্যু! সেই মৃত্যুই তখন অদ্বৈতবাদ!

নিদ্রাবস্থায় আমরা একাকারের রাজ্যে চলিয়া যাই, অথচ আমরা বাঁচিয়া থাকি! কিন্তু সে সময় ভাবিতে পারি না, "আমি" বা "আমরা" আছি কি না? অথচ "আমরা" থাকি; নচেৎ নিদ্রাভঙ্গের পর বাঁচিয়া উঠি কি করিয়া? এই নিদ্রাই আমাদের অদ্বৈতাবস্থা। কারণ এ সময় আমরা জানিতে পারি না, আমি কে? আমার স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী আত্মীয় স্বজন কেহ আছে কি না? চন্দ্র, সূর্য্য, দিন রাত্রি কিছুই জ্ঞান থাকে না। অথচ এক অদ্বিতীয় "আমি" পড়িয়া থাকি।

এই অবস্থাই আমাদের অদ্বৈতাবস্থা, এই খানে আসিলে বিষ্ঠা চন্দন কিছুই জ্ঞান থাকে না। তাহার পর যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন দেখি, "আমি" পিতা, মাতা, ঘর, বাড়ী, পশু, পক্ষী প্রভৃতি কত জ্ঞান হইয়া যায়। যেন সাত বৎসরের আঁধার ঘর এক দীপালোক জ্বালিতেই আলোকিত হইয়া উঠিল। তখন কতই পৃথক্ পৃথক্ বস্তু দেখিতে লাগিলাম। আহা! এক এক বৃক্ষকে লক্ষ লক্ষ পত্র দিয়া সাজাইয়াছ, কিন্তু লক্ষটা পত্রের রূপ এক নহে। একটির সঙ্গে অপরটির কিছু না কিছু প্রভেদ রাখিয়াছ; যে প্রভেদে তুমি যে এক অদ্বিতীয় ইহার পরিচয় দিতে পারে, এমন পথ রাখিয়াছ। কোটি কোটি মানুষের মুখ কোটি কোটি ভাবে সৃষ্টি করিয়াছ। আহা! প্রত্যেক "মুখ" যেন আদর্শ। প্রত্যেকেই যেন এক অদ্বিতীয়; এই পরিচয় তোমার দ্বৈতরাজ্যে, তোমার স্বতন্ত্রের রাজ্যে বসিয়া আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। তুমি নিজে আদর্শ, তোমার হস্তের সমুদয় দ্রব্যই আদর্শ ভাবে, অদ্বিতীয় ভাবেই সৃষ্টি হয়। মরুভূমিতে অত বালুকাকণা রাখিয়াছ, কিন্তু প্রত্যেক বালুকাকণার ভিতর কিছু না কিছু প্রভেদ রাখিয়াছ। ঐ প্রভেদ টুকুই দ্বৈতভাব।

যতক্ষণ আমরা এ জগতে থাকিব, ততক্ষণ আমাদের দ্বৈতভাব থাকিবে। স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগ্নী, পিতা, পুত্র প্রভৃতি সমুদয় স্বতন্ত্র ভাবগুলি আমাদের রাখিতে হইবেই হইবে। নচেৎ আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া সবাই আমাদের ভাই ভগ্নী সম্বন্ধ! এই ভাবিয়া স্ত্রীকে ভগ্নী, মাতাকে ভগ্নী, কন্যাটি ও ভগ্নী এরূপ কেহ বলে বা ভাবে কি? জামার কার্য্য কি রুমাল করিবে? পিপাসা নিবারণ কি হাইড্রোজেন, অক্সিজেন খাইলে হইবে? এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, কেশব বাবুর সঙ্গে দেখা হইলেই বলিতেন, "কেশব! ভাই ব্রহ্ম, ভগ্নী ব্রহ্ম, কাপড় ব্রহ্ম, গরু ব্রহ্ম, থালা ব্রহ্ম, ঘটি ব্রহ্ম, বাটী ব্রহ্ম, ইত্যাদি ইত্যাদি সমুদয় ব্রহ্ম।"

ইহা শুনিয়া কেশব বাবু একদিন বলেন, "আপনি আমাকে দেখিলে থালা ঘটি ব্রহ্ম বলিয়া উপহাস করেন কেন?"

উত্তরে "উপহাস করিব কেন? সত্যই তোমাকে দেখিলে, আমাদের ব্রহ্মকে মনে পড়ে। যেমন সোলার আতা দেখিলে সত্যের আতা মনে পড়ে।" এই বলিয়া তিনি একটি গল্প বলেন, তাহা এই,—

এক রাজার এক গুরু ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ব্রহ্মে বিচরণ করিতেন,

এই ব্রহ্মচারী গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন। একদিন তিনি রাজাকে উপদেশ দিলেন, দেখ, জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই ব্রহ্ম। "সর্ব্বং ব্রহ্ম মিদং জগৎ।" ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই।

এই কথা শুনিয়া রাজা কৌতূহলী হইয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সমস্তই ব্রহ্ম ?''

"হাঁ সমস্তই ব্রহ্ম।" "আমি ব্রহ্ম'' "হাঁ তুমিও ব্রহ্ম।" "আমার স্ত্রী ব্রহ্ম ?" "হাঁ তিনিও ব্রহ্ম।'' "আমার মেয়ে ?" "হাঁ তিনিও ব্রহ্ম।'' "ঐ গরু বাছুর ব্রহ্ম ?" "হাঁ গরু বাছুর ব্রহ্ম।''

"বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি হইতে উদ্ভিজ্জ জগৎ, প্রাণী জগৎ, সমুদ্র জগৎ, যাহা কিছু জগতের সমস্তই ব্রহ্ম ?"

"হাঁ সমস্তই ব্রহ্ম।"

এইরূপ প্রশ্ন করিয়া এবং উত্তর পাইয়া রাজা বড়ই আনন্দিত হইয়া কহিলেন "এ বড় চমৎকার জ্ঞান! এতদিন ইহা শুনি নাই; অদ্য শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম।'' পরে রাজসভা ভঙ্গ হইলে, রাজা বাটীর ভিতর গেলেন এবং রাণীকে বলিলেন "দেখ! আজ গুরু-দেবের নিকট হইতে এক চমৎকার জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি। জগতে যে কিছু দেখিতেছ, সমস্তই ব্রহ্ম; তুমিও যা'; আমিও তাই, এবং আমার মেয়েও তাই! সেই এক ব্রহ্ম সকলেই!! এক কার্য্য কর—আমার বিধবা কন্যা বৈধব্য হেতু অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছে। আজ তোমার স্থানীয়া হইয়া সে আমার শয্যায় শয়ন করিবে!!!"

রাজার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবা মাত্র রাণীর মস্তকে যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া বিমর্ষ বদনে কহিলেন "এ সৃষ্টি ছাড়া জ্ঞানের কথা তোমায় কে বলিল ?"

রাজা। "কেন গুরুঠাকুর বলিয়াছেন।"

রাণী। "তিনি বিজ্ঞ, তিনি পণ্ডিত, তিনি আমাদের দেবতা! তাঁহার মুখ হইতে কখনই একথা বাহির হয় নাই।"

রাজা। "বিশ্বাস না কর, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে এস।"

রাণী তৎক্ষণাৎ গুরুর নিকট গেলেন এবং বলিলেন "ঠাকুর! অদ্য কি কথা "তাঁর'' কাছে বলিয়াছেন ?"

গুরুর হাসিয়া বলিলেন "কৈ মা' আমি ত কিছু বলি নাই।''

রাণী কহিলেন, "তিনি বাটীর ভিতর গিয়া ব্রহ্মময় জগৎ দেখিতেছেন। সমস্ত একাকার করিতেছেন!!''

গুরু কহিলেন ''বটে বটে এতক্ষণ পরে স্মরণ হইল, অদ্য রাজা ব্রহ্ম জ্ঞানের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাই আমি বলিয়াছি "জগৎ ব্রহ্মময়। সমস্তই ব্রহ্ম।"

রাণী কহিলেন ''সমস্তই যদি ব্রহ্ম হইল, তাহা হইলে সমস্তই কি এক ?"

"হাঁ তাই বটে।''

রাণী ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন, "সর্ব্বনাশ উপস্থিত! সমস্ত একাকার বলিলে এবং রাজা ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে, রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইবে। রাজ সংসার ছারেখারে যাইবে। প্রজায় রাজায় প্রভেদ থাকিবে না। রাজা সমস্ত একাকার করিবেন। অদ্যই তিনি ক্ষেপিয়াছেন, বলেন "তুমিও যা আর তোমার মেয়েও তাই! তবে তোমাতে এবং তোমার মেয়েতে প্রভেদ থাকে কেন ?"

এই কথায় গুরুদেব জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া রাণীকে বলিলেন "হাঁ! এতদূর পর্য্যন্ত রাজার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে! আচ্ছা, ব্রহ্মজ্ঞানের পরীক্ষা লও।"

রাণী করযোড়ে কহিলেন "কি পরীক্ষা ঠাকুর! আমার কি শক্তি যে ব্রহ্মজ্ঞানের পরীক্ষা লইব।''

গুরুদেব কহিলেন, "তুমি গিয়া অদ্য রাজাকে বলিবে, যে ব্রহ্মজ্ঞানের পরীক্ষা না দিলে, ব্রাহ্ম উপাধি লাভ করা যায় না! এবং ব্রাহ্ম উপাধি না পাইলে কখন একাকার করা চলে না। অতএব কল্য আপনার ব্রহ্মজ্ঞানের পরীক্ষা লইব, যদি অগ্রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরে একাকার করিবেন। পরীক্ষার বিষয় এই—কল্য রাজাকে অন্ন ব্যঞ্জন দিবার সময় একটী বাটীতে করিয়া কিছু বিষ্ঠা দিবে। যদি অপরাপর ব্যঞ্জনের মত রাজা বিষ্ঠাও খাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে জানিবেন যে রাজার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, রাজা যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী।''

রাণী পরীক্ষার বিষয় শুনিয়া বাটীর ভিতর গেলেন, এবং রাজাকে বলিলেন"আগামী কল্য বেলা দশ ঘটিকার সময় রন্ধনশালায় আপনার ব্রহ্মজ্ঞানের পরীক্ষা হইবে, তৎপরে আপনি একাকার ভাবিবেন এবং করিবেন। যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হন,তাহা হইলে আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী উপাধি পাইবেন না।"

রাজা রন্ধনশালার নাম শুনিয়া বলিলেন, "সেখানে কি পরীক্ষা হইবে ?'' রাণী হাসিয়া কহিলেন "কলাব্রহ্ম এবং কচুব্রহ্ম এই দুই ব্রহ্ম এক কি না তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে।''

রাজা কহিলেন"ব্রহ্ম দুই কি রে! এক ব্রহ্ম! কচুতেও যা কলাতেও তাই।"

রাণী। "তা'ত বটেই! পরীক্ষার সময় ও কথা বলিবেন। তাহা হইলেই পাস পাইবেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

সমালোচনা।

লিপিকৌশল। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ পাল প্রণীত। প্রচলিত বর্ণমালায় ত গোপনীয় বিষয় পত্রে লেখা যায় না। সেই জন্য রাজকৃষ্ণ বাবু কতক-গুলি কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই কৌশলগুলির সাহায্যে অনায়াসে মনোভাব প্রকাশ করা চলিবে, অথচ যিনি জানেন, তিনি ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারিবেন না। রাজকৃষ্ণ বাবু যে কৌশলগুলি আবিষ্কার করি-য়াছেন, সেইগুলিই যে সকলকেই ব্যবহার করিতে হইবে, এমন কিছু কথা নয়। তবে তিনি কতকগুলি কৌশলের নমুনা দেখাইয়াছেন মাত্র। বই খানি পড়িলে পাঠকগণও নিজে নিজে কৌশল আবিষ্কার করিতে পারি-বেন। বীরভূমির গ্রাহকগণ রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট ২৪ নং গোলকদত্তের লেন, হাটখোলা, কলিকাতা, এই ঠিকানায় একখানি টিকিট পাঠাইলেই ঐ পুস্তক পাইবেন।

সাবিত্রী—৩য় খণ্ড, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা। হিন্দু-রমণীদিগকে প্রকৃত সাবিত্রীর ন্যায় করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। লেখা বেশ হইতেছে। বিষয় নির্ব্বাচনও ভাল। সাবিত্রীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে আমরা সুখী হইব।

অনুসন্ধান।—১৮ই আশ্বিন, ২০শে কার্ত্তিক, ও ৭ই অগ্রহায়ণ। নূতন ধরণের সাপ্তাহিক পত্র। অনুসন্ধানের স্বরে গাম্ভীর্য্য ও লালিত্যের মধুর মিলন আছে। ব্যক্তিগত কুৎসা নাই, বৃথা আড়ম্বর নাই—সরল ভাবে কাজের কথা বলিয়াই অনুসন্ধান নিরস্ত। দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীদিগের জন্য সম্পাদকের আন্তরিক চেষ্টা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। সেকালের বাঁকুড়া রায় কৃষ্ণচন্দ্র ত আর নাই, এখন আমাদিগকেই মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের অন্নকষ্ট দূর করিতেই হইবে। সম্পাদকের চেষ্টা সফল হউক।

প্রয়াস।—১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। প্রয়াসের রচনার মাধুর্য্য আছে। এই সংখ্যায় স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা উপাদেয়। "মানস পরিণয়" গল্পটি মন্দ নয়। মোটের উপর কাগজ খানি বেশ চলিতেছে।

সংবাদ ও নানা কথা।

আমাদের ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল মহাশয় শীঘ্র অবসর গ্রহণ করিবেন। তাঁহার স্থানে সি, এইচ্ বম্পাস সাহেব আসিতেছেন। ভরসা করি, ইনিও শীল মহাশয়ের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয় হইবেন।

লাভপুর থানার এক ক্রোশ পূর্ব্বে গোবিন্দপুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সেই গ্রামে সীতানাথ পণ্ডিতের বাড়ীতে সম্প্রতি চুরী হইয়া গিয়াছে। যে ঘরে লোহার সিন্দুক ছিল, সেই ঘরেই অপর একটা বাক্সে ঐ সিন্দুকের চাবি ছিল। রাত্রিকালে চোর সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, লোহার সিন্দুক খুলিয়া ১২০০৲ টাকা নগদ ও ২২ ভরি সোণা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। শুনিয়াছি, স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট সাহেব তদন্তে আসিয়াছিলেন। এখনও চোর বা মালের কোন সন্ধান হয় নাই। শুনিতেছি, মাজিষ্ট্রেট সাহেব সাঁকুলিপুর থানার সবইনেস্পেক্টর বাবু রসিকলাল সরকারের উপর এই চুরির অনুসন্ধানের ভার দিয়াছেন। রসিক বাবুর সহিত আমাদের দেখা হইলে তিনি বলিলেন, যে যদি তাঁহাকে অপর কোন কাজ না করিতে হয়, কেবল ঐ চুরির তদন্তের জন্য তাঁহাকে ১ মাস নিযুক্ত রাখা হয়, তবে তিনি ইহার সন্ধান করিতে পারেন। রসিক বাবুর ডিটেক্‌টিভ্ ক্ষমতা আছে। আমাদের ইচ্ছা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব, কিছু দিন তাঁহাকে কেবল ঐ কার্য্যেই নিযুক্ত রাখুন।

গত ১২ই অগ্রহায়ণ হইতে তিন দিন কীর্ণহার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে সাঁকুলিপুর ও লাভপুর থানার নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা হইয়া গেল। তিন শতেরও অধিক ছাত্র উপস্থিত ছিল। ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বীরভূমিতে উক্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

এবার গোষ্ঠলীলা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেশচন্দ্র সরকার মহাশয় মহা সমারোহ করিয়াছিলেন। বহু-ব্রাহ্মণ ভোজন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়, রামায়ণ, যাত্রা, প্রভৃতি বিষয়ে মুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়াছেন। মোকাম ফরাসডাঙ্গার শ্রীযুক্ত জহুরিলাল গোস্বামীর যাত্রার দল বেশ গান করিয়া-ছিল। অন্যান্য সৎকার্য্যে সত্যেশ বাবু যেরূপ অর্থব্যয় করেন, দেব কার্য্যেও তদ্রূপ।

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ, বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কীর্ণহার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। স্কুল দেখিয়া তিনি অতীব প্রীত হয়েন। কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ তাঁহার সৌজন্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভূমিকম্পে স্কুল গৃহ ভগ্ন হওয়ার পর, গত বৎসর একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু সময়ে যত্ন না হওয়ায় অতিবর্ষায় গৃহটি ভূমিসাৎ হইয়াছে। এবার পাকা বাড়ী নির্ম্মা-নের উদ্যোগ হইতেছে। ভরসা করি, এবার যেন গৃহটি নির্ম্মাণ করা হয়। একটু মনোযোগের প্রয়োজন বই আর কিছু নয়।

সাঁকুলিপুর থানার অন্তর্গত আলিগ্রাম ইউনিয়নের আদায়কারী পঞ্চায়ৎ দাসফলগ্রাম নিবাসী রাধাকৃষ্ণ হালদারের বিরুদ্ধে কতিপয় প্রজা, বিগত নভেম্বর মাসে ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছে। দরখাস্তে কতগুলি গুরুতর অভিযোগ বর্ণিত আছে। দরখাস্তের মর্ম্ম এইরূপ:—আদায়কারী পঞ্চায়ৎ, অপর পঞ্চায়ৎগণের মত না লইয়া টেক্স ধার্য্যে করে। ইহাতে অনেকের প্রতি অবিচার হয়। তাহার ভাগিনেয় দফাদার, সে নিজে পঞ্চায়ৎ, সুতরাং চৌকিদারগণ যদি পাহারা না দিয়া তাহার মন যোগাইয়া চলে, তবে আর কোন কথা হয় না। সে একবার বদমাস শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। গ্রামের লোকে দরখাস্ত করায় সে একবার পঞ্চায়ৎ কার্য্য হইতে অবসৃত হয়। অথচ আবার ১৩০৫ সালে পুনর্নিযুক্ত হয়। ইত্যাদি।

গ্রামবাসিগণ পঞ্চায়তের বিরুদ্ধে বড় গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছে। এ বিষয়ের প্রকাশ্য তদন্ত হওয়া উচিত। আমরা মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ও হরিশ বাবুকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। যদি পঞ্চায়ৎ প্রকৃতই দোষী হয়, তবে তাহার দণ্ড হওয়া উচিত। আর যদি গ্রামবাসীরা মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদেরও শিক্ষা হওয়া উচিত। যাহা হউক, আমরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সুবিচারের আশা করি।

শুনিতেছি, সিয়ান হইতে সাঁকুলীপুর দিয়া লাভপুর পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইবে। আর কীর্ণহার হইতে সাঁকুলীপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটি কাঁচাই থাকিবে। ইহাতে আমরা দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। কীর্ণহার ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে সাঁকুলিপুর দিয়া বোলপুর পর্য্যন্ত যত লোক ও গাড়ী যাতায়াত করে, অপর রাস্তাটি দিয়া তত নহে। প্রথম পথে বর্ষাকালে কাদার জন্য যাওয়া যায় না; আর অপর সময়ে ধূলার উপদ্রবে যাইতে ভয় হয়। যেখানে পাকা রাস্তা হইবে হউক, তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই; তবে কীর্ণহার হইতে সাঁকুলির যাইবার পথটি পাকা না করিলে লোকের কষ্টের একশেষ হইবে।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ] চৈত্র। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

তোমারই খেলা।

"পঞ্চ ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" পরমেশ্বর এখানে "এক" হইয়া "তিন" হইয়াছেন; ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর ত আছেন। অথবা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ইহাত প্রতি মুহূর্ত্তেই চলিতেছে। তাহা ছাড়া তিনি আরও ফাঁদে পড়িয়াছেন। জড় বৃক্ষ এবং প্রাণী এই তিনে "তিনি" বাঁধা পড়িয়াছেন। তাই তিন জীব হইয়াছে।

বৃক্ষ জগতের দিকে প্রথম চাহিয়া দেখ "তিন" দেখিতে পাইবে। প্রথম একবীজদল উদ্ভিজ্জ (নারিকেল, তাল, পেঁপে ইত্যাদি) দ্বিতীয় বহুবীজ দল উদ্ভিজ্জ (পেয়ারা, নিচু, আম্র প্রভৃতি) তৃতীয় "লতা।" তাহার পর হউক অসংখ্য প্রকারের বৃক্ষ, লতা, গুল্ম; কিন্তু মোট ঐ তিনের ভিতর।

বৃক্ষের যেমন অসংখ্য জাতি ঐ তিনের বাঁধনে বাঁধা প্রাণী জগতের মানুষও তেমনি অসংখ্য ভাবের হইলেও, জগতের সমুদয় মানুষ "তিনে" বাঁধা। সে "তিনের" নাম, বদ্ধ, মুমুক্ষু এবং মুক্ত। আবার বলি, জগতের সমুদয় মানুষের ভিতর মোট ঐ তিন ভাবের মানুষ আছেন, যথা বদ্ধজীব, মুমুক্ষু জীব এবং মুক্ত জীব।

জড় জগতের বা বস্তু জগতের সমুদয় দ্রব্যই তিনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, যথা কঠিন, তরল এবং বাষ্পাবস্থা। এ প্রবন্ধে উদ্ভিজ্জ বিজ্ঞান বা জড় বিজ্ঞান বলা উদ্দেশ্য নহে। জীবের তিনটি অবস্থার উৎপত্তি এবং সমাপ্তি দেখান হইবে; অর্থাৎ ধর্ম্ম বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান দেখান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে দেখা যাউক, আমরা বদ্ধ হই কি করিয়া। "মানুষ" জন্মের

ISSUE(S) MISSING

পূর্ব্বে কোথায় থাকে? আমরা কোথায় ছিলাম? ইহার উত্তর অনেক পাওয়া গিয়াছে; কেহ বলেন, অন্নের মধ্যে ছিলাম, কেহ বলেন, পিতা মাতার রক্তের মধ্যে ছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা বলি মা আনন্দময়ীর পুত্র "আমরা" আমরা কোথায় আবার থাকিব? সেই "ঈশ্বরে" ছিলাম। সেই স্বর্গে ছিলাম। তাহার পর পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছি।

বায়ু এবং রক্ত (লৌহের জীবিতাবস্থার নাম রক্ত অতএব রক্ত ও পদার্থ জগতের কথা) যদি মানুষের জীবনী শক্তি হয়, তাহা হইলে হরিদাস ঠাকুরকে মাটির ভিতর পুতিয়া রাখিয়া কিছু দিন পরে যখন বাহির করা হয়, তাহা হইলে কখনই হরিদাস ঠাকুর আর জীবিত হইতে পারিতেন না। অতএব বায়ু রক্ত এবং অন্নাদি মানুষের বাঁচিবার প্রধান শক্তি হইলেও, মূলে যেন উহা কিছুই নয়! মানুষের জীবনী শক্তি যেন "একটা কিছু" বলিয়া জানা যায়। উক্ত "কিছুই" ঈশ্বর নামে অভিহিত। এই ঈশ্বর সংসারে আসিয়া প্রধান তিন ভাবে বিভক্ত হয়েন। উক্ত তিন ভাবের মধ্যে "বদ্ধের" ভাব এখানে একটি গল্প দ্বারা বুঝান হইতেছে। অর্থাৎ প্রথম মুক্ত পুরুষ কি ভাবে বদ্ধ হয়েন, তাহাই এই গল্পে বুঝা যাইবে।

এক সাধু, যোগ শেষ করিয়া, লোকের হিতের জন্য কোন গ্রামের এক জঙ্গলের নিকট আসিয়া নির্জ্জন স্থানে বাস করিলেন। সাধুর আর কিছুই ছিল না, কেবল এক লোটা এবং দুই খানা কৌপিন বস্ত্র মাত্র সম্বল। তিনি দিনমানে গ্রামের ভিতর গিয়া ভিক্ষা করেন; অদ্যকার উদর ভরিবে এই রূপ ভাবের চাউল ইত্যাদি পাইলেই সাধুর মহানন্দ! আর কিছুই চাহেন না। নিজের বৃক্ষতলে আসিয়া প্রকৃতির সঙ্গে খেলা করেন। দিন কতক পরে, সেই গাছে ইন্দুরের উৎপাত আরম্ভ হইল, সাধু সেই গাছের একটি শাখায় কৌপিন ঝুলাইয়া রাখিতেন, ইন্দুর তাহা কাটিতে লাগিল। কাজেই সাধুকে কৌপিনের জন্য ভিক্ষা চাহিতে হইত, "মাগো একটু কাপড় দে' মা!" অথবা "বাবা! একখানি কাপড় দাও" ইহা বলিতে হইত।

প্রতিদিন ইন্দুর সাধুর কাপড় কাটে, তাই সাধুকেও প্রতিদিন কাপড় ভিক্ষা করিতে হয়; ইহা দেখিয়া সাধুর এক বিজ্ঞ বাবা বলিল "তুমি রোজ রোজ কাপড় চাও কেন? এক কাজ কর, একটা বিড়াল পুষ!" সাধু ভাবিল কথাটা মন্দ কি? অতএব তিনি এক বিড়াল লইয়া গিয়া, নিজের বৃক্ষতলে রাখিলেন। ইহাতে ইন্দুরের উৎপাত কমিল বটে, কিন্তু সাধুর

আর এক উৎপাত বাড়িল। সাধু কোন দিন ফল খাইয়া কোন দিন নিরম্বু একাদশী করিয়া, কোন দিন বা রুটি কোন দিন বা সমস্ত দিনের পর যথা কালে এক সন্ধ্যায় চারিটী ভাত খাইতেন। কিন্তু বিড়াল পোষায় তাঁহার ঐ সুযোগে ব্যাঘাত পড়িল। সাধু নিরামিষ ভোজী, বিড়াল কিন্তু উহাতে মত দেয় না। গোলের কথা বটে! কাজেই দুই দিক বজায় রাখিয়া নিতান্ত আমিষ না হয়, অথচ বিড়ালের আপত্তি না থাকে এমন বস্তু যথা "দুগ্ধে"র জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ গৃহস্থের নিকট গিয়া ভিক্ষা করিতে হইত। আবার এইরূপ প্রত্যহ দুগ্ধ ভিক্ষা দেখিয়া সাধুর এক বাবা বলিয়াছিল, "সাধুজী! তোমায় কে প্রত্যহ দুগ্ধ দিবে, তুমি এক কার্য্য কর, একটা গরু পোষ তাহা হইলে, তোমার কিছু দুগ্ধ খাওয়া চলিবে, এবং বিড়ালও কিছু খাইবে।" মন্দ পরামর্শ নয় এই বলিয়া সাধু এক গরু পুষিল। গরুটি মাঠের ঘাস খায়, সাধুকে দুধ দেয়, কিছু দিন পরে সে কেবল ঘাস খাইতে নারাজ হইল, এজন্য সাধুকে মধ্যে মধ্যে গ্রামের ভিতর গিয়া খইল, বিচালী ভিক্ষা করিয়া আনিতে হইত। দিন কতক এই ভাবে ভিক্ষা করাতে সাধুকে এক বিজ্ঞ সংসারী বলিয়া দিল "মহারাজ জী! খইল বিচালী ভিক্ষা কত দিন করিবেন। আপনি যে মাঠের ধারে বাস করিয়াছেন, উপস্থিত ঐ মাঠ জমিদার মহাশয়দিগের নিকট খাজনা করিয়া লইয়া, এক কৃষকের সঙ্গে বখরায় চাস আরম্ভ করুন, তাহা হইলে, পরিণামে আপনাকে আর কিছু ভিক্ষা করিতে হইবে না।"

সাধু তাই করিল। জমী লইয়া চাষার সঙ্গে চাস আরম্ভ করিয়া দিল। সে বৎসর বেশ ফসল হইল, সাধুর এক বৎসরের খাবার সংস্থান হইল। সাধু একটী ক্ষুদ্র কুঁড়ে বাঁধিয়া তাহার ভিতর গরু বিড়াল লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তিনি "ব্রহ্মের" সেবা করিতেন, এখন সেই স্থানে তাঁহার বিড়াল সেবা, গরু সেবা আরম্ভ হইল। স্কুলের অধিকাংশ ছেলেরা স্কুল ছাড়িয়া দিলে, তাহাদের পাঠের যে দুর্দ্দশা হয়, এক্ষেত্রে সাধুর তপ জপের তাই হইল। চাস কার্য্যে ফল পাওয়াতে সাধু পর বৎসর দ্বিগুণ উৎসাহে চতুর্গুণ জমি লইয়া দশ জন কৃষকের সঙ্গে অংশ রাখিয়া অপেক্ষাকৃত প্রবল ভাবে চাস আরম্ভ করিলেন। সাধুর অদৃষ্ট ভাল। এবৎসরও হাজ শুকা হইল না। সাধু কিছু লাভ পাইল। এই লাভের টাকা লইয়া সাধু নিজেই লোকজন রাখিয়া প্রবল ভাবে চাস আরম্ভ করিলেন। সাধু

যত অর্থ বোধ করেন ততই সুখী হইতে লাগিলেন! গো সেবার লোক হইল। সাধুর বাড়ী হইল, সংসারীর যাহা হয়, প্রায় সবই হইল। তবে আর বৌ আসিতে বাকী থাকে কেন? সাধুর জাত ঠিক লোকে জানিত না বলেই সে গ্রামে কেহ মেয়ে দিল না। কিন্তু উহার স্থানে সাধুর যুবতী সেবাদাসী একজন নিযুক্ত হইল।

কিছুদিন পরে এই সাধুর গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত। গুরুদেব শিষ্যের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিলেন "এ কি করিয়াছ?" সাধু গুরুকে দেখিয়া অষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া কর যোড়ে হেটমুণ্ডে অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন "এক কৌপিন কা ওয়াস্তে য়্যাসা হুয়া।" অর্থাৎ আমার এক খানা কৌপিনের জন্য আমার এই পরিণাম হইয়াছে।

"বেশ হইয়াছে, কি করিয়া জীবে বদ্ধাবস্থায় পড়িয়া যায়, তাহার সুন্দর উদাহরণ তুমি রহিলে। তুমি কি জান না, ভাগবতে কোন শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ভ্রমর যদি সমস্তদিন কমল ফুলের ভিতর বসিয়া থাকে তাহা হইলে রাত্রে যখন কমল মুদিয়া যায়, সেই সঙ্গে ভ্রমরকেও উহার ভিতর বদ্ধ হইয়া যাইতে হয়। অতএব সাবধান! শান্তি রাজ্যের যোগীরা যেন সংসারের ধারে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাস না করেন। তুমি বাস করা দূরের কথা সংসারীর পরামর্শ পর্য্যন্ত লইয়া তাহাদের মতে কার্য্য করিয়াছ। তুমি জান না, যে পেঁয়াজ খায়, তাহার মুখ দিয়া পেঁয়াজের গন্ধ বাহির হয়। সংসারী কামিনী কাঞ্চন খাইয়াছে, উহাদের মুখ দিয়া,—উহাদের নিশ্বাস দিয়া,—উহাদের প্রতি লোম কুপ দিয়া কাম কাঞ্চনের মহা সৌরভ বাহির হইতেছে। তুমি তাহাদের পরামর্শে এখানে—"তুমি" বলিয়া যে জিনিষ ছিল, তাহা হারাইয়া ফেলিলে! "তুমি"র স্থানে এখন "আমি" হইয়া পড়িলে! তা' বেশ হইয়াছে! দাদ যেমন চুলকাইবার সময় সুখ! পরে জ্বালা, সংসার সেই রকম প্রথমে বড়ই সুখ! পরে জ্বালায় অস্থির করিয়া তুলে!"

বদ্ধের শেষ পরিণাম কেমন জান, ছেলেদের "দোর কাটাকাটি" খেলার মত। কতকগুলা ছেলে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া হাত ধরাধরি করিয়া দাড়ায়, উহাদের মাঝে একটাকে ফেলে সে বাহির হইতে চেষ্টা করে, মুখে বলে এ দোর দিয়ে যাব।" অপরে উত্তর দেয় "ঝাঁটা দিয়া মারিব।"

"তবে এ দোর দিয়ে যাব।"

হার পর পিতা
যে তোমাকে
তার সাক্ষ্য দিবার
উনি আমার

অন্য এক জন বলে "কোচ্‌তা পেটা করিব।"

"তবে এ দোর দিয়ে যাব।"

"জুতা ফেলে দে'ব।"

আহা! এইরূপে সে বালকটি আর কোন পথ দিয়া বাহির হ না। বদ্ধ সংসারীদিগকে দেখিলে, ভগবানের সেই বরাহ অবতারের ক মনে পড়ে। ঠাকুর পৃথিবীতে আসিয়া ছানা পোনা লইয়া, কর্দ্দমে পড়িয়া মহা সুখ ভোগ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া নারদ গিয়া বলিলেন "প্রভো! আর কেন? লীলা শেষ করুন, আপনি যে সেই অনন্ত! এখানে পড়িয়া কেন কষ্ট পাইতেছেন?"

"কে তুমি বাবা! ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছ, আমি সে ছেলে নই, আমার ধর্ম্ম আমি কিছুতেই ছাড়িব না। তুমি চলে যাও!!" নারদ হারিয়া গেল। এইরূপে স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা একে একে আসিয়া ঠাকুরকে বুঝাইতে লাগিলেন, ঠাকুর কিছুতেই বুঝিল না। সকলকেই বলিলেন "আমি পুত্র পৌত্র লইয়া বেশ সুখে আছি, কেন আর ভোগাও! কোথায় গোলক, কোথায় স্বর্গ! উহা আমার জানিবার প্রয়োজন কি? এইবার নাতিটী আমার এম, এ, পরীক্ষা দিবে।" দেবতারা যখন পরাস্ত হইলেন, তাহার পর, দেবের দেব মহাদেব কালরূপে আসিয়া "মৃত্যু" নামক এক ত্রিশূলের খোঁচা যখন ঠাকুরের উদরে মারিলেন, তখন ঠাকুরের চৈতন্য হইল। হাসিতে হাসিতে ভূলোক ছাড়িয়া গোলকের পথে উঠিলেন।

বদ্ধের প্রথমে যতই সুখ থাকুক না কেন, পরিণামে যদি কাহার ছয় মাসের মত ব্যারাম হয়, এবং তজ্জন্য যদি কোন আত্মীয়, এমন কি পিতা মাতা বা স্ত্রী হউন না কেন দিন কতক কিছু বলে না, তাহার পর যখন দেখে তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে, এ আর শীঘ্র উপার্জ্জন করিতে পারিবে না, বা আর বাঁচিবে না, ইহা কিছু বুঝিলে, এবং ক্রমাগত ডাক্তার বৈদ্যে ঔষধে পথ্যে ঘরের পয়সা ব্যয় হইতে থাকিলে, তাহার উপর রাত্রি জাগরণের পালা পড়িলে, শীঘ্রই উহারা বলিয়া বসে "এ যায়ও না, ভালও হয় না। হয় বাপু শীঘ্র শীঘ্র যা' নয় ভাল হ'।" তাহার পর ক্রমেই গঙ্গা যাত্রার পালা আরম্ভ হয়। যে বদ্ধজীবের অনেক অর্থ আছে, সে দাস দাসী রাখিয়া শেষটা সুখে মরিতে চায়। কিন্তু হাজার পয়সা দিলেও

যত অর্থ বোধ না পারিলেও উহারা পশ্চাৎ ফিরিয়া বলে "কেন? কিনে হইল। সাধুর মরবার নামটি নাই! আর ভোগাও কেন! আমি বাপু আর বৌ আসিতে পয়সার লোভে জান্ দিব নাকি?"

বলেই সে ক্ষণ কি জান? উহারা প্রায় প্রতি কথাতে "আমি" বলিয়া জোর মাত্রা দিবে। অর্থাৎ আমি যে বড়, আমার মান আছে, ইহা জানান চাই। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার স্কুল, আমার বাগান ইত্যাকার ভাবই বদ্ধাবস্থার ভাব।

এইবার মুমুক্ষু জীবের কথা বলা হইতেছে।

এই শ্রেণীর জীবেরা বদ্ধ এবং মুক্ত জীবের মধ্যস্থিত। ইহারা প্রকৃত বদ্ধ নহেন, এবং মুক্তও নহেন। দুই লা'য়ে পা দেওয়া গোছের জীব ইহারা!! পাঠ্যাবস্থায় যেমন জানা যায় না যে এ ছেলেটি পরিণামে কি হইবে, উকিল হইবে, কিম্বা ডাক্তার হইবে, মুমুক্ষু জীবও সেইরূপ। ইঁহাদের দেখিয়া বলা যায় না যে, ইনি পরিণামে বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হবেন কিম্বা মুক্ত মার্গে যাত্রা করিবেন। ইঁহারা জগতের যে দ্রব্য দেখেন, তাহা লইয়া বিচার আরম্ভ করেন। ইঁহাদের ভিতর যদি ও আমিত্ব আছে বটে, কিন্তু তাহা এইরূপ বিচারের উপর, যথা আমি কে? পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম, পরে কোথায় যাইব? ইত্যাকার ভাবই ইঁহাদের ভিতর বেশি থাকে। ফলে, যাঁহারা সংসারের রহস্য ভেদ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়েন, তাঁহারাই মুমুক্ষু জীব। একটি গল্প দ্বারা ইহা বুঝান যাইতেছে।

কোন এক সাধু বেদান্ত মতে উপদেশ দিতে ছিলেন। কেহ কাহার নয়! এ জগৎ মিথ্যা ইত্যাদি। ইহা শুনিয়া এক সংসারী বলিল, সাধুজী কেহ কাহার নয়, তাহাত বুঝিলাম। জিজ্ঞাসা করি পিতা মাতা কি আমাদের আপনার নহে? তাঁহাদের অংশ বিশেষ আমরা তখন "তাঁহারা" পর হইবেন কি করিয়া? আমার দক্ষিণ বাহু এবং বাম বাহু এই দুই বাহুতে কি "পর", সম্বন্ধ?

উত্তরে 'তাই বটে, দেহ তোমার কি? তোমার হইলে, উহা তোমার ইচ্ছামত আয়ত্বাধীন থাকিত। তুমি ত মরিতে ইচ্ছা কর না; তবু তোমার দেহ মরিতে যায় কেন? 'তুমি' জড় নও, তোমার মরণ নাই, তুমিই সত্য স্বরূপ, তুমি মরিবে কেন? দেহ তোমার কালের অধীন, খেলিবার পুত্তলি! তাহা তোমার খেলার অযোগ্য হইলে, তুমি আপনি উহা হইতে সরিয়া

দাঁড়াও! বস্তুতঃ তুমি এবং তোমার দেহ দুইটা স্বতন্ত্র, তাহার পর পিতা মাতার মীমাংসা নাই। বরং মাতার মীমাংসা সূতিকাগৃহে যে তোমাকে হইতে দেখিয়াছে, তাহার সাক্ষী পাওয়া যায়। কিন্তু পিতার সাক্ষ্য দিবার কেহই নাই। তুমিও প্রত্যক্ষ দেখিয়া বলিতে পার না যে, উনি আমার যথার্থই পিতা! এই সব মীমাংসা কেবল 'বিশ্বাস'।

পিতা, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি ইহাঁরা তোমার আপনার কি না তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি, কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহা করিতে হইবে। 'বিশ্বাস' কর; তর্ক ছাড়। তুমি যদি বল; পণ্ডিত মহাশয়, এরূপে ত্রিকোণ বিশিষ্ট কসি টানিয়া, আবার একটা আঁকুড়ি দিয়া "ক" লিখিব কেন? একটা চারি কোণ বিশিষ্ট লিখিয়া তাহার গাত্রে একটা দাঁড়ি টানিয়া 'ক' লিখা হইলে কেন উহা 'ক' হইবে না? এরূপ ইচ্ছার কথার উত্তর নাই; তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে সমুদয় বাঙ্গালি ঐরূপ 'ক' বিশ্বাস করিয়া লিখিয়া বিদ্বান হইয়া গিয়াছে। তুমিও উহা বিশ্বাস করিয়া লিখ পরিণামে সুখী হইবে, বিদ্বান হইবে। এখন বল, আমি যাহা বলিব, তাহা বিশ্বাস করিয়া করিবে কি?

'হাঁ করিব! প্রত্যক্ষ মীমাংসা পাইলে, কেন শাস্ত্রের তর্কের মীমাংসা শুনিতে যাইব?'

'তবে এক কার্য্য কর, অদ্য বাটী গিয়া, বুক্ গেল, বুক্ গেল, বলিয়া অসুখের ভান করিয়া গিয়া শুইয়া পড়। দেখিও, কেহ যেন তোমার কৃত্রিম অসুখের বিষয় জানিতে না পারে, তাহা হইলে একার্য্য পণ্ড হইবে। নিশ্বাস কখন জোরে নিক্ষেপ করিবে, কখন উহা আদৌ ফেলিবে না, কখন আস্তে আস্তে ফেলিবে। এবং কাটা পাঁটার মত কাৎরাইতে থাকিবে। ভিতরে যে খুব কষ্ট হইতেছে, ইহা জানাইবে। কেমন ইহা পারিবে ত?"

'খুব পারিব। আমি মহাশয়! থিয়েটরের দলে অভিনেতা, আমি সমুদয় ভাব নকল করিতে পারি।"

এই বলিয়া তিনি বাটী গিয়া, সাধুর কথিত ভাবে পরিণত হইলেন। বাটীর সকলে সম্মুখেই বিপদ বলিয়া জানিতে পারিল। সহসা পীড়া হইয়াছে, ইহা দেখিবার জন্য পাড়ার অনেক স্ত্রী পুরুষ আগমন করিলেন। তাঁহারা রোগী দেখিয়া বলিতে লাগিলেন "আহা! অমন ছেলে

আর দেখি নাই। যেমন স্বদেশ হিতৈষী, তেমনি বিনয়ী স্বভাব! একাধারে যতগুণ থাকা আবশ্যক তাহা সমুদয় উহাতে ছিল। এমন ছেলের অমন রোগ হয় গা'? মরি মরি ঈশ্বরের বিচার নাই। ছেলে নয়ত যেন সোণার কার্ত্তিক!" ডাক্তার আসিল, চেষ্টকোপ দিয়া বক্ষ পরীক্ষা হইল, নাড়ী পরীক্ষা হইল। কিন্তু রোগ ধরা পড়িল না।

ডাক্তার ম্লান মুখে বলিয়া গেল, শক্তরোগ! অপর কাহাকেও দেখান! রোগী বোধ হয়, শীঘ্র মারা পড়িবে!! ডাক্তার বিদায় হইল। বাড়ীতে কান্না পড়িয়া গেল। মা কাঁদিল, এবং বলিতে লাগিল 'বাবারে আমার! তুই কোথা যাবি রে বাবা! কত গু, মুত্র পরিষ্কার ক'রে, তোকে মানুষ করিলাম, তুই উপায় করিয়া, সংসার চালাইতেছিস্; তোর অভাবে সংসারের অবস্থা কি হইবে রে বারা!'

পিতা কাঁদিল এবং বলিল 'বৃদ্ধ আমি, আমার দশা কি হইবে? আমি কেমন করিয়া সংসার চালাইব! আর সে বল নাই যে, পূর্ব্বের মত চাকুরি করিতে যাইব! বাবা তোর কি হলো বাবা! মা' কালী, তুমি আমার পুত্রকে রক্ষা কর! তোমায় মা' জোড়া মহিষ দিব!

স্ত্রী কাঁদিল এবং বলিল "তুমি কোথায় যাও আমার দশা কি ক'রে গেলে, আমার ছেলেরা যে অনাথ বালকের মত সংসারে বেড়াইবে!

এমন সময় সেই সাধু ভিক্ষার ছলে তথায় আসিয়া উপস্থিত, সাধু আসিয়া বলিল 'ভিক্ষা দাও' কর্ত্তা বলিলেন 'আজ বাড়ীতে বিপদ, ভিক্ষা দিবে কে?"

"কি হইয়াছে?"

"তা' আর আপনাকে বলিয়া কি হইবে; আমার ছেলে মর মর।' কর্ত্তা কাঁদিল।

'চুপ করুন কাঁদিবেন না! আমাকে রোগী দেখাইতে পারেন? আমি রোগী দেখিলে বলিতে পারি সে বাঁচিবে কি না।

"আসুন' বলিয়া কর্ত্তা, সাধুকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। রোগী দেখাইলেন। সাধু রোগী দেখিয়া বলিল "বাঁচাইতে পারি। কিন্তু ইহাকে বাচাইতে হইলে, "একটি প্রাণের প্রয়োজন। যে প্রাণটি দিয়া ইহাকে বাঁচান হইবে, সে প্রাণটি কিন্তু মরিবে। এখন বলুন, কে ইহার জন্য প্রাণ দিবেন?"

কর্ত্তা। একটা ছাগল কিম্বা মহিষের প্রাণ দিলে হইবে না?

সাধু। হইতে পারে, কিন্তু ছাগলের প্রাণ পাইলে ইনি ছাগল হইয়া যাইবেন; তখন ইহার দ্বারা আর আপিশের কর্ম্ম হইবে না। কেবল ছাগলের মত ভ্যা ভ্যা করিবে। পয়সা আনিতে পারিবে না। অতএব ছাগলের প্রাণ দিয়া আপনাদের সুবিধা নাই। কেন? আপনার ত তিন কাল গত হইয়াছে, মৃত্যুর জন্য আর এক কাল অবশিষ্ট আছে। আপনি প্রাণটি দিউন না, আপনার ছেলে বাঁচিবে এখন। সংসার যেমন ছিল, সেইরূপ থাকিবে এখন। কর্ত্তা আপনি করুন না—প্রাণটি দিন না।

"মৃত্যু যন্ত্রণা বড় কষ্ট! তা' কি হয়। যা' হয় না, তাই আপনি বলিয়া বসিলেন!" এই বলিয়া কর্ত্তা ছল ছল নেত্রে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সাধু এই বার মা'কে বলিলেন "আপনি পুত্র শোকে মাথায় ঘটি মারিয়া রক্ত বাহির পর্য্যন্ত করিয়াছেন দেখিতেছি। আপনি প্রাণটি দিউন না। তাহা হইলে, কর্ত্তার কষ্ট হইবে না, ছেলে বাঁচিয়া যেমন পয়সা আনিয়া সংসার চালাইতেছিল, সেইরূপ চালাইবে। সব ঠিক থাকিবে। আপনার প্রাণ দিতে আপত্তি কি?"

"দিতে পারি; কিন্তু আমার ক্রোড়ে একটী শিশু সন্তান রহিয়াছে, সেটি তাহা হইলে অনাথ হইয়া যাইবে।"

এই বার সাধু, স্ত্রীকে বলিলেন "কেন বাছা! তোমার স্বামীর জন্য তুমি প্রাণ দিতে পার?" স্ত্রী বলিলেন, "তা' আর দিতে কি? হিন্দু স্ত্রীর সহমরণ প্রথা ত ছিল, ইহাতে আর নূতন কথা কি? উনি মরিলে আমি যে সুখে থাকিব, তাহাত নয়। আর এখনই বা কি সুখে আছি? কিন্তু আমি যেন মলুম্, তারপর উনি বিবাহ করিবেন; তাও মন্দ নয়। তৎপরে আমার গহনা গুলি তাকে দেওয়া হইবে। আর আমার ছেলে গুলি অনাথ হইবে! বেশ ব্যবস্থা!! সাধুজী তা' নয়; যদি মরিতে হয়, দু'জনে মরিব! ইহাইত সহমরণের নিয়ম!

এইবার সাধু বলিলেন, আর কেন, তুমি উঠিয়া বুঝ, কে কি বলিয়াছে। দেখিবে, সকলেই নিজের স্বার্থ রাখিয়া কথা বলিয়াছে। নিঃস্বার্থ কথা সংসারে কেহই বলে না। প্রতিবাসীরা বলিয়াছে, "উনি স্বদেশহিতৈষী" "নম্র" "দেখিতে সুশ্রী" সুশ্রী দেখা তাহাদের চক্ষের স্বার্থ। "নম্র" তাহাদের তুমি মান্য করিতে বলিয়া, তাহারা তোমায় "নম্র" বুঝিয়াছে। উহা

বলাতে তাহাদের মনের স্বার্থ আছে। তাহার পর "হিতৈষী" পয়সা কাহিত করিয়া থাক যদি, তাহাতে ত বেশ স্বার্থ আছে। পিতা বলিয়াছে, "বৃদ্ধ আমি! আমার দশা কি হইবে?" তুমি টাকা আনিয়া দিতে; মরিয়া গেলে ত তাহা আর আনিয়া দিবে না, কাজেই সেই স্বার্থের জন্য ঐ সকল দুঃখ জানান হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে সকলের কথা বুঝিয়া দেখ, দেখিবে, তাহাতে তাহাদের স্বার্থ রহিয়াছে। যেখানে দেখিবে মরা কান্না উঠিয়াছে, সেই খানেই কান্নার ভিতর স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে ইহা চেষ্টা করিলেই বুঝিবে। নিঃস্বার্থ ক্রন্দন নাই। এই বার বল দেখি, কে তোমার আপন?

"দয়াময় বুঝিয়াছি, আর নয়; সংসারে "তুমিই" আপন! আমার ভিতর তুমি এসেছ; এইজন্য "আমি" আমার আপন। আমার জ্বরের কষ্ট কষ্ট,—পয়সা দিয়া চাকর রাখিতে পারি, কিন্তু সে আমার জ্বরের কষ্ট লইবে কি? সকলে আমায় ফাঁকি দিবে, এই আছে, কল্য দেখ ইহাঁরা কত দূর চলে গিয়াছে! কিন্তু তুমি যাইবে কোথা? তুমি কায়া; আমি ছায়া!—তুমি প্রাণ সঙ্গে সঙ্গে যাবে! আমি আর তোমায় ছাড়ব না।"

এই বলিয়া সেই মুমুক্ষু ব্যক্তি সংসার ছাড়িয়া দৌড়াইল। ইনি মুক্ত পথ পাইলেন। কিন্তু ইহাঁদের পরিণাম যে মুক্তাবস্থা, তাহা ঠিক নহে। কেহ কেহ মুমুক্ষু হইয়া মুক্তমার্গে না গিয়া, বদ্ধমার্গে নামিয়া আইসেন। উদাহরণ,—এক অধ্যাপক ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন, "জগৎ ভ্রম; পিতা মাতা ভ্রম, পুত্র কন্যা ভ্রম,—কিছুই না! কাহার সন্তান মারা গেলে, যদি তাহাকে তিনি কাঁদিতে দেখিতেন, তাহা হইলে, আর নিস্তার নাই, ভ্রম বুঝাইয়া দিতেন! ছেলে মরেছে কাঁদ কেন হে! ছেলে কে? কিছুই না; সব ভ্রম! প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন। এই অধ্যাপকের একমাত্র পুত্র ছিল, সেটি কলেরায় মারা পড়িল! কিন্তু হায়! ব্রাহ্মণ লোক লজ্জার ভয়ে অর্থাৎ সকলকেই বুঝাইয়াছেন ভ্রম, তোমরা কাঁদিও না। আজ তিনি কি হিসাবে কাঁদিবেন? বামন মহা ফেরে পড়িলেন। কি করিবেন, নির্জ্জনে বসিয়া ব্রাহ্মণ পুত্র-শোক ভোগ করেন, কাঁদিয়া আকুল হয়েন। একদিন এমন সময় কতকগুলি ছাত্র আসিয়া তাঁহার পুত্রের গুণগান আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না; সর্ব্বসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া ছাত্রদের বলিলেন "বাবা,

! তোমারা শুন, আমার মুমুক্ষাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থায় যাওয়া হইল না, আমাকে পুনরায় বদ্ধাবস্থায় আসিতে হইল, তাহার কারণ সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বলিলে, সিদ্ধির নেশা হয় না, উহা আনিয়া বাটিয়া গুলিয়া খাইতে হয়, তবে সিদ্ধির নেশা হয়। সিদ্ধি বাটাই হইল কার্য্য! যথার্থ যদি মুমুক্ষাবস্থা কার্য্য দ্বারা অভ্যাস করিতাম, তাহা হইলে আজ পুত্রশোকে কাঁদিতাম না,—মুক্তপথ পাইতাম না, তোমরা আর মুখে কিছু বলিও না, কার্য্যে করাইয়া দেখাইও; মুখে বলা অভ্যাস করিলে, পরিণামে আমার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে"

তাহার পর মোক্ষ বা মুক্তজীবের কথা। ইহার উৎপত্তির কথা বিগত অগ্রহায়ণ সংখ্যা "বীরভূমি" তে বলা হইয়াছে। মুক্তজীবের মধ্যাবস্থা কেমন, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ জানি না, কারণ আমরা মুক্ত পুরুষ নহি। তবে অহিফেন খাইলে লোক মরে, ইহা দেখিয়াছি; নিজে খাইয়া মরিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া জানি নাই যে, অহিফেনে যথার্থ লোক মরে কি না! যদিও নিজের পরীক্ষা প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু উহা বিশেষ প্রত্যক্ষ যে, উহা বেশি খাইলেই মরিতে হইবে। সেই রূপ নিজে মুক্ত পুরুষ না হইলেও. গুরু দ্বারা উহার বিশেষ প্রত্যক্ষ আছে যে, মুক্তাবস্থায় কেবলি সুখ, স্বভাব বালকবৎ। কেহ কাহার নয়, তিনি জানেন। অথচ এত মায়া যে একটী বৃক্ষ পত্র ভাঙ্গিতে শিহরিয়া উঠেন! আহা! গাছের গা'য়ে ব্যথা লাগিল, বুঝি! চৈতন্য দেব, ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংস; এবং ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি মুক্ত পুরুষ ছিলেন। মুক্ত পুরুষের জন্য গল্প বলিতে গেলে ঐ সকল মহাপুরুষদের লইয়াই গল্প করিতে হয়।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছেন "মুক্ত পুরুষ নূনের পুতুল। একবার হরি নাম বলিলেই গলিয়া যান। নূনের পুতুল জলে ফেলিলে উহার আর অস্তিত্ব থাকে না। মুমুক্ষুরা নেকড়ার পুতুল! জলে ফেলিলে ভিজিয়া নরম হয়, তখন উহার হাত পা যে দিকে ইচ্ছা লইয়া যাওয়া যায়। বদ্ধ জীবেরা প্রস্তরের পুতুল, শত বৎসর ধর্ম্ম সাগরের জলে ডুবাইয়া রাখ, দেখিবে, তাহার কিছুই হয় নাই, যেমন ছিল, তেমনি আছে।"

মুক্ত পুরুষেরা কি আশ্চর্য্য মন্ত্রে লোককে বশীভূত করেন যে, দেশের অনেক রাজারাও পরিণামে ইহাদের পদসেবা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। ইহারাই মৃত্যুর পর "ভগবান" হইয়া যান।

ঠাকুরের কি খেলা কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। একটা স্কুলের বালক বাড়ী বালী উত্তরপাড়া, সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া পরমহংসের দক্ষিণেশ্বরের ঘরে বসিয়া উপদেশ শুনিত। ইহাতে তাহার পিতা জানিতে পারিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন, তুমি ওখানে যাইও না, উহাদের সংসারীরা স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। লোককে উহারা ভেড়া করিয়া দেয়। পুত্র কিন্তু পিতার এ উপদেশ না শুনিয়া প্রত্যহ স্কুল বন্ধ করিয়া পরমহংসদেবের ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিত। পিতা ইহা জানিয়া, এক দিবস তাহাকে খুব প্রহার দিল, এবং একটা ঘরে উহাকে আবদ্ধ রাখিয়া, চাবি দিয়া আপিসে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় আপিস হইতে আসিয়া, স্ত্রীকে কহিলেন, "উহাকে খাইতে দিয়াছ? উত্তরে "কৈ না, চাবি খুজিয়া পাই নাই।"

"এই চাবি লও, উহাকে খাইতে দাও।''. ঘরের চাবি খুলিবামাত্র যুবক সতেজে বহির্গত হইয়া পিতার সম্মুখে বলিল, "আপনি কে? আমার পিতা? কখনই না! আমার পিতা ঈশ্বর, আমার মার নাম আনন্দময়ী! আমি পিতার রাজ্যে বেড়াইতে আসিয়াছি! গাটরিটা আপনার বাড়া ফেলিয়াছি! এখন দেখিতেছি, বাড়ী ভাড়ার জন্য গাট্‌রিটা আপনি ছাড়িয়া দিতে নারাজ! লৌকিকতায় অবশ্য এ দেহটা আপনার বটে! ইহাকে আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু "আমাকে" আট্‌কাইয়া রাখা আপনার সাধ্য নহে,—জগতে কাহার সাধ্য নহে; এই আমি মুক্তপথে চলিলাম। আপনার দেহ লইয়া উহাকে—মারুন, কাটুন, দগ্ধ করুন, যাহা ইচ্ছা করুন" এই বলিয়া সেই তেজস্বী যুবক পিতার সম্মুখে তৎক্ষণাৎ খুর গলায় বসাইয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। অর্থাৎ নবজীবন পাইল।

আর এক গৃহস্থের স্ত্রীর স্বামী মারা গেল। যে দিন স্বামী মরিল, সেই হইতে তিনি হস্তে স্বর্ণ বলয় ব্যবহার করিলেন। নচেৎ পূর্ব্বে তাহার হস্তে রুলি ছিল। ইহা দেখিয়া অনেকে ভাবিল এবং কেহ কেহ তাঁহার মুখের উপর স্পষ্ট বলিল "তুমি কি পাগল হইলে?"

উত্তরে "কেন? সেই অক্ষয় ঈশ্বর আমার কাছে এত দিন কৃপা করে, একটা নশ্বর দেহের মধ্যে আসিয়া কত খেলা করিলেন, আমিও এতদিন তাঁহার চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কেবল তাই নয়; বন্ধুভাবে, স্বামিভাবে, পিতৃভাবে, মাতৃভাবে, পুত্রভাবে, কন্যাভাবে, দাসীভাবে, কত ভাবেই তাঁর সঙ্গে ভবের হাটে দাঁড়াইয়া ভাবের খেলা জুড়িয়া দিলাম। এক মৎস্যে কত ভাবের তরকারী প্রস্তুত করিলাম, একটা রুই মৎস্য লইয়া উহার ঝাল, ঝোল, হইল। আজ আমার সেই প্রভু নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় দেহ পাইয়াছেন। যতদিন তিনি নশ্বর রাজ্যে ছিলেন, ততদিন আমার নশ্বর রুলি ছিল, আজ তিনি অক্ষয় দেহ পাইলেন, আমিও অক্ষয় স্বর্ণ বলয় পরিধান করিলাম। অদ্য যে স্বামী পাইলাম, ইহার আর মরণ হইবেনা; একটী সাদা রংএর ভিতর সাতটি মূল বর্ণ পাওয়া যায়। ঐ সাতটি রং বিজ্ঞান দ্বারা ধরিয়া সাতটি স্থায়ী বর্ণ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। তেমনি প্রত্যেক মানুষের ভিতর বদ্ধ, মুমুক্ষু এবং মুক্তাবস্থা রহিয়াছে, সর্ব্বদাই উহার খেলা চলিতেছে। যে মহাপুরুষ ঐ তিনাবস্থার বিষয় বুঝিয়া অভ্যাস দ্বারা কর্ম্ম করিয়া উহা ধরিয়া স্থায়ী করিতে পারেন, তিনিই জগতে ঐ তিন অবস্থা প্রকাশিত করিয়া যান!

হরি এক জনের নাম, তিনি একটী পয়সা হারাইয়া ফেলেন, ঐপয়সাটীর চাড়ে তিনি অনেক অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না, তাহাতে তাঁহার কিছু কষ্ট হইল। পরক্ষণেই দেখা গেল, তিনি রাগিয়া এক মুঠা পয়সা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে অবশ্য তাহার অনেক পয়সা হারাইল, কিন্তু তজ্জন্য কষ্ট হইলনা, কারণ সে সময় "রাগ" যে! রাগ মিটিয়া গেলে, তিনি ভাবিতে বসিলেন, এবং মুখে বলিলেন "আমি করিলাম কি!" এই ঘটনার প্রথমাবস্থায় হারান ও তজ্জন্য কষ্ট, তাই সে সময় হরির বদ্ধাবস্থা। তাহার পর রাগ এবং হারান, কিন্তু কষ্টশূন্য, সে সময় হরির মুক্তাবস্থা। তৎপরে "আমি কি করিলাম" ইহা বলা, এসময় হরির মুমুক্ষাবস্থা। এইরূপ এক সময়ে উক্ত তিনাবস্থার লীলা অনেক দেখা যায়।

পূর্ব্বে যে দুইটি গল্প বলা হইয়াছে। ঐ গল্পের প্রথমাবস্থা এককাল, গল্পের শেষাবস্থায় পরকাল বা পুনর্জন্ম দেখান হইতেছে।

ঠাকুর আমার জড় জগতে পড়িয়াও তিনাবস্থায় দাঁড়াইয়াছেন। পদার্থ জগতে ঠাকুরের তিনঅবস্থা কি জান? পদার্থের কঠিনাবস্থাই ঠাকুরের বদ্ধাবস্থা। উহার তরলাবস্থাই ঠাকুরের মুমুক্ষাবস্থা। এবং উহার বাষ্পাবস্থাই ঠাকুরের মুক্তাবস্থা। বৃক্ষ জগতেও "আলোক লতা" দেখিলে ঠাকুরের মুক্তাবস্থা বুঝা যায়; এবং দ্বিবীজ দল, একবীজ দল উদ্ভিজ্জ দেখিলে, প্রাণেশ্বরের বদ্ধ এবং মুমুক্ষাবস্থা অনুমান করা যায়।

• আকাশের বৃষ্টির জল, সমুদ্রে পড়িলে লোনা, গঙ্গায় পড়িলে গঙ্গাজল?

নর্দ্দামায় পড়িলে দুর্গন্ধ জল হইয়া যায়। আবার নর্দ্দমার জল, গঙ্গাজল এবং সমুদ্রের জল সূর্য্যকিরণে শুকাইয়া ধূম হইয়া পুনরায় আকাশের জল হয়।

এখানে যা কিছু খেলা সবই সেই আমার ঠাকুরের খেলা! তিনিই বদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই মুমুক্ষু হইয়াছেন, তিনিই মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। প্রভু যেন নিজের চোখে কাপড় বাঁধিয়া এখানে আসিয়া "কানা মাছি" খেলা আরম্ভ করিয়াছেন। নিজেই পিতা মাতা, নিজেই পুত্র কন্যা; নিজই নিজের আত্মীয় স্বজন! পিতা সাজিয়াছেন, আবার ছেলে সাজিয়াছেন! ধন্য লীলাময়! এসব "তোমারই খেলা।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

কেন?

১

কেন তারে ডাকা আর?
সেত ভুলে সুখে আছে,
কাজকি ডাকিয়া কাছে,
কাজকি স্মরায়ে তারে গত সমাচার!
ভাঙি এ ভগন বুক,
পায় যদি পাক সুখ,
ভাঙা বুক ভাঙে যদি কি ক্ষতি তাহার!

২

সে কেন স্মরিবে আর?
দীনেশ নলিনী সনে,
রয় প্রেম আলাপনে,
কুমুদের ব্যথা সেকি ভাবে একবারে?
কি বেদনা এ হিয়ায়,
সে কেন বুঝিবে হায়,
মন্দার-কুসুম-মালা গলে শোভে যার,
(সেকি কভু স্মরে কথা বন-বিথীকার!)

৩

সে যদি রয়েছে সুখে,—
আশা-পথ চেয়ে হেন,
আর ডাকা ডাকি কেন,
সে অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা কেন আর বুকে।
ভুলে যদি সুখ পায়,
ভুলুক কি ক্ষতি তায়,
"তারি সুখে মোর সুখ"—সেকি শুধু মুখে?

৪

সেই এক দিন হায়!
কত ভাল বাসা বাসি,
কত সুখ কত হাসি,
কে জানে সুখের দিন দুদিনে ফুরায়!
কবে কোন সন্ধ্যাবেলা
খেলেছিল ফুল খেলা,
ঝরা ফুলগুলি শুধু রয়েছে হেথায়!

৫

ভেঙে গেল খেলা যদি,
সে শুষ্ক কুসুম মালা,—
কেন হেথা একি জ্বালা?
কেনবা মথিছে স্মৃতি—এ হৃদয় নদী।
প্রেম যদি চলে যায়,
স্মৃতি কেন জাগে হায়,
পরাণে সে গীতি কেন জাগে নিরবধি!

শ্রীনগেন্দ্রবালা দাসী।
মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথার কবি
বোলপুর।

চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদ।

(দাসকলগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত)

রসেতে আবেশ হয়ে, শ্যামচাঁদের মুখ চেয়ে
কহিছেন রসবতী রাধা।
ধর মোর বেশর ধর, আপন আচরে ভর,
করের মুরল রাখ বান্ধা॥
হারিলে বেশর দিব, জিনিলে মুরলী নিব,
আর নিব তোমার হাতের বাঁশী।
তোমারে জিনিয়া লব, আপন হৃদয়ে থোব,
নতুবা হইব তোমার দাসী॥
শ্যাম কহে হাসি হাসি, আমার মোহন বাঁশী,
পাষাণ বিদরে যার গানে।
কত গুণের বাঁশী মোর, কত ধনের বেশর তোর,
সমান করহ কোন গুণে॥
রাই কহে শুন শ্যাম, বেশর যাহার নাম,
দোলয়ে নাসিকা মুখ মাঝে।
যার রূপে মুখ আলা, আপনি ভুলেছ কালা,
হেন ধন নিন্দ কোন লাজে॥
তোমার বাঁশরী গানে, বধিলে অবলা প্রাণে,
এবে সে ঠেকেছ রাধার হাতে।
চণ্ডীদাসেতে কয়, বাঁশী গেলে প্রাণ রয়
খল বাঁশী না রাখিও হাতে॥

—:*—

আলিবর্দ্দী খাঁ।

যখনই অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ, তাহাদের প্রিয়তম সন্তান সন্ততির নিদ্রাকর্ষনের নিমিত্ত শয্যা পার্শ্বে শয়ন বা উপবেশন করিয়া

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়াল বর্গি এল দেশে।
চড়াই পাখীতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥"

এই ভীতি ব্যঞ্জক কবিতা যুগ্ম উচ্চারণ করিতে থাকে, তখনই আমার অন্তঃকরণে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাহাট্টা দমনকারী, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বিপদের বন্ধু, সেই সমর কুশল, প্রতিভান্বিত, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নাম সহসা স্মৃতি পথে উপনীত হয়। এবং তখনই তাঁহার গুণের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতে ইচ্ছা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মুসলমান মহিলা কুলের উজ্জল রত্ন, আদর্শ নারীর বুদ্ধি কৌশল, সাহস, রাজনীতি জ্ঞান এবং প্রতিভার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে হৃদয় বিস্ময় রসে আপ্লুত হইয়া পড়ে। যদিও আলিবর্দ্দী নাম পুরাতন, যদিও আলিবর্দ্দী কাহিনী উপন্যাস বৎ হৃদয় রোচক নহে তথাপি তাঁহার ও তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ ভাগিনীর চরিত্রে মনুষ্যের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় অন্তর্নিহিত আছে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সেই আদর্শ চরিত্রের চিত্র অঙ্কন ও সেই চিত্র পাঠক লোচনের সম্মুখীন করা অস্মাদৃশ লেখকের পক্ষে অসম্ভব, সন্দেহ নাই। যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা আলিবর্দ্দী সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না।

মুসলমান বাদসাহগণের রাজত্ব কালে বাঙ্গলা, বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ ত্রয়ের রাজকীয় কার্য্য সমূহ একজন শাসন কর্ত্তা দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। এই শাসন কর্ত্তাই তৎকালে "নবাব নাজিম" উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইতেন। মোগল সম্রাট অওরঙ্গজেবের পরলোক প্রাপ্তির সময় বিখ্যাত মুর্শিদকুলি খাঁ উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একবিংশ বর্ষকাল দক্ষতা ও সুখ্যাতির সহিত নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার জীবনাবসানে কিছুকাল তদীয় জামাতা পরে তাঁহার দৌহিত্র বাঙ্গলার নবাবের মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপর ১৭৪০ খৃঃ মুর্শিদকুলি খাঁর বংশের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং চির চঞ্চলা লক্ষ্মী মহম্মদ আলির প্রতি প্রসন্না হন। এই মহম্মদ আলিই পরিণামে আলিবর্দ্দী নামে সাধারণ্যে পরিচিত হইয়া ছিলেন।

মহম্মদ আলি তুরস্ক দেশীয় জনৈক মুসলমানের সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা প্রথমতঃ চাকরী করিবার নিমিত্ত স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আগমন করেন। এবং প্রভুর মৃত্যুর পর তথা হইতে সপুত্রক কটকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন

তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলিকে রাজ মহলের ফৌজদারের পদ প্রদান করেন। অতঃপর সুজাউদ্দিনের যত্নেই মহম্মদ আলি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে "আলিবর্দ্দী খাঁ" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। আলিবর্দ্দী কার্য্যতৎপর এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন সুতরাং কার্য্য ক্ষেত্রে তাঁহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তিনি ১৭২৫ খৃঃ কটকের সুবাদারী বা শাসন কর্ত্তৃত্ব পদ লাভ করেন এবং ১৭৩০ খৃঃ বিহার প্রদেশের শাসন ভার ও তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল।

উন্নতির দশা উপস্থিত হইলে বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা স্বতঃই কোথায় হইতে আসিয়া ভাগ্যবানকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তাহার অজ্ঞাতসারে চতুর্দ্দিকেই উন্নতির সোপান পরম্পরা বিনির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। অদ্য যে পথের ভিখারী, বহু কষ্টেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে কল্য সে হয়ত কোন এক রাজসিংহাসনের অধিকারী হইবে। যে সূত্রে সেই রাজপদ তাহার আয়ত্বাধীন হইবে তাহা সে সামান্য ক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কিছু জানিতে পারিতেছে না কিন্তু জগদীশ্বর তাহার চক্ষুর সম্মুখেই অলক্ষ্য ভাবে তাহার উন্নতির উপায় সমূহ স্তরে স্তরে সজ্জিত রাখিয়াছেন। বিধাতার এমনি সৃষ্টি কৌশল যে চিন্তা করিলে মনুষ্যকে একবারে স্তম্ভিত হইতে হয়। যাহাহউক কিরূপে আলিবর্দ্দীর পদোন্নতি হইতে আরম্ভ হইল এইবার আমরা পাঠকগণকে তাহাই দেখাইব।

আলিবর্দ্দী বিহারের শাসন কর্ত্তা হইলে পাটনা সহরে এক মহা গোল-যোগ উপস্থিত হইল। "বঞ্জার" নামক এক সম্প্রদায় দস্যু শস্য ক্রয়ের ছলনায় নগরে প্রবিষ্ট হইয়া সহর লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে এবং নগরবাসী দিগকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়া ফেলে। এই দস্যু সম্প্রদায় এবং তাৎকালিক কতকগুলি দুর্দ্ধর্ষ জমীদারকে শাসন করিবার নিমিত্ত আলিবর্দ্দী চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। এবং অবশেষে আফ্‌গান্ সৈন্যের সাহায্যে কৃতকার্য্য হন। এই সূত্রে আলিবর্দ্দী "বঞ্জার" দস্যুদলের সঞ্চিত অনেক ধনরত্ন ও হস্তগত করেন। তাঁহার রণদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহ তাঁহাকে তৎকালে "মহবৎজঙ্গ" এই উপাধি প্রদান করেন।

এই সম্মান জনক উপাধি লাভ করিয়া আলিবর্দ্দীর উৎসাহ ও কার্য্য-তৎপরতা সমধিক বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সাহের

প্রধান অমাত্য আইজাক খাঁ আলিবর্দ্দীকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

এই সময় সরফরাজ খাঁ বাঙ্গলার নবাব ছিলেন। তৎকালে উক্ত নবাবের চরিত্র এরূপ কলুষিত হইয়াছিল যে বাঙ্গলার অধিকাংশ জমীদার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই তাঁহার নামে খড়্গ ধারণ করিতেন। তাঁহার অত্যাচার ক্রমশঃ এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে একদা তিনি মুর্শিদাবাদের গণ্যমান্য, অগন্য অর্থের অধীশ্বর প্রসিদ্ধ জগৎশেঠের কুল বধূর প্রতিও অসদ্ব্যবহার প্রদর্শনে ত্রুটী করেন নাই। এই ব্যাপারে অনেকেই স্থির নেত্র হইয়া-ছিলেন এমন কি সরফরাজের ব্যবহার ও অত্যাচারে বঙ্গদেশ চমকিত হইয়াছিল। কিরূপে দেশের শত্রু দুর্বৃত্ত সরফরাজ সিংহাসন চ্যুত এবং বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হয় বাঙ্গলার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তখন কেবল তাহারই উপায় অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সকলে এক যোগে বাদসাহের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে আলিবর্দ্দী অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলমানের বিশেষ অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্রাটের নিকটও আলিবর্দ্দীর গুণপনা এবং বল বিক্রম অবিদিত ছিল না সুতরাং সাধারণ শত্রুর দমন জন্য সম্রাটের আদেশানুসারে শীঘ্রই নবাব সরফরাজের বিরুদ্ধে আলিবর্দ্দীকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল। মুর্শিদাবাদের পনর ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী তীরস্থ গিরিয়ার প্রান্তরে উভয় সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হয়। অবশেষে নবাব সরফরাজ সম্মুখ সমরে নিহত হইয়া দুর্বৃত্ততার ফল ভোগ করিলেন। এই সময় সরফরাজের সঞ্চিত অর্থ সামগ্রীও আলিবর্দ্দীর করতলগত হইল। দিল্লীর সম্রাট যদিও তৎকালে হীন প্রভাব হইয়া আসিতেছিলেন তথাপি আলিবর্দ্দী প্রভুর সম্মান প্রদর্শনার্থ এবং মনস্তুষ্টির নিমিত্ত নজরানা স্বরূপ সম্রাটের নিকট এককোটী সত্তরলক্ষ টাকা প্রেরণ করিলেন। হাতে হাতে আলিবর্দ্দীও তাহার প্রতিদান প্রাপ্ত হইলেন। দেশীয় জমীদার এবং রাজন্যবর্গের আগ্রহে সম্রাটের নিকট হইতে আলিবর্দ্দী বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী হস্তগত করিলেন এবং সাত হাজার সৈন্যের নায়ক, সুজাউল্-মুলক ও হিসাম উদ্দৌলা এই উপাধি লাভ করিলেন।

দাসত্বের ন্যায় কঠিন কার্য্য বোধ হয় সংসারে আর কিছুই নাই কারণ প্রভুর মনরক্ষা করিয়া জীবনযাপনের ন্যায় দুরূহ ব্যাপার জগতে অতি

দুর্লভ। একদা তোমার যে কার্য্য সন্দর্শনে অন্নদাতার তুষ্টি সম্পাদিত হয় অন্য সময়ে হয়ত সেই কার্য্যেই তাঁহার, তোমার প্রতি বিরক্ত জন্মিতে পারে। শুদ্ধ সম্রাট বাদসাহের কথা কহিতেছি না, যিনি প্রভু মঞ্চে সমাসীন, যাঁহার প্রতি কমলাদেবীর অনুকম্পা তাঁহার প্রকৃতিই এই প্রকার। যে আলিবর্দ্দী এতদিন সম্রাটের অনুরাগ ভাজন হইয়া কালযাপন করিয়া আসিতেছিলেন কালক্রমে কিছুদিনের মধ্যেই সেই আলিবর্দ্দী সম্রাটের অপ্রিয় পাত্র হইলেন। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট, মুরীদ খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব নবাব সরফরাজের ধন সম্পত্তি এবং দুই বৎসরের আয় আদায় করিবার নিমিত্ত বাঙ্গলায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আলিবর্দ্দীর কৌশলে মুরীদ রাজমহলে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেন। এই ব্যাপারের কিছুকাল পরেই বাঙ্গলায় "বর্গির হাঙ্গামা" উপস্থিত হয়। এখনও সেই বর্গির হাঙ্গামার কথা শ্রবন করিতে বঙ্গবাসীর সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত ও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে।

বর্গির হাঙ্গামা কি? এবং কি উপায়েইবা বঙ্গদেশ সেই হাঙ্গামা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল ক্রমশঃ তাহাই আমরা এইবার পাঠকগণকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে নবাব আলিবর্দ্দীর রাজত্বকালে দিল্লীর মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। সেই সময় আবার দক্ষিণ ভারতের এক প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু অধিবাসীর বাহুবল বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়া ছিল। এমন কি একদা যাঁহারা, অদম্য তেজস্বিতা এবং অসাধারণ বিক্রম প্রভাবে সাধারণের সমীপে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছিলেন তাঁহাদিগকেও দুর্দ্দম্য, অসীম বিক্রমশালী মাহার্ট্টাবীরগণ ক্রীড়া পুত্তলিকাবৎ পাইয়া বসিল। মোগল রাজবংশের পরাক্রম হীনতার পরিচয় পাইয়া মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ হিন্দু রাজত্ব সংস্থাপনোদ্দেশে দলে দলে বিভক্ত হইয়া মুক্ত অসি করে উত্তর ভারতের নানাস্থানে গতিবিধি আরম্ভ করিল এবং অবশেষে রাজ করের চতুর্থাংশ বা চৌথ আদায়ের নিমিত্ত বাঙ্গলা প্রদেশেও আগমন করিল। এই উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা মধ্যে মধ্যে অধিবাসীদের উপর যে সকল অত্যাচার করিত তাহাই অদ্যাবধি বাঙ্গলায় "বর্গির হাঙ্গামা" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে রঘুজি ভোঁস্‌লা নামক জনৈক বিবার প্রদেশীয় মহারাষ্ট্রীয় বীর বাঙ্গলার চতুর্থাংশ রাজকর আদায়ের নিমিত্ত তদীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে সৈন্য সামন্ত সহ বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দিলেন। ভাস্কর পণ্ডিতের সৈন্য দল বহু দলে বিভক্ত হইয়া বাঙ্গলার নানাস্থানে অধিবাসীদের উপর অত্যাচার ও যথেচ্ছ ব্যবহার এবং লুণ্ঠনাদি করিতে আরম্ভ করিল। বর্দ্ধমানের নিকট একদল মাহার্ট্টা সৈন্যের সহিত নবাব আলিবর্দ্দীর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। প্রথমতঃ মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রস্তাব করিল যে আমাদিগকে এককালীন দশলক্ষ টাকা প্রদান করিলে আমরা আর বাঙ্গলার উপর অত্যাচার করিব না। শান্তিপ্রিয় আলিবর্দ্দী যখন তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন তখন তাহারা আরও অধিক টাকার কথা উথাপন করিল সুতরাং আলিবর্দ্দী আর তাহাদের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না।

এই সময় আর এক দল মাহার্ট্টা—পুণার বালাজিরাওএর সম্প্রদায়—এগার লক্ষ টাকার চৌথ আদায়ের নিমিত্ত বাদসাহকে বশীভূত করিয়া ফারমান সহ বিহার লুণ্ঠন করিতে করিতে বাঙ্গলায় আসিয়া আলিবর্দ্দীর সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়। আলিবর্দ্দী, যুগপৎ সমাগত দুইদল প্রবল শত্রুকে দমনের নিমিত্ত চিন্তাকুল ও মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

বিধাতার প্রসন্ন দৃষ্টির সাহায্যে মানুষ বিপদে পড়িয়াও সহজেই তাহা হইতে উদ্ধার লাভের উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হয়। বালাজিরাওএর সম্প্রদায়কে বহুসংখ্যক অর্থদানে স্বপক্ষ ভুক্ত করিয়া তাহাদের আনুকুল্যেই আলিবর্দ্দী ভাস্কর পণ্ডিতের সম্প্রদায়কে সেবারের মত বাঙ্গলা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। কিন্তু পুনরায় পরবৎসর ভাস্কর পণ্ডিত সৈন্য সামন্ত সহ বাঙ্গলার অধিবাসীগণকে দর্শন দিলেন। বর্গির হাঙ্গামা বার্ষিক বিপদের মধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল। ইংরাজেরাও কলিকাতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত নবাব অলিবর্দ্দীর পরামর্শানুসারে নগরের চতুর্দ্দিকে একটী নালা খনন করিলেন সেই নালাই অদ্যাবধি "মাহার্ট্টাডিচ" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। এবারে ভাস্করের সৈন্য দল মুর্সিদাবাদের জগৎ শেঠের ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া লইল। এবং ক্রমশঃ হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, রাজসাহী, রাজমহল, মেদিনীপুর ও বালেশ্বর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। আলিবর্দ্দীকে নানা প্রকারে বিব্রত করিয়া প্রচুর অর্থের সংস্থান করাই মাহার্ট্টাগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্তই যে সময়ে

লোহিয়া।

(ফাল্গুন সংখ্যা ৫৬ পৃষ্ঠার পর)

এক দিন সন্ধ্যা কালে বনবিহগিনী লোহিয়া এইরূপে সাজিয়া বসিয়া সান্ধ্য নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, মৃদুল বায়ু তরঙ্গ আহত করিয়া উচ্চ কণ্ঠে গীত তরঙ্গে সে গভীর বন ভাসাইতেছিল। পশ্চিমে সূর্য্য ডুবিয়া গিয়া মেঘগুলিকে রক্তাভ করিয়া দিয়াছে। ২।১ টা তারকা কেবল 'ফুটি' 'ফুটি' করিতেছে, পূর্ব্বে পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে পূর্ণিমার চন্দ্র উকি মারিয়া লোহিয়ার সঙ্গে চোকো চোকি করিতেছে, লোহিয়া একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া গীত তরঙ্গে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছে। তখন তাহার বাঙ্গলা, বাড়ী, স্থান, কাল, কিছুই বোধ নাই, দক্ষিণ হস্ত মস্তকে ন্যস্ত করিয়া বাম হস্ত যথেচ্ছ পার্শ্বে ছড়াইয়া দিয়া পাদুখানি সরল ভাবে বারান্দায় ছড়াইয়া দেয়ালে ঈষৎ বক্রভাবে ঠেস দিয়া লোহিয়া গাহিতেছে। সে তার সাঁওতাল প্রাণের সাঁওতালি ভাব সাঁওতালি গানে প্রকাশ করিতেছে, পাঠক বাঙ্গলায় একটু শুনিবেন কি ?

লোহিয়া এই মর্ম্মে গাহিতেছে ;—

কতদিন জাগি মু (আমি) রহবি রে তোর লাগি,
নিদ নাহি আঁখে ভাত নাহি মুখে
বনে বন পথে ফিরেরে আঁখি পিয়া তোরি লাগি।
অরু (আর) কি কহব পিয়া কিছু নাহি চাই
আখির দেখা সুধু তাতেই সুখী, মু মরি সে লাগি।
ইত্যাদি।

প্রাণের প্রফুল্লতায় সে স্বর লহরী পরতায় পরতায় উঠিয়া বনভূমি প্লাবিত করিয়া দিল। পূর্ণিমার জ্যোছনা যেন তাহার নিকট ম্লান হইয়া গিয়াছে। লোহিয়ার নিকট তখন বহির্জ্জগৎ বিলুপ্ত, কেবল সে আর তার স্বর লহরী এই দুই ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব তাহার নিকট নাই। সেই স্বরলহরীর তালে তালে তাহার প্রাণ নাজানি কত অজানা দেশেই যাতায়াত করিতেছে, কত অজানা ভাবেই বিভোর হইতেছে ! (ক্রমশঃ)

———

এইবার সেই আদর্শ
ই এক কথা বলিতে অগ্রসর
সুখ দুঃখময় সংসারে বিচরণ ক
করিতে হয়। জীবন যাত্রা নি
ত্তও বিশ্রাম নাই। দম্পতির
াঙ্গ হইতে পারে না, সেইরূপ স্ত্রী
রক ক্রিয়াকলাপও পূর্ণতা লাভ ক
গুরুভার তোমার মস্তকেই রক্ষিত, শাখ।
তিপালিত হই জা ছে সত্য, কিন্তু
র্ম্মস্থান হইতে রাজ রস বদনে স্বীয়
তমা সহধর্ম্মি

মি।
ও সমালোচনী
[৭ম সংখ্যা।

লিবর্দ্দী খাঁ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সমসের খাঁ নামক জনৈক আফগান সেনানায়ক, তৎকালে বিহারের শাসনকর্ত্তা, আলিবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জৈন-উদ্দিনকে হত্যা করিয়া ফেলে এবং নবাবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আমেদ ও তাঁহার কন্যাকে বন্দী করিয়া বিহার অধিকার করে। এই সংবাদ আলিবর্দ্দীর কর্ণগোচর হইলে নবাব চিন্তা ও শোকে অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িলেন, এমন কি এসময় তাঁহার বেগম তাঁহাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ প্রদানে নিরস্ত থাকিলে তিনি একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেন না। মহামতি আলিবর্দ্দী বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। নবাব শান্তিরক্ষার নিমিত্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বিহারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে স্থানে শার্দ্দুলের আশঙ্কা সেই স্থানেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। পথিমধ্যে মার্হাট্টা সৈন্য তাঁহার সম্মুখীন হইল। ভাগলপুরের নিকট নবাবকে মহা-রাষ্ট্রীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল। পরে বিহার পৌঁছিয়া আলিবর্দ্দী সমসের খাঁর সৈন্যের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। আলিবর্দ্দীর রণকৌশল ও চতুরতায় সমসের অচিরে পাটনার নিকটবর্ত্তী বাঢ় নামক স্থানে পরাজিত এবং নিহত হইলেন।

ইতঃপূর্ব্বেই আলিবর্দ্দী, তদীয় ভগিনীপতি মীরজাফরের হস্তে মার্হাট্টা দমনরূপ মহাকার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। অনুপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে গুরুভার অর্পিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। মীরজাফর কোথায় স্বতঃ

পরতঃ শত্রু দমনে সচেষ্ট থাকিয়া ... কালাতি-
পাত করিবেন, না যৌবন-সুলভ ... আরম্ভ
করিলেন। ঐতিহাসিকগণ কোন ... াহসের
বর্ণন করেন নাই, স্বার্থপরতা এবং বি... দোষ
ছিল। যাহা হউক, আলিবর্দ্দী মীরজ... ...মা-
চার পাইয়া আতাউল্লা নামক জনৈক ... র
সহায়তার জন্য প্রেরণ করিলেন।
কিন্তু দুঃখের বিষয় এব্যাগ্রও সংগ্রামস্থ...
পশুর প্রকৃতিলাভ করিল। আতাউল্...
চেষ্টা না করিয়া, প্রভুর আদেশ পদ দলিত...
বর্দ্দীর বিরুদ্ধে মীরজাফরের সহিত পরামর্শ... আলিবর্দ্দী
নিজ আত্মীয় এবং বিশ্বস্ত সেনাপতিদ্বয়ের স্বার্থপরতা ও অসৎপ্রবৃত্তি পরিচালনার অনুসন্ধান পাইয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সিংহের পদার্পণে বনস্থল নীরব হইল। কুচক্রী সেনাপতিদ্বয় আলিবর্দ্দীকে আত্ম সমর্পণ করিল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী মার্হাট্টাদিগকে কটক হইতে বিতাড়িত করিলেন, কিন্তু প্রবল অত্যাচারী শত্রুদল পুনর্ব্বার কটক অধিকার করিল। অবশেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী দেশে শান্তি রক্ষার নিমিত্ত একনূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। আলিবর্দ্দী ছলে, বলে, কৌশলে কিছুতেই যখন বিরক্তিকর, দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর পৌনঃপুনিক উৎপীড়ন নিবৃত্তি করিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা তাঁহাকে নিজের অপচয় স্বীকার করিয়াও সন্ধি সংস্থাপন করিতে হইল।

আলিবর্দ্দী, মার্হাট্টাদিগকে কটক প্রদেশ প্রদান করিলেন এবং বাঙ্গলার একচতুর্থাংশ কর স্বরূপ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর বর্গির হাঙ্গামা হইতে দেশ নিষ্কৃতি লাভ করিল। মার্হাট্টাদের অত্যাচার ভয়ে পলায়িত প্রজাবর্গকে, আলিবর্দ্দী পুনরায় স্ব স্ব আবাসে আনয়ন করিয়া তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়া দিলেন। এতদিনে দেশে শান্তি সমীরণ প্রবাহিত হইল। আলিবর্দ্দীও নিশ্চিন্ত হইলেন।

আলিবর্দ্দী প্রসঙ্গে তাঁহার গুণবতী প্রণয়িনীর কথঞ্চিৎ গুণপনার উল্লেখ না করিলে নবাবের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত নিতান্ত অসদৃশ দেখায়, সেই

...াহিয়া।

(৫৬ পৃষ্ঠার পর)

...লোহিয়া এইরূপে সাজিয়া
...ু তরঙ্গ আহত করিয়া উচ্চ ক...
ছিল। পশ্চিমে সূর্য্য ডুবিয়া গিয়...
...১ টা তারকা কেবল 'ফুটি' 'ফুটি'
...ইতে পূর্ণিমার চন্দ্র উঁকি মারিয়া
...ছ, লোহিয়া একদৃষ্টে সেই দিকে
...ইয়া দিয়াছে। তখন তাহার
...াই, দক্ষিণ হ... ...নও
...াগিলেন।

কারণ আমরা এইবার সেই আদর্শ রমণী, আলিবর্দ্দী-বেগমের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম।

এই সুখ দুঃখময় সংসারে বিচরণ করিতে করিতে মনুষ্যকে বহু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাহার ক্ষণকালের নিমিত্তও বিশ্রাম নাই। দম্পতির শুভ সম্মিলন, ব্যতিরেকে যেমন মানব পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, সেইরূপ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সাহায্য ব্যতীত সাংসারিক ক্রিয়াকলাপও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তুমি পুরুষ, সংসারের গুরুভার তোমার মস্তকেই রক্ষিত, তোমার পরিবারবর্গ তোমার অনুগ্রহেই প্রতিপালিত হইতেছে সত্য, কিন্তু যখন তুমি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কর্ম্মস্থান হইতে বিরস বদনে স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাগমন কর, তখন হয় স্নেহময়ী জননী, নয় প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীই তোমার সেই ক্লান্তি নিবারণে যত্নবতী হইয়া থাকেন। তুমি সংসারের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া দৈহিক রক্ত জল করিতেছ, সংসারে রমণীকুল তোমার জন্য অবিশ্রান্ত শ্রম করিয়া ধমনীর রক্ত ক্ষয় করিতেছে, সুতরাং পরস্পরের সাহায্যেই যে সংসার পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুরুষ এই সংসারে, জীবন-তরণী চালাইতে চালাইতে যখন ক্লান্তিতরঙ্গের সম্মুখীন হয়, তখন সেই পতিপ্রাণা কামিনী ভিন্ন কেহই কাণ্ডারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না। সংসার-বিষবৃক্ষের ফলাস্বাদনে দেহ বিষ-জর্জ্জরিত হইলে প্রিয়ভাষিণী ভার্য্যাই মনুষ্য দেহের শীতলতা সম্পাদন করিয়া থাকে, জুড়াইবার এমন স্থান সংসারে অতি দুর্লভ। সেই কারণেই জগদীশ্বর রমণী জাতির দেহে দয়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম প্রভৃতি সৎগুণ সমূহ অধিক পরিমাণে প্রদান করিয়া স্বীয় সৃষ্টিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষের পরীক্ষা, লইয়া, প্রত্যেকের কার্য্যক্ষমতা অবগত হইয়া, আমাদের প্রাচীন হিন্দু-সমাজ প্রত্যেকের জন্য যথোপযুক্ত সাংসারিক কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যদিও কোমল মস্তিষ্কের ক্রিয়া কলাপ রমণীকুলের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে, যদিও সরল এবং অনায়াস-সাধ্য কার্য্য অবলাগণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি এই সংসারে সময়ে সময়ে অনেক স্ত্রীলোককে পুরুষোচিত কার্য্যের অনুসরণ ও সম্পাদনে সফলমনোরথ হইতে দেখা যায়। শুনা যায় অনেক রমণী পূর্ব্বকালে কেশ কলাপ আলুলায়িত করিয়া মুক্ত অসি করে ঊর্দ্ধশ্বাসে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিতা হইয়াছিলেন, অনেকেই

দেশহিতৈষণার পবিত্র অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদনার্থ প্রাণ-পাতে অগ্রসর ভিন্ন পশ্চাৎপদ হন নাই। এখনও প্রাচীন ইতিহাস একথার যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। মস্তিষ্ক পরিচালনার কার্য্যেও প্রাচীনকালের ললনা জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, ইহারও প্রমাণ দুর্লভ নহে। যাহা হউক, নারী হৃদয় বহু গুণের আকর। অনেকেই তাহাদের বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাহাদিগকে কেবল মাত্র ভোগ্য বস্তুর ন্যায় আদর করে, কিন্তু তৎকালে তাহারা বুঝিতে পারে না যে, রমণী-হৃদয় কিরূপ উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য উপাদান সংগ্রহে জগদীশ্বর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাদের কমনীয়তা যতদূর আদরনীয়, স্নেহ, প্রেমমতা, ভালবাসা প্রভৃতি সদ্গুণের একত্র সমাবেশ ততোধিক প্রশংসনীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনেক বড় বড় ঘরের বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সামাজিক রীতি, নীতি, আচার, পদ্ধতি ও বিষয় বুদ্ধি অনেক পুরুষের শিক্ষনীয়। কত কত রাজ-সংসার রমণীর কর্ত্তৃত্বে সমধিক উন্নত হইতে দেখা যায়, সেই সকল শিক্ষিতা রমণীর বুদ্ধিশক্তির নিকট বাস্তবিক অনেক পুরুষকেই স্তম্ভিত হইতে হয় এবং স্বীকার করিতে হয় যে, কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রেরও স্থানে স্থানে উর্ব্বরতা অসম্ভব নহে। তাই আমরা অদ্য পাঠকের নিকট একটী বড় ঘরের রমণীর গুণপণার বিষয় প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। আমরা যে রমণীর কথা বলিব, তিনি পাঠকের বিশেষ পরিচিতা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর প্রিয়তমা বেগম।

আলিবর্দ্দী স্বয়ং যেমন রাজনীতি-পরায়ণ ছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা বেগমও তদ্রূপ রাজনীতির সেবিকা ছিলেন! তাঁহার পুরুষোচিত ধৈর্য্য ও রাজনীতি প্রসঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াগিয়াছেন। তিনি বঙ্গের একাধিপতি, নবাব আলিবর্দ্দীর পাণি গ্রহণ করিয়াও রমণী-স্বভাব সুলভ বিলাস বাসনায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া কখনই স্বীয় দুর্ব্বলচিত্ত গঠনের সহায়তা করেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে বহুবিধ সদ্গুণের সমাবেশ সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া আলিবর্দ্দী তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার পরামর্শের বিপরীত পন্থায় কদাচ এক পদও অগ্রসর হইতেন না। তাঁহার বেগম, রাজকার্য্যের সময় মন্ত্রী, ক্লান্তির সময় সেবিকা, প্রমোদ ভবনে বিলাসিনী রমণী, বিপদে ধৈর্য্য ও সাহস-প্রদায়িনী ও সংসারে

চিরসঙ্গিনীর কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বদাই আলিবর্দ্দীর চিত্ততুষ্টি সম্পাদন করিতেন। এতাদৃশ রমণীরত্নকে সহধর্ম্মিনী রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই এবার আলিবর্দ্দী তাঁহার রাজত্ব কালের বহু বিঘ্ন বিপত্তির হস্ত হইতে রক্ষিত হইবার উপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী যখনই কোন কার্য্যে হতাশ হইয়া চিন্তানলে দগ্ধ হইতেন, তখনি তাঁহার প্রণয়িণী উপদেশ-বারি সিঞ্চনে তাঁহার চিন্তাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিতেন; আলিবর্দ্দীকে বীরোচিত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে দেখিলে বা তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বেগম মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহাকে উত্তেজিত ও সবল হৃদয় করিয়া তুলিতেন। যে মার্হাট্টা সংগ্রামে আলিবর্দ্দীর রাজত্ব কালের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধাংশকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, যে লুণ্ঠনপরায়ণ মার্হাট্টাগণ বারম্বার আগমন করিয়া বঙ্গবাসীকে উৎপীড়িত করিয়াছিল, সেই মার্হাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় নবাব তাঁহার বেগমের পরামর্শানুসারেই যুদ্ধের অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যে আফ্‌গান সমর এককালে বিপদের উপর বিপদ আনয়ন করিয়া যুগপৎ শোক ও চিন্তায় নবাব আলিবর্দ্দীর অন্তঃকরণ নিতান্ত নিস্তেজ করিয়া দিয়াছিল, তখনও নম্রে তাঁহার মহিষীর পরামর্শেই বিপদ সমুদ্রের কুল লাভ করিয়াছিলেন। সংসার-কার্য্যে ও ধর্ম্মকর্ম্মে চিরজীবন যাহারা পুরুষের সহায়তা করিয়া আইসে, তাহারা যদি বিষয় বুদ্ধি বা রাজকার্য্য পরিচালনায়ও প্রধান সহায় হয়, তাহা হইলে সংসারে আর আনন্দ রাখিবার স্থান হয় না। এতাদৃশ স্ত্রীরত্ন লাভ যে পরম সৌভাগ্যের বিষয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

নবাব আলিবর্দ্দী সর্ব্বগুণ সম্পন্না পত্নীর অন্তরালে বাস করিয়াই বহু কষ্ট ঝটীকার মধ্যেও চিরজীবন অনির্ব্বচনীয় শান্তি উপভোগ করিয়া গিয়াছেন।

আলিবর্দ্দী হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। হিন্দুরা যেমন তাঁহাকে ভালবাসিত, তিনিও তেমন হিন্দুগণকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত নবাব আলিবর্দ্দীর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র হিন্দুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মহাভারতের কোন কোন অংশ উর্দ্দুতে ভাষান্তরিত করিয়া নবাবকে সময়ে সময়ে শ্রবণ করাইতেন, নবাবও তাহাতে বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতেন। ইতিহাস ও পদ্য বিশেষ

প্রিয় ছিল। যদিও আলিবর্দ্দীর অর্থলালসা বলবতী ছিল, তথাপি তিনি এই বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কখনই কোন প্রজার অনিষ্ট বা সর্ব্বনাশে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি মৃত্যু কালে তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহার ভবিষ্যৎ বুদ্ধিও অতি সুন্দর ছিল। স্বধর্ম্মে আলিবর্দ্দীর যথেষ্ট আস্থা ছিল, তাই বলিয়া তিনি যে ধর্ম্মান্তরে বিদ্বেষী ছিলেন, এমত নহে। ইতিহাস পাঠে আলিবর্দ্দীর মুসলমানধর্ম্মের অনেক শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টার কথা অবগত হওয়া যায়, তিনি মুসলমান ধর্ম্ম মন্দির (মস্‌জিদ্) সমূহে যথাকালীন উপাসনার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, মৌলবীগণের শাস্ত্র ব্যাখ্যার নিমিত্ত সময় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সমাগত দীন দুঃখীগণের অন্ন বস্ত্র লাভের উপায় বিধান করিতেও ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে ন্যায় ও ধর্ম্ম-সঙ্গত বিচার লাভে কেহ কখনই বঞ্চিত হইত না। নবাব আলিবর্দ্দীর নৈতিক চরিত্রও যে পবিত্র ছিল, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী সন্দর্শনে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার নিয়ম এতাদৃশ কঠোর ছিল যে, বারনারীগণ তৎকালে নবাব প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবার জন্য কখনও তাঁহার অনুমতি লাভে সমর্থ হন না। বৃথা আমোদ বা আলস্য ক্ষণকালের নিমিত্ত কখনও আলিবর্দ্দীর অন্তঃকরণ নত করিতে পারে নাই। তিনি প্রত্যহ রাত্রি দুই ঘণ্টা থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিতেন।

ষোড়শ বর্ষকাল বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ১৭৫৬ খ্রীঃ ৪ঠা এপ্রেল তারিখে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সর্ব্বজনপ্রিয় নবাব আলিবর্দ্দী চিরদিনের জন্য ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। আলিবর্দ্দীর পুত্র সন্তান জন্মে নাই, কেবল মাত্র তিনটী কন্যা * ছিল। পুত্র সন্তান না হওয়ায় তাঁহার স্নেহ পালিত, আদরের দৌহিত্র বিখ্যাত সিরাজ-উদ্দৌলাকেই তিনি পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। আলিবর্দ্দীর পরলোক গমনের পর সিরাজ তাঁহার সিংহাসনের অধিকারী হন। শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আলিবর্দ্দীর দুই কন্যা, একজনের নাম ঘেসেটী বেগম, অপরের নাম আয়মানা বা আমীনা বেগম। শেষোক্তের গর্ভেই সিরাজের জন্ম। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, আলিবর্দ্দীর একাধিক কন্যা ছিল না। মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেনের মতে আলিবর্দ্দীর তিন কন্যা। মুতাক্ষরীণকার যখন আলিবর্দ্দীর সমসাময়িক ব্যক্তি এবং কুটুম্ব বলিয়া পরিচিত, তখন তাঁহার কথাই সত্য বলিয়া আমাদিগকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে।

কৌলিন্য প্রথা।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের বীরভূমিতে স্বদেশহিতৈষী ও সমাজ-সংস্কারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৌলিন্য মর্য্যাদা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইলেও তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে; আশা করি, মহাশয় নিজ পত্রিকায় প্রকটিত করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীশ বাবুর মতে খড়দহ, ফুলে, সর্ব্বানন্দী ও বল্লভী প্রধানতঃ এই চারি মেলের কুলীন সন্তানগণকে পরস্পর আদান প্রদান করিতে যুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, যে প্রথা দেবীবর ঘটকের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সামান্য লেখায় বা দুই এক জনের কথায় যে ঐরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে, এরূপ আশা কোনপ্রকারেই করা যাইতে পারে না। অধিক দিনের কথা নহে, অতি অল্প দিন হইল, আপনাদের বীরভূম জেলার মধ্যেই প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় চন্দ্রশেখরী মেলের সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে একটী মহতী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের কোন অভীষ্ট লাভ হইয়াছিল কি? তাদৃশ আয়োজন ও অধ্যবসায় প্রচলিত প্রথার নিকট সম্যক প্রকারে পরাস্ত হইয়াছিল। তবে যদি কোন প্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী ধনশালী ব্যক্তি এই চিরপ্রচলিত প্রথা পরিবর্ত্তন করিবার মানসে অসীম ধন ও পরিশ্রম ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক এই কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা হইলে সম্যক না হউক, কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের আশা করা যাইতে পারে। এরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে বিশেষ অধ্যবসায় ও অপরিমিত অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক। স্বধর্ম্মপরায়ণ অশেষ গুণশালী সমাজের নেতা দ্বারবঙ্গের মহারাজ, বর্দ্ধমানাধিপতি অধিরাজ বাহাদুর অথবা শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুরই আমাদের প্রধান অবলম্বন ও লক্ষ্যস্থল। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট নিবন্ধন তাঁহারা যে সহজে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, এমন ত বোধই হয় না। তন্নিমিত্ত আমি একটী প্রস্তাব করিতেছি, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে সম্ভবতঃ আমাদের এ বিষম দুর্দ্দিনে সুফল ফলিলেও ফলিতে পারে।

১। বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বোধ হয় স্ব স্ব পালটী ঘরের পাত্রের তাদৃশ অসদ্ভাব নাই তবে নিম্নলিখিত কারণ নিচয় বশতঃ অনটন হইতেছে।

(ক) কুলীন সন্তানগণ অর্থলোভে পালটী ঘর পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ঘরে বিবাহ করিতেছে।

(খ) উপযুক্ত কুলাচার্য্যাভাবে কোথায় কোন্ মেলের পাত্র আছে, তাহা জ্ঞাত হইবার কোন উপায় না থাকাতে এই বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে। মনে করুন আমি যোগেশ্বর ধনু চট্টো, ও ভগীরথ বন্দ্যোর পালটী। আমার পুত্রের বিবাহ কাল উপস্থিত হইল কিন্তু পালটী ঘরের লোকে কোনরূপ অনুসন্ধান লইলেন না, অগত্যা অন্য ঘরে আমাকে পুত্রের বিবাহ দিতে হইল। পক্ষান্তরে হয়ত ঐ সময়েই যোগেশ্বর বংশজ বা ভগীরথের বংশজ কোন ব্যক্তি মাদৃশ পাত্রের জন্য অন্ধকার দেখিতেছেন। এই সব দুর্ঘটনা ঘটিবার একমাত্র কারণ কুলাচার্য্য মহাশয়গণের তিরোধান। সংপ্রতি যাঁহারা ঐ ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অসত্য বাক্য হেতু কেহই বড় একটা বিশ্বাস স্থাপন করিত পারিতেছেন না। আবার দেখুন, কোন ব্যক্তি কোন একটী কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি ৪।৫ কন্যারত্ন লাভ করিলেন। একেত অর্থের অভাব, তদুপরি অবকাশ স্বল্প, এমন অবস্থায় পাত্রান্বেষণ হেতু নানা দেশ ভ্রমণ করিবার অবকাশও পান না; ফলে এই দুর্ব্বিসহ দুশ্চিন্তায় যৌবনে বার্দ্ধক্য অবস্থা প্রাপ্ত হন। আমার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে নিশ্চয় এই বিষবৃক্ষে অমৃতময় ফল উৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

২। যাবতীয় কুলীন সন্তানগণ স্ব স্ব বংশ পরিচয় বাসস্থান (নাম, ধাম, জেলা, পোষ্টাফিস ইত্যাদি) নিজ নিজ বাটীর সন্তান সন্ততির উল্লেখ করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট পত্রিকা সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন। (এরূপ করিতে হইলে বীরভূমির ন্যায় স্বদেশহিতৈষী পত্রিকার এই ভার গ্রহণ করা উচিত; এবং অন্যান্য বঙ্গীয় সংবাদ পত্রে সাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক।) ঐরূপে কুলীন সন্তানগণের পরিচয় পত্রিকাস্থ হইলে ঐ সমস্ত সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা,তাহা হইলে কুলীন সন্তানগণ ঐ পুস্তকের সাহায্যে ঘরে বসিয়া সামান্য পত্রে লিখিয়া অনায়াসে দুষ্কর পাত্রান্বেষণ কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

৩। কুলীন সন্তানগণকে অবশ্য বিশেষ নিয়মের বাধ্য হইতে হইবে, সে মত বারান্তরে প্রকাশ করিব। সংপ্রতি ইহাই বিবেচনার বিষয় সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

আমি এইখানে বসে রব।

১

আমি এইখানে ব'সে রব—
তোমাদের গান তোমাদের প্রাণ
তোমাদের সুর, তোমাদের তান,
তোমাদের হাসি তোমাদেরি ভাল
তোমরা আমায় কিছুই বলনা
একের বেদনা অপরে বুঝেনা,
একে জ্বলে মরি জ্বালাতে এসনা—
আমি আপনি আপন হব
আমি এইখানে বসে রব।

২

আকাশের তারা নব দুর্ব্বাদল
চেয়ে চেয়ে সারা নিশি,
আঁচল পাতিয়ে বুকে হাত দিয়ে,
হেথায় রহিব বসি।
(আমি) নিঝরে নিঝরে গিরীশ শিখরে
খুজিব হারাণ মণি
গহন বিপিনে বিজন পুলিনে,
নাশিব যতনে ফণি;
(আমি) বনের লতায় সে ছবি আঁকিয়ে
সে আঁখি আঁকিয়ে দিব,
দেখিব কে চায় আবার না চায়
আমিও ত সেথা রব!

দেখে সে নয়ন দেখি কোন জন
গৃহেতে ফিরিতে চায়,
যে জন এমন আমার এ মন,
সঁপিব তাহার পায়।

আমি তুষার মালায়, রচি শশধর
তাহে, কাজল কালিমা আঁকি,
আঁচল ভিজায়ে, ধূলা মাটি দিয়ে,
গড়িব চাতক পাখী।
(আমি) পাথরের গায়, আচল মুছায়ে,
সিন্দুরে সুরয গড়ি।
সরসির জলে সাঁতার কাটিয়ে,
আনিব নলিনী ছিড়ি।
(আমি) করতালি দিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে
গাইব নদীর কূলে।
(আমি) কেশগাছি ছিড়ে কাঁটায় গাঁথিব,
বনমালা বনফুলে।
(আমি) কোকিলার সনে, গা'ব উচ্চ তানে,
কুহু কুহু কুহু স্বরে।
(আমি) সমগ্র দুপুর দাড়াইয়ে রব,
গাছের শাখাটি ধ'রে।
বসন্ত বাতাস ছুটিয়ে বেড়াবে
শাখায় শাখায় ঘুরে।
বাজাবে বিটপি পাতায় পাতায়,
ঝর ঝর ঝর স্বরে;
প্রজাপতি সনে ~~ময়ূরী~~ নাচিবে,
ভ্রমরী গাইবে গান।
আধফোটা ফুল ছড়ায়ে পড়িবে,
পাপিয়া হাঁকিবে তান;

(আমি) হরিণী দেখায়ে চাঁদেরে ভুলায়ে,
হরিণে কাড়িয়ে ল'ব।
বুকে করে তায় জেগে রব নিশি
আমি কলঙ্কিণী হব।
পাহাড়ের গায় বিটপির ছায়,
লতার বাসর গড়ি।
লতা ফাঁসি দিয়ে মৃগেরে বাঁধিয়ে
ফুলের বিছানা পাড়ি।
পরাব বসন চাঁদের কিরণ,
আমি, বাসর জাগিয়ে রব।
নয়নে নয়নে বাঁধিয়ে দুজনে,
গন্ধর্ব্ব বিবাহ দিব।
আধফোটা ফুলে রচিয়ে মালিকা,
পরাব যতন করে।
(আমি) ফুলের লাগিয়ে এগাছ ও গাছ,
কেবল বেড়াব ঘুরে;
যদি জলাভাবে শুখায় লতিকা,
ঢালিব নয়ন জল,
মুঞ্জরি লতিকা ফোটাবে কোরক,
বহিবে হাসির ঢল।
হৃদয় ধারায় যত অশ্রু আছে,
আমি সকলি ঢালিয়ে দিব।
তবু যদি ফুল না ফুটিতে চায়,
আমি, কেঁদে কেঁদে মরে যাব।
আমি এইখানে বসে রব।

শ্রীমহম্মদ আজীজ উস শোভান।

সমাজ-সংস্কার।

'সমাজ-সংস্কার' কথটা এত পুরাতন হইয়াছে, এবং সংস্কার চেষ্টা পুনঃ পুনঃ এরূপ ভাবে বিফল হইয়াছে যে, ও কথাটায় আর আমাদের কোনরূপ মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। যেদিন হইতে এদেশে ইংরাজীর বাতাস বহিয়াছে, সেই দিন হইতে হিন্দুসমাজে সংস্কারের চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে এবং মহাত্মা রামমোহন রায় হইতে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আধুনিক ব্রাহ্মগণ পর্য্যন্ত সকলেই সংস্কারের প্রয়াসী হইয়া প্রভূত শক্তির অপচয় করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুসমাজ রামমোহনের অসামান্য প্রতিভার নিকট মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নাই; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গীয় ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া বিধবাগণকে সধবা করে নাই; অথবা আধুনিক ব্রাহ্মগণের ক্ষীণ চীৎকারে কর্ণপাত করিয়া আপনার অসারত্ব প্রতিপন্ন করে নাই। তাই বলিতেছিলাম, কেহ সমাজের সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন, শুনিলেই আমাদের মনে ধারণা হয় যে, সে চেষ্টা নিশ্চয়ই বৃথা হইবে, অতএব আর ও কথায় কর্ণপাত করিয়া কাজ নাই। অবস্থাভিজ্ঞ পাঠক জানেন, কথাটা এইরূপই দাঁড়াইয়াছে।

তবে কি হিন্দুসমাজের সংস্কার হইবে না? প্রাচীন জীর্ণ সমাজের কি সংস্কার আবশ্যক নাই? তবে কি আমরা চিরদিনই দেখিব যে, ব্রাহ্মণ নামধারী কদাচার-সম্পন্ন নরপশু সকল ধর্ম্মের নামে ঘোরতর অধর্ম্মাচরণ করিতেছে; অথাদ্য ভোজী কপটাচার ব্যক্তিগণ সমাজে পূজনীয় হইতেছে, আর সরল প্রকৃতিক সাধুহৃদয় মহাত্মাগণ কার্য্যানুরোধে বাধ্য হইয়া বা ভ্রমবশতঃ কোন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া সমাজ-বহিষ্কৃত থাকিবেন; কুলীন কুমারীগণের বিবাহ কার্য্য কি বরমাল্য প্রদানেই পর্য্যবসিত থাকিবে, আর নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কন্যাভাবে নির্ব্বংশ হইবে? অসম্ভব কথা! হিন্দুসমাজ কি এত গ্লানি, এত আবর্জ্জনা নীরবে বক্ষে বহন করিবে? তাহাও কখন হয়? তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি জানেন যে, বহুবার মনুপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সংস্কার হইয়াছে; আবশ্যক হইলে আবার হইবে।

ঐ অভয়বাণী শুন,

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতিভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

ভগবদ্বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। যখন সংস্কার অনিবার্য্য হইবে, তখন স্বয়ং ভগবানই সেই কার্য্য সাধন করিবেন। তোমার আমার এ কার্য্য নহে। এমন কি, রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ক্ষমতায় ইহা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই কার্য্য সাধনে স্বয়ং ঈশ্বর অথবা ঐশীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের প্রয়োজন। কেন, তাহা পরে বলিতেছি।

ব্যক্তিসমষ্টিই সমাজ। সমাজে অধর্ম্ম, অনাচার প্রবেশ করিয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে, সমাজস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিই অধার্ম্মিক ও অনাচারী হইয়াছে। তাহা হইলে, সমাজ-সংস্কার করিতে হইলে অধার্ম্মিক ও অনাচারী ব্যক্তিগণের সংস্কার করিতেই হইবে। যাহাতে ব্যক্তিগত চরিত্র উন্নত হয়, সংস্কারকগণের সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। নচেৎ সমাজ-সংস্কার অসম্ভব। ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতি দুই উপায়ে হইতে পারে। ১ম, সুশিক্ষা প্রদান করিয়া জন-সাধারণকে সৎপথে আনয়ন করা। ২য়, নিজের উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের আদর্শ লোক সমক্ষে স্থাপিত করিয়া তাহাদিগকে স্বচরিত্রানুবর্ত্তী করা। প্রথম উপায় ধীরে ধীরে কার্য্য করিতেছে। কোথাও বিফল, কোথাও সফল হইতেছে। কখন সুশিক্ষার নামে কুশিক্ষা দেওয়া হইতেছে, মানবকে উন্নতির পিচ্ছিল পথে লইয়া যাইবার ভ্রান্ত চেষ্টায়, অবনতির অন্ধকার গর্ত্তে পাতিত করা হইতেছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, দুইটি উপায়ের মধ্যে এইটিই প্রকৃষ্টতর। প্রথমটির ফল নিশ্চিত, দ্বিতীয়টির ফল অনিশ্চিত। আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। প্রথম উপায় সম্বন্ধে আমার এখন বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। আমার বিশ্বাস, যদি অভ্রান্ত ভাবে প্রথম উপায় পরিচালিত হয়, তবে ইহা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হইবে। তবে বর্ত্তমান সময়ে যে অভীপ্সিত সুফল পাওয়া যাইতেছে না, তাহা উপায়ের দোষ নহে, অবলম্বন প্রণালীর দোষ।

দ্বিতীয়টিই আমার এখন বিশেষ আলোচ্য। কেননা এই উপায় আমাদের দেশে বহুবার অবলম্বিত হইয়াছে ও বহুবার বিফল হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিকতর কার্য্যকর। কথাটা মূলতঃ সত্য হইলেও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সত্য নহে। অর্থাৎ সমাজের অবস্থা ভেদে ইহার কার্য্য অধিক বা অল্প হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিয়া ত লোককে সৎপথে আনয়ন করিবে। কিন্তু লোকের যদি সেই শিক্ষা গ্রহণ

করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে শুধু দৃষ্টান্ত কি করিবে? লোচন-বিহীনের দর্পণে কি করিবে? তাহা হইলেই দেখুন, দৃষ্টান্ত দ্বারা সমাজ-সংস্কার করিতে হইলে সমাজস্থ জন সাধারণের এতটুকু শিক্ষা থাকা চাই, যাহাতে তাহারাই দৃষ্টান্তের ফলভোগী হইতে পারে। তাহা না থাকিলে শত শত দৃষ্টান্ত চক্ষের সমক্ষে অহরহঃ বর্ত্তমান থাকিতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না। আর একটি কথা, লোকে যাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে, তাঁহার এমন শক্তি থাকা চাই, যাহাতে তিনি জন সমাজের অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেন। সৈনিকগণ যেমন সেনানীর আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করিয়া থাকে, জনসাধারণও তাঁহার আদেশ তেমনি ভাবে প্রতিপালন করিবে। সুতরাং নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে হইলে, সংস্কারককে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পূর্ব্ব হইতেই সমাজের নেতার আসন গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ তোমাকে পূর্ব্ব হইতে কেহ জানিল না, সহসা তুমি একটা সমাজ-বিগর্হিত কার্য্য করিয়া বসিলে লোকে তোমাকে মানিবে কেন? তোমাকে ত তাহারা সমাজদ্রোহী বলিয়া বিসর্জ্জন দিবে। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, যাহার সংস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহার বাহিরে দাঁড়াইয়া অপরকে কার্য্য করিতে বলিলে কেহ তোমার কথা শুনিবে না। তুমি যদি সমাজকে ভাল করিতে চাও, তবে সমাজের ভিতরে থাকিয়া যাহা করিতে হয় কর। বাহিরে দাঁড়াইয়া হৈ চৈ করিলে কোন ফল হইবে না। লোকে লাঙ্গুলহীন শৃগালের কথার ন্যায় তোমার কথা অগ্রাহ্য করিবে। তবেই দেখুন, সংস্কারক মহাশয়ের খুব সাবধান হওয়া উচিত,—যেন সমাজ তাঁহাকে গলহস্ত দিয়া বাহির না করিয়া দেয়। আরও একটি কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। তুমি যাহাকে সংস্কার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহাকে শতদোষ সত্বেও ভালবাসা চাই। তুমি যদি সর্ব্বদা হিন্দু সমাজকে গালি দিতে থাক, সর্ব্বদাই যদি হিন্দুদিগকে "ওরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার" বলিয়া মিষ্ট সম্ভাষণ কর, যদি ভগবদ্গীতাকে উপলক্ষ করিয়া বল "ইহা কি শাস্ত্র না নরককুণ্ড" তবে আমি হিন্দু, কেমন করিয়া তোমায় ভালবাসিব, কেমন করিয়া তোমার কথা শুনিব? আমি ত মানুষ, (পরম) হংস নহি যে তোমার বাক্যের জলটুকু বাদ দিয়া ক্ষীরটুকু গ্রহণ করিব? অতএব বুঝা গেল সংস্কারককে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে হইবে। সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলে সমাজ-সংস্কার করিতে পারিবে না। এখন দেখাইব,

আধুনিক সংস্কারকগণ উপরিউক্ত অনেকগুলি দোষে দুষ্ট ছিলেন। তাই তাঁহারা সফলকাম হয়েন নাই।

রাজা রামমোহন রায় মহা প্রতিভাশালী হইলেও সকল দিক বুঝিয়া যে কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন। অপর সকলে তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইবে কি না, দেশের তাৎকালীন অবস্থায় তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সাধারণে পরিগৃহীত হইবে কিনা, তিনি তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। ফলে এই দাঁড়াইল যে, তিনিও তাঁহার অনুগামী অল্পসংখ্যক ব্যক্তি হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা হিন্দুসমাজের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইলেন। সুতরাং তাঁহাদের কথায় হিন্দুসমাজ আস্থা করিল না, তাঁহাদের কর্ত্তৃক হিন্দুসমাজের বিশেষ কোন স্থায়ী উপকার হইল না। তবে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ে ও ধর্ম্ম স্থাপনে হিন্দু সমাজের পক্ষে অনেকটা শুভ হইল। শত্রুর আক্রমণে হিন্দুসমাজ অনেকটা বলসঞ্চয় করিল। ইহাও ভগবানের কার্য্য বলিতে হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও বুঝিবার ভুল হইয়াছিল। তিনিও বুঝিয়া দেখেন নাই, হিন্দু সমাজে তাঁহার শক্তি কতটুকু, তৎপ্রবর্ত্তিত সংস্কৃত প্রথা সমাজে চলিবে কিনা? দয়ার বশীভূত হইয়া তিনি সামান্য বিবেচনার পর একটা নূতন কাজ করিয়া বসিলেন। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে উপেক্ষা করিল। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় সহসা একটা কার্য্য না করিয়া, যদি ধীরে ধীরে আন্দোলন করিয়া সমাজের প্রধান প্রধান লোকদিগকে তাঁহার মতানুবর্ত্তী করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা না হউক, তাঁহার পরবর্ত্তী অপর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহ দ্বারা তাঁহার সংকল্পিত কার্য্য সুসিদ্ধ হইত সন্দেহ নাই। সমাজ-রণপ্রাঙ্গণে বিদ্যাসাগরের পরাজয় হওয়ায় অপর কেহ আর তাঁহার পতাকা লইয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইতেছে না। সুতরাং বিদ্যাসাগরের তিরোধানের সহিত বিধবা বিবাহের আন্দোলন হিন্দুসমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছে।

আর ব্রাহ্মগণ। তাঁহারা ত আমাদের পর হইয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারা যেরূপ অন্যায় ভাবে হিন্দুসমাজকে আক্রমণ করিতেন, তাহাতে হিত কথা বলিলেও মনে হইত তাঁহারা যেন অন্যায় কার্য্য করিতেছেন।

তাঁহারা যদি শত্রুর মত কথা না বলিয়া বন্ধুর ন্যায় আমাদের সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে আমরা অত চটিয়া যাইতাম না। আমাদের মনে হয়, কিছু দিন পূর্ব্বে (আমরা তখন স্কুলে বা কলেজে পড়িতাম), ব্রাহ্ম নাম শুনিলে মনে হইত যেন একটা বিকট দৈত্য মুখব্যাদন করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। কতকগুলি বিবেচনা-হীন লোকের কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত হওয়ায় এই অনর্থ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, বড়ই সুখের বিষয়, এখন আর ব্রাহ্মগণের সে ভাব নাই, তাঁহারাও আমাদিগকে আর গালি দেন না, আমরাও তাঁহাদের প্রীতির চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। ইহাইত চাই।

ব্রাহ্মগণ অসাধ্য সাধন করিতে চাহেন। আমাদের বলেন, তোমাদের যে সব আচার ব্যবহার সত্যকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তোমরা তাহা পরিত্যাগ কর। বলুন দেখি, আমি সহসা তাহা কেমন করিয়া করি? বাল্যকাল হইতে আমি হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছি, আমি কখন অপর জাতির অন্ন স্পর্শও করি নাই; কেমন করিয়া আজ আমি মুচির বাড়ীতে মাছের ঝোল ও ভাত খাই? আমার কোন পুরুষে বিধবা বিবাহের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, কেমন করিয়া আমি আজ বিমাতার বিবাহ দিতে পারি? এই সব বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। চিরন্তন প্রথা সহজে কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। তোমাদের মুরুব্বি সাহেবেরা কি সহসা কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়াছে? সুতরাং এ সম্বন্ধে জেদ করা ব্রাহ্মদের অন্যায় হইয়াছে বলিতে হইবে।

তবে এখন উপায়? মধ্যে মধ্যে মেরামৎ না করিলে কোন জিনিসই টিকে না। হিন্দু সমাজের শরীরও অনেক স্থানে ফাটিয়া আলগা হইয়া গিয়াছে। সংস্কার না করিলে কোন দিন পড়িয়া যাইবে। এখন কি করা কর্ত্তব্য? গীতার কথায় বিশ্বাস করিয়া কি চুপ করিয়া কল্কি অবতারের জন্য বসিয়া থাকিব? তবেই ত দেখিতেছি প্রতুল! নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেত চিরকালই বসিয়া থাকিতে হইবে। এরূপ অপদার্থ জাতির মধ্যে ভগবান কখনই আসিবেন না। আমাদের যতদূর জ্ঞান, তাহাতে এই বুঝিয়াছি যে, যদি কোন একটা কার্য্যের জন্য সমাজের সাধু প্রকৃতিক লোকে কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে ও সেই সঙ্গে নিজে উক্ত কার্য্য সাধনে সচেষ্ট থাকে, তবেই ভগবান তাহাদের কৃপা করেন।

"Heaven helps those who help themselves" অর্থাৎ যাহারা স্বকার্য্য সাধনে তৎপর ভগবান তাহাদের সাহায্য করেন। বর্ত্তমানকালে ইহার একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইয়া গিয়াছে, দেখাইতেছি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এমনি অধর্ম্ম স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল যে, সে স্রোত প্রতিরোধ করিতে একজন ঐশীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। ধার্ম্মিক লোকে ইহা বুঝিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি অনেক সাধুপুরুষ সেই জন্য গোপনে ধর্ম্মপ্রচার ও প্রাণের সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ইহার ফলেই চৈতন্য দেবের আবির্ভাব। এ কথায় কেহ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ইহাত মানিয়া লইতে হইবে,যে অনেক লোক যদি কোন কার্য্য সাধনের জন্য ব্যাকুল হয়, তবে কোথা হইতে অলক্ষিত ভাবে তাঁহাদের জন্য সাহায্য আসিয়া হাজির হয়। ইতিহাস এ কথার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। এখন কথা হইতেছে এই যে, আগে রোগ নির্ণয় তাহার পর চিকিৎসা। সমাজ শরীরে কোন্ কোন্ স্থানে রোগ হইয়াছে, অগ্রে তাহার নির্ণয় নিজে করিতে হইবে। নচেৎ সাহেবরা বলিল, তোমাদের অন্তঃপুর প্রথা ভাল নয়, আমরা অমনি বলিয়া বসিলাম দাও, মেয়েদের ঘোমটা খুলিয়া মেমেদের মত হাটে মাঠে পাঠাইয়া দাও। এরূপ করিতে নাই, দেখিতে হইবে সাহেবদের কথা সত্য কিনা? অন্তঃপুরে থাকিতে মেয়েদের কোন কষ্ট হয় কিনা? তাহারা বাহিরে যাইতে চায় কিনা? তাহারা বাহিরে গেলে আমাদের উপকার না অপকার? আরও একটা কথা ভাবা দরকার, সেই যে সর্ব্বত্যাগী ঋষিরা আতপচাউল আর কলা খাইয়া তোমাদের জন্য যে সব শাস্ত্র করিয়া গিয়াছেন, সেগুলা কি ছাই ভস্ম, কিছুই নয়? আর সাহেবদের কথা-টাই একবারে অভ্রান্ত সত্য। অতএব সকল দিক দেখিয়া বিশেষ বিবেচনা সহকারে দেখিতে হইবে, কোনটি আমাদের যথার্থ রোগ। তাহার পর ধীর ভাবে সকলে সমবেত হইয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে। একার্য্যে সময় চাই। আর চাই একতা, অধ্যবসায়, স্বজাতি-প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ও শ্রমশীলতা। সমাজে যদি এ সকল গুণ না থাকে (আমাদের ত বিশ্বাস খুব কমই আছে) তবে প্রথমে সেই গুলির অনুশীলন করা কর্ত্তব্য, কোন মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইলে এই সব গুণ চাই। এক কথায় জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে হইবে। নচেৎ অরণ্যে রোদন হইবে। দ্বিতীয় কথা সমাজ

সংস্কারের জন্য একটা সমবেত চেষ্টা চাই। রাজনীতির আলোচনার জন্য যেমন একটা কঙ্গ্রেস হইয়াছে, সমাজ সংস্কারের জন্য তেমনি একটা কঙ্গ্রেস করিলে হয় না? এই কঙ্গ্রেসের বৈঠকে ধীরভাবে সমাজের দোষ গুলি আলোচনা করিতে হইবে। তাহার পর যেটির পরিহার বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ হইবে, সেইটির উন্মূলনের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতে অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে লইলে হইবে না। তাহা হইলে রাজনৈতিক কঙ্গ্রেসের অনুচর সোসাল কনফারেন্সের মত ইহারও দুর্গতি হইবে। ইহাতে খাঁটি হিন্দু ভিন্ন অপর কেহই স্থান পাইবে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে লওয়া চাই। আর সমাজের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণও ইহাতে থাকিবেন। কোন স্বদেশহিতৈষী ধনবান ব্যক্তিকে এ কার্য্যের ভার লইতে হইবে। কেননা ইহাতে ব্যয় ভূষণ আছে। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর পরিচর্য্যা করিতে হইবে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিদায় দিতে হইবে।

অন্নদা বাবু "কৌলিন্য প্রথা" শীর্ষক প্রবন্ধে এইরূপ একটা কথার আভাস দিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে এই কঙ্গ্রেসের বৈঠকে সামাজিক কথার আলোচনা হইলে অনেকটা উপকার হইবে। (শ্রাদ্ধ সভায় স্মৃতির কূট তর্ক না তুলিয়া সামাজিক প্রশ্ন তুলিলে মন্দ হয় না)। এক একবার বৈঠকের ভার এক একজন ধনী লোককে লইতে হয়। তাহা হইলে আর কাহারও কষ্ট হইবে না। এরূপ বৈঠকের যে বেশ ফল হয়, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

কুলীনদের মধ্যে বিদ্যাধরী নামে একটি মেল আছে। বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ছব্বিশ পরগণা ও কলিকাতায় ইঁহারা বাস করেন। ইঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। সেই জন্যই বোধ হয় প্রায় সকলেই সকলের পরিচিত ও আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত লোক বেশী নাই। অথচ ইঁহারা স্বসমাজের একটা বেশ সংস্কার করিয়াছেন। সমাজ বহুদিনের হইলেই তাহার মধ্যে অনেক দোষ প্রবেশ করে। এ সমাজেও অনেক দোষ ঘটিয়াছিল। কে কোন কালে সপিণ্ডে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার বংশধর এখন কেহ নাই; অথচ ঐরূপ সপিণ্ড দুষ্ট কোন লোকের বিবাহে যে পাঠ ধরিয়াছিল, সেও বিশুদ্ধ দল হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে এই অল্প সংখ্যক কুলীনগণের মধ্যে নানা দল হইয়া উঠিয়াছিল। কন্যা বিবাহের পণও অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। গরিব

লোকের কন্যার বিবাহ হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বুদ্ধিমান উদারচেতা মহোদয়গণ অনেক পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, এরূপ ভাবে সমাজ অধিক দিন টিকিবে না। ইঁহাদের মধ্যে হুগলি জেলার সোরাবি নিবাসী ৺ উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া সর্ব্বস্থানের কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাজের দুরবস্থার কথা সকলের সমক্ষে বিচারার্থ উপস্থিত করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। স্বার্থপর কলহপ্রিয় লোকের আপত্তিতে উমাচরণ বাবুর বিপুল অর্থ ব্যয় ও ঐকান্তিকী চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কুটুম্বগণ কয়েকদিন রীতিমত আহার করিয়া পাথেয় ও বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। উমাচরণ বাবু ইহাতেও ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তিনি দ্বিতীয়বার উক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নির্দ্দয় কাল তাঁহাকে মরজগৎ হইতে অপসারিত করিল। ক্রমে লোকের কন্যার বিবাহের সময় আর পাত্র পায় না। কোন কোন ব্যক্তির কুলরক্ষা ভার হইল। লোক প্রমাদ গণিল। অবশেষে উমাচরণ বাবুর প্রচুর অর্থব্যয়ে যাহা হয় নাই, অল্পায়াসেই তাহা সুসম্পন্ন হইল। গত বৎসরে মাঘ মাসে বর্দ্ধমান সাতগাছিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীয় পুত্রের যজ্ঞোপবীত উপলক্ষে সকল কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে, ঘরের টাকা খরচ করিয়া সকলেই এই সামাজিক কঙ্গ্রেসে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে, বিদ্যাধরী মেল মধ্যে যে বিভিন্ন দল হইয়াছে, তাহা থাকিবে না। আর কন্যাধন ২৪৲ টাকার অধিক কেহ জোর করিয়া আদায় করিতে পারিবে না। প্রথম কথাটা ঠিক আছে। কিন্তু যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে শেষ কথাটা বা ঠিক থাকে না। তবেই দেখুন, পাঁচ জনে এক স্থানে মিলিত হইলে শুভ ফল হওয়ারই সম্ভব। সকলেরই এই সব কথা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

বীরভূমে অপ্রকাশিত হস্তলিখিত পুঁথি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদুদ্দেশ্য কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া প্রায় তিন বৎসর যাবৎ নানাবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে মনোযোগী ছিলাম। সম্প্রতি বীরভূমের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে নিযুক্ত আছি। ইতি-

বৃত্তের পরিশিষ্ট অধ্যায়ে, বীরভূমে "বিদ্যার অনুশীলন" 'গ্রন্থকার ও গ্রন্থাদি" সম্বন্ধে যথাসম্ভব বিশদরূপে আলোচনা করিবার বাসনা আছে।

আমার বিশ্বাস বীরভূমি, জগদ্বিখ্যাত চণ্ডীদাস, জয়দেব ব্যতীত, আরও ছোট বড় অনেক কবি ও গ্রন্থকারগণের লীলাক্ষেত্র; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একাল পর্য্যন্ত জনসাধারণের সম্পূর্ণরূপ অপরিজ্ঞাত। আবার, কত গ্রন্থকার স্বরচিত হস্তলিখিত পুঁথির সহিত লোক হৃদয়ে বিষাদ স্মৃতির ক্ষীণ রেখা পর্য্যন্ত মুছিয়া লইয়া চিরকালের জন্য লয়প্রাপ্ত হইতেছে! কত দিনে যে এই ধ্বংশ ক্রিয়ার বিরাম হইবে, তাহার স্থিরতা নাই।

এই সকল কারণ বশতঃ নানাবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করা, অথবা তদ্ভাবে গ্রন্থকারের পরিচয় সত্বর সাধারণের গোচরীভূত করা অতীব প্রয়োজনীয়। আর কালবিলম্ব করিলে, আমাদিগকে এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে যে, তাহার আর প্রতিকারের কোন উপায়ই রহিবে না।

বীরভূমে এই সংগ্রহকার্য্যের সূচনা স্বরূপ অদ্য আমরা কয়েকটি অপ্রকাশিত হস্তলিখিত পুঁথির বিবরণ প্রদান করিলাম।* যে সকল গ্রন্থকার, বীরভূম অথবা তৎসন্নিহিত স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত যথাসম্ভব সঙ্কলন করতঃ সময় ক্রমে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থের গুণাগুণ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ অপ্রকাশিত হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের সহিত পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ পরিচয় স্থাপন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধির সহায়তা করা হইবে। তাঁহারা স্বয়ং এইরূপ বিবরণ বীরভূমি সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলে নিশ্চয়ই তিনি সাদরে পত্রস্থ করিবেন। যদি সময়াভাব ঘটে, তাহা হইলে আমাদিগকে কৃপা পূর্ব্বক পুঁথির সন্ধান অবগত করাইলে, আমরা যে কোন উপায়ে হউক, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিতে যত্নপর হইব।

বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন না করিয়া পুঁথিতে যে প্রকার আছে, তাহাই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীশিবরত্ন মিত্র।
সিউড়ী—বীরভূম।

* ১-১২ সংখ্যক পুঁথিগুলি অধুনা Asiatic Societyর জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। লেখক।

১। জয়দেব চরিত্র। বনমালি দাস।

আরম্ভ

অজানু লম্বিত ভুজকলো কলাবদাতৌ
সংকির্ত্তনৈ কসিতজৈ কমলায়তক্ষৌ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ,
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।
শ্রীগৌর সুন্দরে বন্দিব সাদরে
সচিগর্ভে পরকাশ।
আমারে সদয় হয় দয়াময়
কর নিজ দাস।
কলির তিমির ঘোর অন্ধকার,
যাহার উদএ নাস,
যাহার চরণ, করিলে স্মরণ,
বিন্দাবনে হয় বাস।
... ...
বন্দো জয়দেব জাহার আসয়,
কেহনা বুঝিতে পারে,
শ্রীগিতগোবিন্দ কৃষ্ণলিলা অন্ত,
যে জন বর্ণিল তারে।
গ্রন্থের মহিমা কে করিব সিমা,
জগত ভরিল জসে,
কৃষ্ণভক্ত জনে যুনিল শ্রবণে,
পরাণ করিয়া বাসে।
ভক্তের বদনে শুনেছি শ্রবণে
জয়দেব চুড়ামণি
কৃষ্ণের অংসেতে জন্ম কেন্দলীতে
অবতার রূপ জানি
কেহনা জানএ কারে না জানাএ
বেড়্যাএ খেপার পারা
কৃষ্ণ কথা কয়া উনমত্ত হয়া
নয়নে গলয়ে ধারা
... ...
হরি হরি বলি কৃষ্ণ কথা গুলি
প্রেমের আবেসে নাচে
আচণ্ডালে কোল বলে হরি বোল
জারে দেখে নিজ কাছে
অজয় কিনারে গৌরক্ষান করে
যতেক গোয়ালাগণ
তাহাদের সঙ্গে দিনে ফিরে রঙ্গে
দিন হয় অবসান
রজনি সময় গ্রামে চলি যায়
ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে
গোদা পুস্কর্ন্নির পাহাড় য়ো পর
সাক অন্ন পাক করে।
আনন্দ হইয়া কৃষ্ণে নিবেদিয়া
ভোজন করএ নিতি
ভোজনের পরে হরিনাম করে
হইয়া একান্ত মতি
এই মত করি বঞ্চয়ে সর্ব্বরি
কেহনা বুঝিতে পারে
বনমালি দাস কিঞ্চিত আভাস
রচিয়ে তাহার বরে।
(১-২ পত্র)

মধ্য—

এক দিন গ্রীষ্মে কবি লিখিতে বসিলা
অর্দ্ধ চরণ লিখি কবি পুর্ণ (?) করিলা
অথ শ্রীগিতগোবিন্দে

স্মরগরল খণ্ডনং মম সিরসি মণ্ডনং
এই অর্দ্ধ পোক্তি লিখি আর না লিখিল
পুর্ন নাহি হয় কলি ভাবিতে লাগিল
শ্রীরাধিকার মনে কৃষ্ণের দগ্ধ হয় অঙ্গ
স্তুতি বাণি কহে চাহে রাধা অঙ্গ সঙ্গ
তুয়া সঙ্গ বিনা মোর মদনের স্বরে
স্বরের গরলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে
মান তেজি কৃপা করি পরস মোরে তুমি
মদন আনল হৈতে রক্ষা পাই আমি
এতবলি নিজশির নম্র করি জাঅ
পদ্যপদ্ম দেহ মাথে এই সে আসঅ
কৃষ্ণচাহে পাদপদ্ম মস্তকে ধরিতে
কেমনে লিখিব ইহা বিস্ময় এই চিতে
এই ভাবি পদের শেষ লিখিতে নারিল
কি লিখিব কি করিব চিন্তিতে লাগিল

... ...

পৌষ মাস সংক্রান্তির উদয় সময়ে
তুই বাহু দেখাইব কহিল নিশ্রয়ে
কদম খণ্ডির ঘাটে যে করিবে স্নান
গঙ্গাস্নান কতবারে নহিব সমান
পৌষমাস সংক্রান্তির সুনহ মহিমা
কদম্ব খণ্ডিতে স্নান জে করিবে জাঞা
সতক্রোটি জিন্মের পাপ বিনাস হ'য়া
অনাআষে নিজাভিষ্ঠধাম প্রাপ্তি হবে

... ...

আজি তব গ্রীহে কৃষ্ণ করেন ভোজন
এত বলি গঙ্গাদেবী হইল অদর্শন
মোর গ্রীহে আইলা বুঝি মোর রূপধরি
সেবা পূজা ভোগ আদি স্বহস্তে আচরি
ভোজন করিয়া জদি করিলা সয়ন
নিজ হস্তে গ্রেন্থ জদি করিলা লিখন
গ্রেন্থ যদি লিখিয়াছেন তবে সে মানিব
গ্রেন্থের অক্ষর জদি নয়ানে দেখিব
এক চিত্তে গ্রন্থপাত খুলিলা ঠাকুর
অর্দ্ধকলি ছিল পদ হইয়াছে পুর
অর্দ্ধকলি পূর্ব্বে কৈলা জয়দেব সার
কৃষ্ণহস্তে দেহি পদপল্লব মুদার
পদপূর্ণ দেখি মোনে হইল প্রত্যয়
কৃষ্ণ পূর্ণ কৈল মোর মোনের আসয়

শেষ—

সমাপ্ত হইল জয়দেব চরিত্র
স্বরণে নিসংস পাপ হয় স্বরির পবিত্র
রাধামাধবের কৃপা অনাআসে হয়
শ্রীবিন্দাবনে সেইজন অবষ্য জন্ময়
শ্রীরূপ গোপাল ভট্ট প্রভুশ্রীনিবাস
জয়দেব চরিত্র কহে বোনমালিদাস।

ইতি শ্রীজয়দেব চরিত্র সমাপ্ত।

ইতি লিখিত শ্রীগুরুচরণ দাস পরগণে আলিনগর দরুণ সাকিম থএর পাড়া মোকাম সিউড়ী মালফটক। পাঠক শ্রীকালীচরণ দত্ত মক্ষদার সাহানান পুর সাকিম বৌভন্ত ইতি সন ১২০৮ সাল তারিখ ৩রা ফাল্গুন শনিবার ভৌইমিক একাদসী।

শ্রীবনমালি দাস সঙ্গীত আচার্য্য।
শ্রীনিত্যানন্দ সেবা বিনা নাহি জার কার্য্য॥

পত্র সংখ্যা ২৪। প্রাপ্তি স্থান নুড়াই সাতকড়ি সূত্রধরের বাটী।

লোহিয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পশ্চিমদিকের রাস্তা বহিয়া একটী কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। অশ্বারোহী অশ্ব ফিরাইয়া দক্ষিণ দিকে লইয়া বকুল গাছে অশ্ব বাঁধিলেন, এবং নিজে ধীর পাদ বিক্ষেপে বারন্দায় উঠিয়া দেখিলেন, ঘরে চাবি বন্দ; ধীরে ধীরে বারান্দা দিয়া লোহিয়ার পশ্চাতে (ঈষৎ পার্শ্বে) দাঁড়াইলেন। অশ্বারোহী সাহেবী পরিচ্ছদে ভূষিত, কোট, প্যাণ্টুলেন, বুট জুতা, পায়ে পট্টি জড়ান, বুকে চেন, এক হাতে টুপি, আর হাতে চাবুক এবং সুগন্ধি রুমাল।

লোহিয়া আগন্তুকের আগমন প্রথম জানিতেই পারে নাই। প্রায় ১৫ মিনিট পর তাহার গীত বেগ একটু মন্দীভূত হইল, মনোযোগ একটু শ্লথ হইল, অশ্বের ক্ষুরাঘাতের ধ্বনিতে সে চমকিয়া উঠিল, গীত সম্পূর্ণ ছাড়িয়া না দিয়াই পার্শ্বে তাকাইল; বাপ! তিন লম্ফে লোহিয়া দশ হাত সরিয়া দাঁড়াইল। ধব্ ধবে এক আজ্‌গুবি চেহারা। কৌপিন ধারী ব্যতীত অন্য পুরুষ তো সে বড় দেখে নাই, তার উপর সাহেবী পোষাক। আগন্তুক নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘরের চাবি কোথায়? তুই কে? লোহিয়ার সাহস হইল, দু পা সরিয়া আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল মু তো লোহিয়া, তু কোন্?

আগন্তুক। লোহিয়া কে? ঘরের চাবি কোথায়!

লোহিয়া। রঙ্গিয়ার বেটি লোহিয়া! চাবি তো মোর কাছে আছি, তু কোন্ আগে কহতো চাবি দিবি। হাকিম ছাড়া দিব নাহি। তু কি হাকিম?

আগুন্তক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ আমি হাকিম!

লোহিয়া ঘার নাড়িয়া কহিল নাহি, হাকিম এমনি হব কেনে! হাতী ঘোড়া আসিব, লোক পাইক আসিব, তবে তো হাকিম! মু তোতে চাবি দিব নাহি।

আগুন্তক দেখিলেন বড় বিপদ! বলিলেন "আচ্ছা যদি না দিবি তবে কি করিব, বসিব কোথায় একটা জায়গা এনে দে। তুই গান কর্,

আমি শুনি। লোকজন আসুক, তখন চাবি দিস্। গান করার আদেশে এই প্রথম লোহিয়ার মনে কি এক ভাব হইল।

লোহিয়ার এ পর্য্যন্ত গান করিতে কোন দিন আপত্তি হয় নাই। আজ যেন কে আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, কিসে যেন তার বুকের ভিতর জাঁতা ঘুরাইতে আরম্ভ করিল; লোহিয়া লজ্জায় স্তব্ধ হইয়া গেল। একটু পরে লোহিয়া অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া কহিল তুই এই চাবি নে, আমি বাপাকে খবর করি।' লোহিয়া ছুটিয়া পালাইল। বাঙ্গলার জঙ্গল পার হইতেই তার খিল্ খিল্ হাস্য ধ্বনি ভূমি কাঁপাইয়া দিল। পরক্ষণেই হাকিম শুনিলেন 'কত দিন জাগি মু রহিব।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্দোবস্তের হাকিমের নাম শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জমোহন বসু বি,এল্। রাজার ষ্টেটে বন্দোবস্তের কার্য্য করেন, বেতন পান ৩০০৲ টাকা, আর হাতী ঘোড়া লোক লস্কর সবই পান ষ্টেট হইতে। বাবু দেখিতে অতি সুপুরুষ, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিট্ ফাট্। বাঙ্গলার তাঁহাকে প্রায় ২ মাস থাকিতে হইবে সুতরাং নিজ আসবাব সব লইয়া আসিয়াছেন। যত ইংরাজি সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস তা আর বাকী রাখেন নাই। বিছানা পত্র এক রাশি আসিয়াছে। ট্রাঙ্ক, বাক্স, পোর্টমেণ্ট, ব্যাগই ১০।১৫ টা আসিয়াছে। তাতে চায়ের সরঞ্জাম, কোকো, কফি, ষ্টোভ্, ক্ষৌর কার্য্যের হেতিয়ার জাত, গামছা তোয়ালে, দন্তমঞ্জন, টুথ ব্রস্, সুইস মিল্ক, বিস্কুট, সাবান, কাঁটা, চাম্চে, আয়না, চিরুনী, ব্রস্, এসেন্স, কুন্তলীন, জেলি, কণ্ডিমেণ্ট, চাল দাল হাতা বেড়ী, থালা বাটী, ঘটি বঁটি, ইত্যাদি যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, সব সহর হইতে সঙ্গে আনিয়াছেন। পোষাক পরিচ্ছদ দুই প্যাঁটরা ভরা। জুতাই ৭।৮ জোড়া। তারপর বিলাতী ভাল একটি হারমোনিয়াম, এক জোড়া বাঁয়া তবলা, গীত পুস্তক গতের পুস্তক ইত্যাদিও বাকি থাকে নাই। এই বনের মধ্যে সময় কাটান চাই ত? কখন কাব্যামৃত আস্বাদ দ্বারা, কখন গীতামৃত উপভোগ দ্বারা, কখন বা স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বারা সময় কর্ত্তন করিবেন। বাবু বনিয়াদি ঘরের ছেলে, বাল্য হইতে সাহেবী কায়দায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বাঙ্গলা তিনি একদিনের মধ্যেই অতি

মনোহরভাবে সাজাইয়া লইয়াছেন, যেন চিরকালই তিনি তথায় বাস করিবেন।

এ দিকে বাহিরে ৩।৪টা তাঁবু পড়িয়াছে, রাশি রাশি কাগজের রিম্, শত শত বোতল লাল ও কাল কালি, তাড়া তাড়া পেন ও হ্যাণ্ডেল, বস্তা বস্তা কাপড়, মণ খানেক ময়দা, চেইন, ক্রস্পাস, নিশানের দণ্ড ইত্যাদি জরিপ জমাবন্দীর সাজ সরঞ্জামে একটা তাঁবু ভরিয়া গিয়াছে; আর আমিন, মুহুরী প্রভৃতির সংখ্যাও ১৫০।২০০ হইবে। মহা দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার! সাঁওতালগণ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে; তাহারা কোন দিন এত সব কাণ্ড কারখানা দেখে নাই। হাকিম বাবুর পোঁষাক পরিচ্ছদ চলা ফেরার ধরণ, এমন কি স্নানাহার পর্য্যন্ত তাহাদের কৌতুহল উদ্দীপন করিয়া দিয়াছে। তাহারা প্রচার করিতেছে 'দেও' অংশ না থাকিলে 'গম্কে', অর্থাৎ হাকিম হওয়া যায় না। তাহারা দলে দলে স্ত্রী পুরুষে দণ্ড মুক্তির কর্ত্তাকে প্রণাম করিতেছে। লোহিয়াও তাহা করিতে ভুলে নাই, কিন্তু তখন একটু হাসি সে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই।

হাকিম নিকুঞ্জ বাবু লোকজনের বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দ্বিপ্রহরে সুস্থ হইয়া বাঙ্গালায় বসিলেন। তাঁবুগুলি বাঙ্গালার প্রাঙ্গণের বাহিরে! রঙ্গিয়া আসিয়া 'গড়' করিয়া বলিল 'হাকিম, তোর যাহা দরকায় হব, ম'তে কহিবি, মোর বেটি সব করি দেবে।' এই বলিয়া ডাকিল 'লোহিয়া' 'লহু-উ-উ-উ,' লোহিয়া ছুটিয়া আসিল! রঙ্গিয়া বলিল 'তু এঠি রহবি, হাকিম যাহা কহিব তা করিবি।' খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া লোহিয়া সায় দিল। আর চমকৃত হইয়া হাকিমের ঘরের শোভা দেখিতে লাগিল। ঘরের নানারূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুনিচয়ে লোহিয়ার মানসপটে আর একটি জগতের অস্তিত্ব জাগাইয়া দিল। সে বুঝিল যে, তাহার এই জঙ্গল বাস্তই পৃথিবীর শেষ নহে, এই পোষাক পরিচ্ছদই কেবল প্রচুর নহে, জগতে উপভোগ করিবার আরও অনেক জিনিস আছে, সেসব কত সুন্দর, কত মনোহর! লোহিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া কেবল তাই ভাবিতেছে। মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য স্পৃহা, স্বচ্ছন্দতা-প্রিয়তা তাহার মনে বাসা বাঁধিবার জোগাড় করিতেছে। রঙ্গিয়া কখন গিয়াছে, সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। নিকুঞ্জ বাবু তাহাকে চমকিত করিয়া বলিবেন 'লোহিয়া, তুমি এখন যাও, যখন দরকার হয়, ডাকিব।' লোহিয়া হাকিমের মুখপানে চাহিয়া থাকিল, একটু ফিক্ করিয়া

হাসিল, বলিল "মু এঠি রহবি, তু কাজ হোলে মো'কে ডাকিবি।" লোহিয়া চলিয়া গেল! নিকুঞ্জ বাবু শয়ন করিয়া শেলির কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন, পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া গেলেন। নিকুঞ্জ বাবু বড় করিয়া পড়িতেছিলেন, আশ্চর্য্য ভাষা ও স্বর শুনিয়া লোহিয়া চুপে চুপে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বাবু ঘুমাইলে তাকাইয়া দেখিল, বাবু ঘুমাইয়াছেন। আবার সে ঘরের আয়না, ছবি, বাকস, পোটমাণ্টো সব দেখিল। নয়ন বিস্ফারিত করিয়া ঈষৎ হাস্যে ওষ্ঠাধর অর্দ্ধ বিকশিত করিয়া কটিদেশে হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া লোহিয়া দেখিতেছে, আর ভাবিতেছে, সহরে এত সব আছে! এই বনভূমিই সুখ স্বচ্ছন্দতার সীমা নহে, বৃক্ষত্বগ্‌বৎ মোটা কাপড়ই প্রচুর নহে, নগ্ন পদই ভ্রমণের উপকরণ নহে, সরসীই কেবল আরসী নহে!

দেখিল, দেখিল, অনেকক্ষণ দেখিল, পরে সে একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে মনের অনেক কথা নীরবে ব্যক্ত করিয়া বকুল তলায় আশ্রয় লইল।

ক্রমে শেষ বেলায় বাবু উঠিলেন, ডাকিলেন 'লোহিয়া'। নীরবে ছুটিয়া লোহিয়া হাজির হইল, মুখ ধোয়ার জল আনিয়া দিল, বাবু টুথ ব্রস ও সুগন্ধি বল্‌গোটের মঞ্জন দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিলেন, গন্ধে স্থানটা ভরিয়া গেল; বাবু ঘরে আসিলেন, ধবধবে ইস্ত্রিকরা সার্টটা গায় দিলেন, কড়মড়ে রুমালখানি বাহির করিয়া এসেন্সের শিশি ঝাড়িয়া তাহাতে মাখাইলেন, শিশি ঝাড়িতে ২।৪ ফোঁটা লোহিয়ার বস্ত্রে, মুখে ও কপালে লাগিল। সুমিষ্ট গন্ধে বন মালাধারিণী লোহিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল! কথা কহিল না, অনুমতি লইয়া ঘরে গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। নিকুঞ্জ বাবু বারান্দায় চেয়ার লইয়া বসিলেন। চাকরকে হুকুম করিলেন 'বাজনা বাক্‌স দিয়ে যা।' চাকর হারমোনিয়াম দিয়া গেল। নিকুঞ্জ বাবু তখন সেই প্রশান্ত বনভূমির সান্ধ্য নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুমিষ্ট পুরবীর স্বর লহরী সঞ্চালন করিলেন। সেমিষ্ট মধুর ধ্বনি বায়ু তরঙ্গে সাঁওতাল পল্লীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের কর্ণ পথে মানস মন্দিরের অজ্ঞাত রাজ্যের কবাট খুলিয়া দিল; এ ধ্বনি তাহারা কোন দিনই শুনে নাই; তাই তাহাদের মন হৃদয়ের দেওয়াল ভেদ করিয়া এ ধ্বনির নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করিল। তাহারা ছুটিয়া বাহির হইল, এবং অবিলম্বেই নিকুঞ্জ বাবু স্বীয় বাঙ্গলার পার্শ্বে শত শত লোকের উৎসুক ও উৎকর্ণ মুখ মণ্ডল দেখিলেন। তাঁহার অতি

নিকটে বারান্দার গায় দুই হস্ত রাখিয়া করপল্লবে মুখখানি রাঙ্গা করিয়া লোহিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাও দেখিলেন, দেখিয়া নিকুঞ্জ বাবু একটু হাসিলেন। এদিকে তাঁহার সিদ্ধ হস্ত আজ বেতাল হইল, হারমোনিয়ম বেসুরা বলিতে লাগিল, কোমল রেখার কড়ি হইয়া পড়িতে লাগিল, মধ্যম স্বাভাবিক হইতে লাগিল; এত গুলি অজ্ঞ লোকের ঔৎসুক্যের নিকট তাঁহার বিদ্যা যেন লজ্জা পাইল। তিনি বুঝিলেন, বাদ্যবন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি লোহিয়া, এত লোক এখানে কেন?'

লোহিয়া সেই ভাবে থাকিয়াই বলিল 'তুইতো পাগল করিয়া আনিয়াছিস্। তোর ঝুলিতে কোন্ 'দেও' আছে?

নিকুঞ্জ বাবু হাসিলেন 'দেও' 'টেও' নাই লোহিয়া, এটা বাজনার বাক্‌স।'

নিকুঞ্জ বাবু সেই সমবেত লোকমণ্ডলীকে ডাকিয়া স্বীয় বিকোর্সের বিদ্যার হাঁড়িটা ঝাড়িয়া লইয়া হারমোনিয়াম তত্ত্ব তাহাদের ক্ষীণ মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইতে প্রায় ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চেষ্টা করিলেন। সকলেই শুনিল, কেহই বুঝিল না, কেহই সন্তুষ্ট হইল না।

লোহিয়া বলিল 'তা হোক্, তুই বাজা বাজা, যেমন, তোর কথা তেমনি মুহে।'

কিকুঞ্জ বাবু এক পাত্র চা পান করিয়া আবার যন্ত্রকে জাগাইয়া তুলিলেন। যন্ত্র করুণ স্বরে ইমন্‌কল্যাণ গাহিতে লাগিল। ইমনের সে করুণ তীব্র মধুর আলাপে সাঁওতালগণ মুগ্ধ হইয়া গেল। সঙ্গীতপ্রিয়া লোহিয়া মরিয়া গেল।

যন্ত্র গাহিতে লাগিল, আস্থায়ী, আভোগ, অন্তরা, সঞ্চারী, সব গাহিয়া গেল। ক্রমে রজনী অধিক হইতে লাগিল, রমণীগণের কোলের শিশুগণ সে গানে নিদ্রায় কোলে ঢলিয়া পড়িল, তাহারা একে একে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল, সাঁওতালগণ চলিয়া গেল! থাকিল কেবল লোহিয়া! নিকুঞ্জ বাবু শেষে গভীরা রজনীতে নিজ গৃহ সুখ স্মরণ করিয়া প্রাণের জ্বালা শান্তিকারী বেহাগকে আহ্বান করিলেন। সে আসিয়া জ্যোৎস্না-বিধৌত রাঙ্গা বনভূমিকে অমৃত স্রোতে ভাসাইয়া দিল, স্বর লহরী ঘুরিয়া হৃদয়ের প্রত্যেক পরতায় আঘাত করিয়া শরীর অবসন্ন করিয়া তুলিল, নিকুঞ্জ বাবু যন্ত্র বন্ধ করিয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। রহিল কেবল লোহিয়া; তাহার কর্ণে

তখনও সে গীত ধ্বনি বাজিতেছে, তাহার প্রাণ-বিহঙ্গ কোন এক অজ্ঞাত সুখময় রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছে। নিকুঞ্জ বাবুর গৃহে প্রবেশের পূর্ণ অর্দ্ধ ঘণ্টা পর লোহিয়ার চমক ভাঙ্গিল, এ দিক চাহিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরে গেল আজ আর গান গাহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিপুষ্টি—সমাপ্তি।

সেই দিন হারমোনিয়ম বাজনা শুনিবার পর প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। নিকুঞ্জ বাবু স্বীয় অভ্যাস অনুসারে প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে হারমোনিয়ম লইয়া বসেন, আর তাহার সুপ্ত স্বরলহরীগুলি জাগাইয়া তুলিয়া সাঁওতালগণের হৃদয়তন্ত্রীতে তাহার প্রতিধ্বনি করেন। সকলেরই নিকট এখন সে সঙ্গীতের নূতনত্ব চলিয়া গিয়াছে। এখন আর সেই বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে শত শত উৎসুকনেত্র তাঁহার বাঙ্গলার সমীপে উপস্থিত হইয়া ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার অঙ্গুলীর লীলা দর্শন করে না। ক্বচিৎ কখন কৌতূহলী শিশুর দল সে গীত শ্রবণে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। সকলেরই নিকট সে বাদ্য এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তাহার নূতনত্ব চলিয়া গিয়াছে। কেবল একজনের নিকট তাহার মাধুর্য্য লয় হয় নাই, কেবল একজন সে স্বরলহরীর পুরাতনত্ব কল্পনা করিতে পারে নাই—সে লোহিয়া। লোহিয়ার সে স্বর 'নিতুই নব'। যখন সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে গগনের প্রান্ত হইতে শাল বনের মধ্য দিয়া চুপে চুপে আসিয়া বাঙ্গলার প্রাঙ্গণ ও বাঙ্গলা খানিকে অলক্ষ্যে ঘেরিয়া ফেলিত, যখন জীব জন্তু সমস্ত বহিশ্চারণ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বীয় আবাসে বা আশ্রয় স্থলে প্রত্যাগমন করিয়া সে প্রান্তরে শান্তির রাজত্ব সূচনা করিত, সেই সময় যখন নিকুঞ্জ বাবু স্বীয় প্রাণের সখী নির্জ্জীব শান্তিদায়ক হারমোনিয়মটি লইয়া বারান্দায় বসিতেন এবং অঙ্গুলী সঞ্চালনে তাহাকে মুখরিত করিতেন, তখনই একটি মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারের সহিত স্বীয় দেহ মিশাইয়া নির্ব্বাক্ নিশ্চল নিস্পন্দভাবে ছবিটির মূর্ত্তি মত তাঁহার বারান্দার তলে প্রকাশিত হইত। করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া, কনুই দ্বারা বারান্দায় ভর দিয়া, যৌবনদর্পিত বক্ষখানি বারান্দার মেজেতে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে একদৃষ্টে লোহিয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকিত, কিন্তু সে কেবল চেয়ে থাকা; একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলেও সে চক্ষু তখন

নির্জ্জীব প্রতিমার চক্ষুর ন্যায় বস্তু-প্রতিবিম্ব গ্রহণে অক্ষম, সে চক্ষু চাহিয়া থাকিত মাত্র, কিন্তু কিছুই দেখিত না, নিকুঞ্জ বাবুর অতি সুগঠিত কন্দর্প-বিনিন্দিত বপুঃ, অতি চাকৃচিক্যশালী বিচিত্র কারুকার্য্য-শোভিত হারমোনিয়ম, এ সব কিছুই সে দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহে। সে দৃষ্টি বাহ্য-দৃশ্যমান পদার্থ-নিচয় পরিত্যাগ করিয়া কোন আন্তর্জাগতিক পথে কিসের চেষ্টায় যেন ভ্রমণ করিত; বাহ্যজগতে সে দৃষ্টি অচঞ্চল; স্থির। যখন হারমোনিয়ম বাজিয়া উঠিত, তখনই লোহিয়ার হৃদয়ভারও ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিত, লোহিয়ার সাধ্য ছিল না যে তখন সে হৃদয়কে সে নিবৃত্ত করে; শ্যামের বাঁশীর স্বরে পাগলিনী রাধিকার মত লোহিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তখনই তথায় ছুটিয়া আসিত, আর সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা যেন সে স্বর মাধুরী সে পান করিত, তবু তাহার তৃপ্তি ছিল না, তবু তাহার বিরক্তি ছিল না; সে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তন্ময় হইয়া পড়িত, মনে মনে বুঝি সে গীতধ্বনিকে বলিত 'আমি আর তুমি, মাঝে কিছু নাই।' আমরা কালিদাসের কথায় একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লোহিয়া সম্বন্ধে বলিতে পারি,—

তমেক শব্দং শ্রবণৈঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তি রাসাং সর্ব্বাত্মনা কর্ণমিব প্রতিষ্ঠা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

সংবাদ।

লেডিস্মিথ ও কিম্বার্লির অবরোধ মোচনের জন্য আনন্দ প্রকাশ নিমিত্ত স্বত্বাধিকারী ও সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেশ চন্দ্র সরকারের আদেশ ক্রমে কীর্ণহার শিবচন্দ্র ইংরাজী বিদ্যালয় এক দিনের জন্য বন্ধ ছিল। অন্যান্য অনেক কার্য্যেও আমরা সৌরেশ বাবুর রাজভক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি।

বীরভূম কৃষি ও পশু প্রদর্শনী মেলা। বীরভূম ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ই, জি, ব্রেক্, ব্রেক্‌ম্যান সাহেব এই মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। বিগত ১লা ফাল্গুন হইতে ৩রা ফাল্গুন পর্য্যন্ত এই মেলা উপলক্ষে উৎসব হইয়াছিল। সহরের পশ্চিম প্রান্তস্থিত বড় বাগানে এই মেলা বসিয়া থাকে। বর্ত্তমান

মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, আমেদ সাহেব বাহাদুর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদাদ শোভান বাহাদুরের যত্নে ও পরিশ্রমে, এ বৎসর মেলায় সমধিক ধূমধাম হইয়াছিল। থিয়েটার, সার্কাস, নানা জাতীয় নাচ গান, হাতীর দৌড়, ঘোড়ার দৌড় প্রভৃতি আমোদ ও যোগ্যতা অনুসারে পারিতোষিক বিতরণ, হইয়াছিল। হাতীর দৌড়ে কীর্ণহারের জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যেশ ও সৌরেশ বাবুর হস্তীই জয়লাভ করে। পল্লীগ্রামের অনেক লোক প্রদর্শনার্থ গবাদি পশু আনয়ন করিয়াছিল। অনেকে যথাযোগ্য পুরস্কারও পাইয়াছে। দ্বিতীয় দিবসে হেতমপুরের বাজার বীরভূমস্থ উদ্যান বাটীর প্রাঙ্গণে নবনির্ম্মিত বীডনহল খোলা হইয়াছিল। তৃতীয় দিবস রজনীতে আতস বাজির ধূমধাম হইয়া মেলা শেষ হয়।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী সাহেবের যত্নে মেলার এবার বিশেষ শৃঙ্খলা সাধিত হইয়াছিল। অথচ দুঃখের বিষয়, কোন স্বাপ্তাহিক পত্রে তাঁহার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া কটূক্তি বর্ষণ করা হয়। বস্তুতঃ তাঁহার কাহারও প্রতি সজ্জনোচিত ব্যবহারের ত্রুটী দেখা যায় নাই। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব মেলার সুবন্দোবস্ত দর্শনে তাঁহাকে এক স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন। ভাল করিয়া না জানিয়া শুনিয়া রাজ কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে 'যা' 'তা' লিখিতে নাই। ইহাতেই বাঙ্গালা কাগজ গুলি ঘৃণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নির্ম্মলানন্দ স্বামী। বীরভূম আমুদপুর রেলওয়ের অনতিদূরে এক দেবী মন্দির আছে। নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীগণ প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নের দিন এই দেবীর পূজা করিয়া থাকে। কয়েক দিন পূর্ব্ব নির্ম্মলানন্দ স্বামী নামে এক ব্রহ্মচারী দেবীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্য কি না, জানি না, কয়েক জন ভদ্র লোকে ব্রহ্মচারীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করায় তিনি গত নবন্নের দিনে তাঁহাদিগকে দেবীর গৃহে প্রবেশ করিতে দেন নাই। এই কারণে তাঁহারা স্বামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে এক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাদীগণের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া স্বামীর নামে চার্জ করেন। কিন্তু স্বামীর

পক্ষের সাক্ষীদিগের কর্ত্তৃক তিনি নিরপরাধ সাব্যস্ত হওয়ায় মুক্তি পাইলেন। মুক্তি না হয় পাইলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর হাঙ্গামার মধ্যে যাওয়া কি ভাল?

তারাচরণ ঘোষের নিবাস বাজিতপুর গ্রাম। রামনাথ তাহার কনিষ্ঠ পুত্র। রামনাথ যেরূপ শান্ত ও শিষ্ট, তাহার স্ত্রী কিন্তু সেরূপ ছিল না। স্ত্রীর নাম শ্রীমতী চেতনাসুন্দরী দাসী। লোকে বলে শ্রীমতী দুশ্চরিত্রা। সে বিগত পাঁচ ছয় মাস পিত্রালয়ে ছিল। পিত্রালয় গোরোলা গ্রাম বাজিতপুরের এক ক্রোশ দক্ষিণ। সে মধ্যে ২।৪ দিনের জন্য বাজিতপুরে আইসে। ২৮শে ফাল্গুন রবিবার রাত্রিতে উঠিয়া শ্রীমতি পলায়ন করেন। জনৈক প্রতিবাসী তাহা জানিতে পারিয়া রামনাথকে সংবাদ দেয়। রামনাথ তাহাকে ফিরাইবার জন্য তাহার অনুসরণ করে। হতভাগ্য সেই রাত্রিতেই নির্দ্দয় রূপে বিনষ্ট হয়। হত্যাকারীরা তাহাকে রেলের উপর ফেলাইয়া দেয়। পুলিস তদন্ত করিতেছে। শুনিতে পাই, পুলিসের নিকট শ্রীমতী নাকি বলিয়াছে যে, তাহার স্বামী তাহার শ্বশুরের তিন জন প্রতিবাসী দ্বারা বিনষ্ট হয়। কারণ সেই দিবস পিতা ও পুত্রের সামান্য রূপ বচসা হইয়াছিল। পরে আরও ২।৪টি ভদ্রলোকের নাম করে। যাউক এ সব কোন কাজের কথা নহে। মোটের উপর হত্যা হওয়াটা সত্য। বিচার কালে সমস্ত কথাই প্রকাশ পাইবে। আমরা সুবিচারের আশা করিতেছি।

বিগত ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই চৈত্র বোয়ালিয়া ধর্ম্ম সভার চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও দোলযাত্রা হইয়া গিয়াছে। সভার কার্য্য বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কার্য্য বিবরণ।

১। ৩রা চৈত্র পূর্ব্বাহ্ণে নগর সংকীর্ত্তন, দেবার্চ্চনা ও বেদাদি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ; অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যার পরে নিম্নলিখিত ১ম ও ২য় বিষয়ের বক্তৃতা এবং সঙ্গীত।

২। ৪ঠা চৈত্র পূর্ব্বাহ্ণে সংস্কৃত পরীক্ষার্থিগণের পরীক্ষা গ্রহণ ও

সংশোধিত নিয়মাবলী পাঠ, এবং স্মৃতি শাস্ত্রের বিচার, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার পরে নিম্নলিখিত ৩য় ও ৪র্থ বিষয়ের বক্তৃতা ওবং সঙ্গীত।

৩। ৫ই চৈত্র পূর্ব্বাহ্নে সংস্কৃত পরীক্ষার্থিগণের পরীক্ষা গ্রহণ এবং দর্শন শাস্ত্রের বিচার, অপরাহ্নে গত বৎসরের সংস্কৃত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ও তাহাদের অধ্যাপকগণের পুরস্কার প্রদান এবং নিম্নলিখিত ৫ম বিষয়ের বক্তৃতা; রজনীতে সভার বার্ষিক আয় ব্যয় বিবরণ ও বিজ্ঞাপনী পাঠ ও কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচন এবং সঙ্গীত।

৪। দীন দরিদ্রদিগকে দান।

বক্তৃতার বিষয়।

১। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানিগুণৈঃ কর্ম্মাণিভারত।"

এই শাস্ত্রে জানা যায়, যে প্রকৃতির গুণেই সমুদয় কর্ম্ম ক্রিয়মাণ হয়; আবার—

"ঈশ্বরঃসর্ব্বভূতানাং স্বদেশেহর্জ্জুনতিষ্ঠতি। । ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

ইত্যাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে হৃদ্দেশে অবস্থিত ঈশ্বরই সকলকে ভ্রামিত করিতেছেন, এই বিরোধের মীমাংসা কি?

২। সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে ও তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে কি না? না পারিলে তাহার যুক্তি কি?

জ্ঞানকৃত অতি পাতকাদি যুক্ত ব্যক্তি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ হইলে অব্যবহার্য্য থাকিবার শাস্ত্র ও যুক্তি কি?

৪। ন্যায় মতে জ্ঞানাত্মার নানাত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, বেদান্তমতে তাহা স্বীকৃত হয় নাই, এই উভয় মত সিদ্ধ জীবাত্মার লক্ষণ নির্ব্বাচন ও এই উভয় মতের সামঞ্জস্য পক্ষে যুক্তি কি?

৫। পাপ কত প্রকার, ঐ পাপ হেতু নরক ভোগ হওয়ার পরে মনুষ্য দেহ ধারণ করিলে উহার কোন পাপের অবশেষ হেতু-জীবের কি কি রোগ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

ধর্ম্ম সভার ও ধর্ম্মসভার মুখ পত্র হিন্দুরঞ্জিকার উদ্যম সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ] জ্যৈষ্ঠ। [৮ম সংখ্যা।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ।

আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি এবং সুখ প্রাপ্তিই জীবনের উদ্দেশ্য, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান, সকলেরই এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। উদ্দেশ্য এক বটে কিন্তু সাধনোপায় এক নহে। হিন্দু যে পথ ধরিয়া গমন করিবেন, খৃষ্টান কি মুসলমানের পক্ষে সে পথ হয়ত বিপথ বা কুপথ বলিয়া বিবেচিত হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম-পরম্পরার ফলে যখন জীবের মানসিক বৃত্তির পরিবর্ত্তন এবং জাত্যন্তর প্রাপ্তিও সংঘটিত হয়, তখন সাধন প্রণালীও যে বিভিন্ন হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি। আমরা ক্রমে এ সব কথা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব।

আর্য্য শাস্ত্রকারগণের মতে কর্ম্মই অনন্ত দুঃখ নিবৃত্তির এবং অনন্ত সুখ প্রাপ্তির একমাত্র হেতু বলিয়া স্থিরীকৃত। কর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে কবি শিহ্লন তাঁহার শান্তিশতক নামক উপাদেয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই প্রশ্নোত্তর চ্ছলে একটী শ্লোক সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তি কামনায় গ্রন্থকারগণ গ্রন্থের আদিতে আপন আপন অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে বন্দনা করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। শিহ্লন তাই ভাবিতেছেন—"কাহাকে প্রণাম করি? নমস্যামো দেবান্? দেবতাদিগকে কি নমস্কার করিব? নন্থ হত বিধেস্তেঽপি বশগাঃ—না, দেবতারা ত বিধাতার বশীভূত; যে অপরের অধীন তাহার আবার উপাসনায় ফল কি?" শিহ্লনের দেবতাদিগকে প্রণাম করা হইল না। "বিধির্বন্দ্যঃ? তবে বিধাতাই বন্দনীয় হউন?

উঁ হুঁঃ; সোহপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ—তিনি ত প্রতিনিয়ত জীবের কর্ম্মফল প্রদান করিতেছেন। তিনি কর্ম্মফলদাতা মাত্র। তবে কি ফলই বন্দনীয়?—না, তাহাও নহে। ফলং কর্ম্মায়ত্তং—ফল কর্ম্মের আয়ত্ত, কর্ম্ম না করিলে ত ফল হয় না। সুতরাং ফলই বা কেমন করিয়া প্রণামের যোগ্য হইতে পারে? কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা—কি দেবতাগণ, কি বিধাতা, কেহই ত কিছুই নহেন। তবে—নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি সেই কর্ম্মকেই নমস্কার, যাহার উপর বিধতারও হাত নাই।"

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কর্ম্ম আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির ও আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্তির হেতু, সে কর্ম্ম কি? আহার, বিহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এ সবই ত কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্ম দ্বারাই কি আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে? হিন্দু শাস্ত্রকারগণ এ সকল কর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন না। যে সকল কর্ম্ম বাসনামূলক তৎসমুদায়ই বন্ধনের হেতু। যাহা বন্ধনের হেতু অর্থাৎ যদ্দ্বারা জীবের পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হয়, তাহা সুখ প্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায়। কারণ, সুখ দুঃখ লইয়াই জন্ম। যাহা চিরন্তন সুখের বাধক, তাহা কেমন করিয়া দুঃখের নিবারক হইবে? কথাটা কিছু বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাউক।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে জীবসৃষ্টি আদ্যন্ত মধ্য রহিত। কর্ম্মেরও আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই—ক্রমাগত একটানা চলিয়াছে। কত সত্য, কত ত্রেতা, কত দ্বাপর, কত কলি অতীতের কুক্ষিগত হইয়াছে; কত যুগ, কত যুগান্তর বহিয়া গিাছে, আহার স্থিরতা নাই। কর্ম্মই এই সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ কর্ম্মের মধ্যে যে গুলি ফল দানে একান্ত উন্মুখ হয়, সেই কর্ম্মগুলি লইয়া অর্থাৎ সেই কর্ম্ম গুলির ফল ভোগ করিবার জন্য জীব উপযুক্ত পিতা মাতাকে আশ্রয় করিয়া সংসারে অবতীর্ণ হয়। ইহাকেই জীবের জন্ম বলে। যে সকল কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য জীবের আবির্ভাব হয়, তাহাদিগকে প্রাক্তন কর্ম্ম বলে। এই প্রাক্তন কর্ম্মের ভোগাবসানই জীবের তিরোভাব বা মৃত্যু। প্রাক্তন কর্ম্ম ভোগ ব্যতিরেকে ক্ষয় হইবার নহে। শ্রুতি বলিতেছেন—"না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।" প্রাক্তন ব্যতীত অপরাপর কর্ম্ম ভোগ না করিয়াও

কর্ম্মান্তর (শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি) দ্বারা তাহার ক্ষয় করা যাইতে পারে। এই যে কর্ম্ম, ইহাকেই পুরুষকার বলে।

"দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ মনুজোত্তম।
ত্রয়মেতন্মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহম্।"

এই মৎস্যপুরাণোক্ত প্রমাণানুসারে দৈব পুরুষকার এবং কাল এই তিনের সমবায়ে কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয়। এই ত্রিতয়ের মধ্যে যেখানে দৈবের অর্থাৎ অদৃষ্টের (পূর্ব্ব জন্মের পুরুষকারের) বল অধিক, সেখানে দৈবানুগতই ফল ফলিবে। যেখানে পুরুষকার বা কাল প্রবল, দৈব দুর্ব্বল সেখানে পুরুষকার বা কালানুগতই ফল হইবে। প্রাক্তন কর্ম্ম নষ্ট করিবার শক্তি পুরুষকারের নাই। তথাপি পুরুষকার অপার শক্তি সম্পন্ন। পুরুষকার শুভাশুভ অদৃষ্টের জনক অর্থাৎ পুরুষকার আশ্রয় করিয়া মনুষ্য শুভ এবং অশুভ কর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারে। মনুষ্য ব্যতীত অপর কোন জীবেরই এই স্বাধীনতা টুকু নাই। মানবদেহ—কর্ম্মদেহ এবং ভোগদেহ উভয়ই; কিন্তু দেবতাদিগের কি পশুদিগের দেহ কেবল ভোগদেহ মাত্র। ভোগদেহ বলিয়া গবাদি পশুর বিষ্ঠা ভোজনেও পাপিত্ব হয় না, কিন্তু মনুষ্যের হয়। যিনি আজ সমগ্র দেবকুলের অধিপতি, ভোগান্তে সেই দেবরাজ ইন্দ্র হয়ত বিষ্ঠার কৃমি! তাই মানব জন্ম দুর্লভ জন্ম। এই দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া মানবগণ কি প্রকারে পরমার্থ লাভ করিতে পারে, তাহাই এক্ষণে আলোচ্য।

যিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই বংশ পরম্পরাগত পিতৃপৈতামহিক কর্ম্ম অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। এস্থলে মিথিলার সেই তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন পৌরাণিক তুলাধার ব্যাধের উপাখ্যান উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তুলাধার তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াও পৈত্রিকবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অপর সাধারণ ব্যাধের ন্যায় মাংস বিক্রয় করিতেন, উহা হইতে বিরত হইতে পারেন নাই। এই বৃত্তিই জাতি। কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে এই জাতিগত পার্থক্য রক্ষা করিয়া কর্ম্ম করাই বিহিত। ভোগভূমি ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশে বৃত্তির স্থিরতা নাই বলিয়া তত্তৎদেশে জাতিগত পার্থক্য নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, পিতৃ পৈতামহিক কর্ম্ম কি প্রকারে আত্যন্তিক সুখ লাভের বা পরম পুরুষার্থ লাভের হেতুভূত হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ধ্রুবোপাখ্যান এস্থলে উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব বিমাতা সুরুচি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া মাতা সুনীতির

নিকট রোরুদ্যমান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মা! আমি আমার পিতার উৎসঙ্গে আরোহণ করিতে আর ইচ্ছা করি না। আমি এমন স্থান লাভ করিতে চাই, যন্ন প্রাপ পিতামম—যাহা আমার পিতাও কখন পান নাই।" জননী সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া দিলেন এবং কোলে লইয়া পুলকপূর্ণিত দেহে বাষ্পগদ্‌গদ্ বাক্যে পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় বলিতে লাগিলেন।

ত্বমেব বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলম্।
মুমুক্ষুভি র্মৃগ্যপদাব্জ পদ্ধতিম্॥
অনন্যভাবে নিজ ধর্ম্মভাবিতে।
মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পুরুষম্॥

"বৎস! মোক্ষাভিলাষী যোগিগণ যাঁহার অন্বেষণ করেন, তুমিও সেই ভক্তবৎসল হরির আশ্রয় গ্রহণ কর। স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া হৃৎকমলে সেই পরম পুরুষের পদারবিন্দ স্থাপন করত একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে থাক।" সাধনার কি সুন্দর প্রণালী! দেহস্থিত কাম ক্রোধাদি রিপু দ্বারা মন সর্ব্বদাই চঞ্চল ভাবাপন্ন থাকিলে একাগ্রতা কেমন করিয়া আসিবে? তাই সাধনমার্গে বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ একান্ত আবশ্যক। বহির্ম্মুখীন ইন্দ্রিয় গ্রামকে অন্তর্ম্মুখীন না হয় করিলাম। কিন্তু তাহাতে ত চিত্তের মলিনতা কাটিল না। তাই স্বধর্ম্মাচরণ রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূরীকরণের উপদেশ। মলিন দর্পণে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় না, মলিন বস্ত্র রঞ্জিত হয় না, মলিন চিত্ত মুকুরেও ভগবদ্দর্শন একান্ত অসম্ভব। স্বস্ব ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটিলেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার সুলভ হইয়া উঠে। সে সুলভতা কেমন, তাহা বুঝিবার, বুঝাইবার নহে। ব্রাহ্মণ সন্তান শাস্ত্রানুসারে ত্রৈকালিক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবেন, তবে তাঁহার দেহে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হইবে, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হইবে। নতুবা তিনি, জাত্যা ব্রাহ্মণঃ—তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব জাতিমাত্রে পর্য্যবসিত। অপর ত্রিবিধ জাতির পক্ষেও এই একই ব্যবস্থা।

কামক্রোধাদি রিপুর স্বভাবই এই যে, তাহারা স্ব স্ব বিষয় পাইবা মাত্রই তদভিমুখে অশাসিত অশ্বের ন্যায় বেগে প্রধাবিত হয়। তখন বিবেকের শাসন ভুলিয়া যায়, বিবেকবাণী শুনিয়াও শুনিতে পায় না, দীপালোকে মুগ্ধ ক্ষুদ্র পতঙ্গবৎ বিষয়ের উপর আপতিত হয় এবং সর্ব্বনাশ সাধন

করিয়া ফেলে। যেমন রশ্মি সংযত করিয়া অদম্য অশ্বের পুনঃ পুনঃ গতিরোধ করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয়, তদ্রূপ এই বলবান ইন্দ্রিয় গ্রামকে সর্ব্বদাই বিষয় হইতে দূরে রাখিয়া তাহাদের বল খর্ব্ব করিতে হয়। কিন্তু সংসারী জীবের পক্ষে এরূপ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। অভ্যাসাৎ জায়তে সিদ্ধিঃ—অভ্যাসই সিদ্ধিলাভের একমাত্র অমোঘ উপায়। সমগ্র চিত্তের বল যদি একমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাতে অসাধ্য সাধন হইতে পারিবে, কামাদি রিপুর কথা আর কি বলিব। যখন যে কোন কাজই কর না কেন, তোমার মন যদি প্রতিনিয়তই ভগবন্নিরত থাকিতে পারে, তাহা হইলে সংসারের আবিল আবর্জ্জনা তোমার চিত্তের মলিনতা সম্পাদন করিতে পারিবে না। নির্লিপ্ত ভাবে অর্থাৎ ফলকামনা বিরহিত হইয়া, আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম কর, তাহা হইলে কর্ম্মফল তোমায় আশ্রয় করিতে পারিবে না। গীতা—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

তুলসীদাস আত্মসম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"তুলসী এ্যাসা ধেয়ান ধরো য্যায়সা বিয়ানকা গাই। মুমে তৃণ চাণা টুটে চেৎ রাখয়ে বাছাই॥"

বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ উপদেশ—

মন যদি মোর পাঁকালমাছের মতন হয়।
পাঁকে থাকে, পাঁকে মাখে, পাঁক লাগেনা তাহার গায়।
মন যদি মোর পাঁকাল মাছের মতন হয়।"

কি সুললিত ভাষায় কি মধুর উপদেশ! জনকাদি ঋষিও এই ভাবে সংসার ধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন। সংসারে থাকিয়াও তিনি সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় আচরণ করিতেন। সংসারে থাকিয়াই তাঁহার যোগাভ্যাস সিদ্ধ হইয়াছিল! তাঁহাকে বনে যাইতে হয় নাই।

'বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্; গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ স্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মাণি যঃ প্রবর্ত্ততে। নিবৃত্ত রাগস্য গৃহং তপোবনম্॥'

সংসারে যাহাদের আসক্তির হ্রাস হয় নাই তাহাদের বলে গেলেও কিছু হয় না। তাবৎ দোষই বর্ত্তমান থাকে, আপন ঘরে বসিয়া চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিতে পারিলেই তপস্যার ফললাভ হয়।

অকুৎসিত কর্ম্মে যাহার প্রবৃত্তি, এরূপ সংসার-বিরাগী ব্যক্তির পক্ষে গৃহই তপোবনস্বরূপ। শান্তিশতকের এই শান্তিময় শ্লোকটী প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রত্যেক বিষয় ব্যাপারে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শুদ্ধ যে অশান্তিময় সংসারে শান্তি বিধান করিবে, এমন নহে, সাধককেও সাধনমার্গে অগ্রসর করিতে থাকিবে। এইরূপে সাধক যখন স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া সংসারের যাবতীয় জ্বালা যন্ত্রণা সঙ্গে লইয়া শনৈঃ শনৈঃ সাধনমার্গে আরোহণ করিতে থাকিবেন, তখন তাঁহার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে—তখন তাঁহার আত্মপর থাকিবে না, তখন তাঁহার জাতিবিচার থাকিবে না, তখন তাঁহার পাপপুণ্য থাকিবে না, তখন তাঁহার সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম জ্ঞান হইবে, তখন তিনি সোঽহম্ হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ।

২। অর্জ্জুন গীতা (অর্জ্জুন সংবাদ।

আরম্ভ ঃ—

শ্রীঅর্জ্জুনের কথা হইল যেই মতে
জিবের নিস্তার হেতু প্রকাশ পৃথিবীতে
সুনিলে ওরিতে পাপ খণ্ডেত তখন
অর্জ্জুন পুছেন কৃষ্ণকে হঞা সাবধান
বৈষ্ণব কথা শুনিতে গোসাঞি আছে মোর মন।
কোন মতে জানিব বৈষ্ণব তোমার ভক্ত জন।
কহত সকল কথা প্রভু নারায়ণ
সে কথা সুনিব গোসাঞি বৈষ্ণব কারণ

মধ্য ঃ

আর কিছু কথা কহি সুনহে অর্জ্জুন
বিসেস করিয়া কহি জিবের কারণ
তিন যুগে কথা তুমি যুন ধর্ম্ম কর্ম্ম
হেন কথা কহি আমি অগোচর ব্রহ্ম
প্রেম লাগি জেই জন সদাই বিকল
হেন জন ভক্ত আমি কহিলাঙ সকল
সকল ছাড়িয়া আমাকে জেই জানে
নিরবধি আমার নাম শুনএ শ্রবণে
নিশ্রয় জানিতে তত্য কথা সরে
ভক্তের উপরে নাহি কারু অধিকার
নিরবধি কৃষ্ণ কথা করএ শ্রবণ
নিশ্রয় জানিহ সেই জিনিবেক জম
(৫পৃঃ)

অন্যত্র ঃ—

ভক্তি করিলে গতি হয় সকল সংসারে
ভক্তকে স্তুতি করে দেবতা কিন্নরে
(৬পৃঃ)

আমার নাম অবিরত জেবা জন গায়
মুখ্যচিত্ত হঞা যে বৈকুণ্ঠপুরি জায়
সর্ব্ব কর্ম্ম ছাড়িঞা জে আমাকে ভজে
সেজন আমার ভক্ত থাকে আমার কাছে
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণ কর্ম্ম কৃষ্ণ আরাধন
স্বরূপে জানিহ সেই বৈষ্ণব মহাজন
(৭পৃঃ)

শেষ ঃ—

সুনহ সকল লোক এক চিত্র করি
কৃষ্ণের বচনে সভে বল হরি হরি
জে জন সরূপ হঞা কৃষ্ণে মন ধরি
এক চির্ত্তে হইয়া স্মরণ জেবা করি
অবিলম্বে পায়ে সেই কৃষ্ণের চরণ
বৈকুণ্ঠ বসতি তার কহিল বচন

ইতি বৈষ্ণব কথামত ভাগবত অর্জ্জুন সংবাদ পুস্তক সমাপ্ত। যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখোকোদোষ নাস্তি।

পাঠক শ্রীকালিচরণ দত্ত সাংচুড়ন্ত লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দাস সাং খাএর পাড়া। ইতি সন ১২০৮ সাল তারিখ ২১ পৌষ, সোমবার বেলা এক প্রহরের গত। মোকাম মাল কটক। পৃঃ৯

গ্রন্থকারের নাম বা পরিচয় নাই। পত্র সংখ্যা ৯।

৩। জয়দেব প্রসাদাবলী (বা শ্রী গীতগোবিন্দের পয়ার বর্ত্তন)।

আরম্ভ ঃ—গ্রন্থের প্রথম "কৌবলে" মঙ্গলাচরণ।

এইত কহিল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ
জয়দেব প্রসাদাবলী করিল বর্ত্তন

তথাহি শ্লোক ২পত্র
যদি হরি স্মরণে সরসংমনো ইত্যাদি

অস্মার্থ

শ্রীহরি চরণ যদি করিবে স্মরণ
এমত সরসে জদি হয় নিষ্ঠামন
অথবা বিলাস কলা বাঞ্ছে জেই জন
কোসল কৌতুক যদি তাহে নিষ্টামন
শৃণুতদা মধুর কোমল পদাবলী
কান্ত কান্তারস জাহে উমরে উথলে
এ রস জাহার কর্ণে প্রবেস করিবে
ত্রিজগতে কোন রসে মন না লইবে
বিলাষ কৌতুক শেই তুচ্ছ করি মনে
জার জার এরস নাহি হয় আস্বাদনে
অতেব জয়দেব সরস্বতির চরণে
প্রণাম করিল শত দৃঢ় করি মনে
জয়দেব সরস্বতি বলি কি কর্ম্ম ইহার
পূর্ব্বশব্দের বলি করিল পয়ার
শ্রীকৃষ্ণ জয়দেব আক্ষা বাকরূপি হরি
সরস্বতি রূপে কণ্ঠে করিও সঞ্চরি
পথাদ্বৈত (?) জয়দেব পণ্ডিত কবিবর
* * * শ্রীকৃষ্ণ রসিক শেখর
এক আমো এক ভক্ত এক অভিধান

নহে কেবা দন্তকরি করয়ে ব্যাখ্যান
অতেব জয়দেব সরস্বতি বলিতায়
ইভাতে বিস্ময় কেহ না করো ইহায়
(পৃঃ ৫)

মধ্যঃ—
তথাহি শ্লোক (৫ম সর্গ)
তদ্বাম্যেন সমং ইত্যাদি

তদ্বাম্যেন সমং ইত্যাদি বচনে
সুন রসিক ভক্ত কর আস্বাদনে
দুতিকর কমলিনী বলি যে তোমারে
তব মাম (মান ?) সহ অস্তগেলা
দিবাকরে
অস্তগত হৈলা ভানু রজনি প্রবেশ
ক্ষণে ক্ষণে মনমথ বাড়ে হৃশীকেশ
দেখিয়া রজনী ঘোড় অতি অন্ধকার
ক্ষণে ২ চিন্তা করে শ্রীনন্দকুমার
অবশ্য আগত প্রায় ভানুর কুমারী
বাড়িছে মদন পীড়া চিন্তয়ে শ্রীহরি
অন্তরে জানিছে রাই গমন নিশ্চয়
আকুল ইহায় হরি ভাবিছে তোমায়
চক্রবাক বলে জেন করি নিজভাসে
তেন চক্রবাক কুরি বোলে তোমাআসে
রাধা রাধা চক্রবাক জপিছে সঘনে
হেন জনে বঞ্চিত না হবে কদাচনে
আমার বচন তার দীর্ঘ সে মানিল
ইহাতে তোমার মান মর্য্যাদা রহিল
শুন মুগ্ধ বিষাদিনি করি নিবেদন
বিফল বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন
রম্যকুঞ্জে চলহ করহ অভিশার
এমতে রজনী আর না হবে সুশার
(৫৭ পত্র)

শেষ—

শ্রবনে মঙ্গল হয় সর্ব্বরস শার
বক্রনাথ কৃপাবলে হইল পয়ার
অনুকুল গোপীকান্ত মহান্ত সন্তান
অম্বিকা নিবাসী এবে শঙরা বিরাম
শান্ত দান্ত অতিধীর দয়া কৃপাবান
পড়াইল গীত মোরে টীকা প্রণিধান
বেক্রনাথ তাঁর মুখে হইলা উদয়
কৃপা করি মোরে নাম শুনাইল মহাশয়
পুনমোরে হৃদে দেব করিয়া উদয়
পয়ার বর্ত্তন মোরে সম্ভব না হয়
যেকিছু কহিলা দেব বর্ণিল তাহার
দোশ গুন কিছু মোর নাহিক ইহার
দোশ শুন ভাগি ইথে হয় বক্রনাথ
কেবল বর্ত্তনে নাথ রহিল বিক্ষ্যাত
শাকিম মুকসুদাবাদ হয় গঙ্গাতীর
জোজনার্দ্ধ হয় গ্রাম নগর বাহির
তেলিয়া নিবাসী উত্তরাংশে বেগবতী
জোজন প্রমাণ হয় না হয় সঙ্গতি
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সভে বসতি সুন্দর
পূর্ব্ব পশ্চিমাংশ গ্রাম দীর্ঘ বহুতর
ক্রাশেক প্রমাণ গ্রামবাস গড়ের ভিতর
লোচন নৃশিংহ দুই হয় সহোদর
পিতামহ পূর্ব্বক্ষাতি ব্রহ্মচারি
করিয়া সকল তীর্থ সংসার বিহারী
মহাতেজমন্ত হয় কুলের প্রধান

* * * *

ব্রহ্মচারি ক্ষতি বলি জানয়ে সকলে
ত্রিতিয় নন্দন তার আছয়ে কুশলে

তার মধ্যে আমি অতি হই কৃপাহীন
না জজিল কুলধর্ম্ম এই নষ্ট চিহ্ন
দ্বিতীয় তনয় শেহো আর বনিতা
শ্রীকৃষ্ণে আপন করি জগত বঞ্চিতা
গঙ্গা গোবিন্দ দুই পুত্রের আক্ষান
অবশ্য গোবিন্দ তারে করিবে কল্যান
তাহা না গনিয়ে আমি অনিত্য বচন
কৃপাকর গোপীনাথ লইনু শরন
স্মরণ মনন মোর তুমি প্রাণ ধন
সদাই হেরিব জেন জুগল চরণ

* * * * *

তোমা বিনু মনে যদি অন্য হয় কাজ
তখনি মাথা মোরে পড়ে জেন বাজ
তোমার ভরসা বিনু অন্য নাহি আশ
শ্রীবৈষ্ণবগণে কবে করিবেন দাস
ইতি শ্রীগীতগেবিন্দে দ্বদস সর্গে
জয়দেব প্রসাদাবলী পয়ারবর্ণনং সম্পূর্ণ

সন ১২৫৫ সাল তারিখ ১৯ চৈত্র। পত্র সংখ্যা ১০২। প্রাপ্তীস্থান লুড়াই গোস্বামী বাড়ী। ক্রমশঃ

শ্রীশিবরতন মিত্র।

সাধের তরি ভাসান।

অকূল পাথারে হায়, কিসে কূল পাই ?
কে আছে সুহৃদ্ মোর, বল, ওগো, তাই।
ফেটে যায় হৃদি মোর, নয়নের অগোচর,
কোথায় কেমনে বল শান্তি-বারি পাই ?
কে আছে সুহৃদ্ মোর বল ওগো তাই ?

দুঃখের পাথারে বল কিসে কূল পাই ?
কোথায় কাণ্ডারী মোর—কোথায় দাঁড়াই ?
শতবজ্র প্রহরণে, নিয়ত ব্যাকুল প্রাণে,
এ বিষম জ্বালা হায়, কেমনে জুড়াই ?
কে আছে সুহৃদ্ মোর বল ওগো তাই ?

ভবদুঃখ-পারাবারে কিসে কূল পাই ?
মানস-তরণী আর কেমনে বাঁচাই ?
হায়, হায়, যায় যায়, এস নাথ এসময়,
দেখ তব যতনের তরি বাঁচে নাই !
উলটি পালটি তরি করিছে সদাই !

কোথা নাথ আসি হেথা দেখ একবার
তব আদরের তরি—হল ছার খার—

প্রেম-মন্দাকিনী গায়, মৃদুল সোহাগ বায়,
সদা হৃষ্টচিতে যায় করেছ বিহার—
আজি হেথা দেখ, নাথ, কি দুর্দ্দশা তার!

কেন এত অবহেলা—কিসে ঘৃণা এত?
অকস্মাৎ একি হল—সব বিপরীত!
কত শত বিধ সাজে, মজি অনুরাগ মাঝে,
সাজাইতে উল্লাসেতে ভাসি মনোমত—
একি হ'ল অকস্মাৎ—সব বিপরীত!

কেমনে এমনি সব হ'লে বিস্মরণ!
কি হেতু বিরাগ এত কিসের কারণ?
হৃদয়-ফলক তলে, কত চিত্র একেঁ ছিলে,
সকলি তোমার ওহো—বিচিত্র নির্ম্মাণ।
কি হেতু বিরাগ এত—কিসের কারণ?

বিচিত্র চিত্রের লেখা একটু মুছেনি
দেখে যাও কি নিপুণ তোমার লেখনী—
অদৃশ্য মসীতে ছলে, কি কারু বা করেছিলে,
তাপে স্পষ্টতর সব হতেছে আপনি—
ধন্য তব ছল, তুলি—তোমারে বাখানি।

সহেনা যাতনা আর এস একবার—
ছি ছি না বুঝিতে পারি একি ব্যবহার।
উত্তুঙ্গ তরঙ্গ বেশে, চারি ভিতে কষ্ট আসে,
ডুবুডুবু সদা তরি—রক্ষা নাহি আর—
যতনের ধন রাখ রাখ না এবার!

স্ফূর্ত্তি-লক্ষ বিসারিয়া বিমল সলিলে
আশা-বায়ু ভরে হায়, কত খেলেছিলে—
সুখ-হিম-জ্যোতিঃ করে, শুধু কি এমনি ক'রে—
দুর্ব্বিপাক-ঘুর্ণিমাঝে ফেলে যাবে বলে?
এমন ব্যভার ছিছি কে তোমা শিখালে!

সুবৃত্তি তারকা রাজি রাজিত যথায়—
ঘন-মোহ-ঘন-রাজ-রাজত্ব তথায়।
নিরাশা-ঝটিকা-রোষে, শোক-বজ্র-নিরঘোষে,
কি বিষম দশা হায়, দেখনা হেথায়!
নিশ্চিত হৃদয়ে নাথ কোথা এ সময়!

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

মর্ম্ম কথা।

(১)
সুদীর্ঘ জীবন পথে
শুধু যে কণ্টক রাশি
প্রাণ ভরা শুধু হা হুতাশ।
কোথা কোন পথ দিয়ে
কোথা যেতে কোথা যাই
কে হেন করিল সর্ব্বনাশ।

(২)
নিদ্রা শুধু স্বপ্নময়,—
দুঃখের আবাস হিয়া,
পরের পরাণে শুধু হাসি।
অন্তরের অশ্রু ভরে
ছিঁড়ে যায় হৃদিতন্ত্রী
কে শুনিবে কারে বা প্রকাশি।

(৩)
হৃদয় পিঞ্জর পাখী
কেন যে চঞ্চল হলো—
উড়িয়ে পলাতে চায় কোথা।
কি জানি কখন কার
কি যে দোষ করেছিনু
কে দিলিরে এদারুণ ব্যথা।

(৪)
বিপিনে বাঁশরী স্বরে
সে ভাবে মাতে না পাখী
ভুলে গেছে নিত্য নব আশা।
আঁখির মিলনে শুধু
আর ত কাঁপে না প্রাণ
কে ভুলালে প্রেম ভালবাসা।

(৫)
স্নেহের পালিত তরু
কে তোরা গো ছিঁড়ে দিলি
কে হেন সাধিল মনোবাদ।
সুখের মালঞ্চময়
কে কাঁটা ছড়ায়ে দিলে
কার সনে করেছি বিবাদ।

(৬)
ভ্রমর গুঞ্জন তান
উঠেনা মালঞ্চে আর,
মুঞ্জরে না নব আশা-কলি।
ফাল্গুন আগুন কেন,
অন্তর দগধি যায়—
কাল সম কোলিল কাকলি।

(৭)
প্রান্তরে প্রান্তরে বনে
কে আগুন জ্বেলে দিলি—
চকিত কুরঙ্গ সম হৃদি।
আগুন লাগায়ে বনে
কেন গো বেড়িনি পথ,
কে বধিলি অনলে দগধি।

(৮)

আমার নয়ন কোণে
ছিল না গো পাপ লেশ
না বুঝে করিনি সর্ব্ব নাশ,
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পাখী
কেন তোরা ছেড়ে দিলি
কে ভাঙ্গিলি নিকুঞ্জ আবাস।

(৯)

ছেড়েদে আমার পাখী,
অনল নিভায়ে দেগো—
চ'লে যাব সাগরের পার।
কুরঙ্গে বাঁধিয়ে, রজ্জু
দে আমার হাতে দেগো,—
না গো,আমি আসিব না আর।

(১০)

তোদের আকাশ পানে
না গো আমি চাহিব না—
হাসিব না, কান্দিব না আর।
কুরঙ্গে বিহঙ্গে পেলে
সংসার চাহি না আমি
ভুলে যাব যন্ত্রণার ভার।

(১১)

মধূপ ঝঙ্কারে যবে
জাগিবে বনের ফুল,
সাগর নাচিবে রবিতলে।
বিহঙ্গ মধুর গানে
মাতায়ে কুরঙ্গ মন
উড়ে যাবে আকাশের কোলে।

(১২)

বিহগ মধুর স্বরে
চঞ্চল কুরঙ্গে হেরে
ভুলে রব পূর্ব্ব স্মৃতি দুঃখ।
এ দুঃখ সহিতে আর
আসিব না পুনর্ব্বার
পাষাণে বাঁধিয়া রব বুক।

শ্রীমহম্মদ আজীজ উস্ সোভান।
সিউড়ী।

জীবনী সংগ্রহ।

(১)

রূপমঞ্জরী
বা
হাটু বিদ্যালঙ্কার।

বর্দ্ধমান জেলার একটী ঘটনা, তথায় ভগবান রামকৃষ্ণের জন্ম। আর একটি ঘটনা উক্ত জেলাতে "হাটু বিদ্যালঙ্কার" নামক এক স্ত্রী-চিকিৎসক জন্ম গ্রহণ করেন। হাটুর সংক্ষিপ্ত জীবনী এই প্রবন্ধে বলা হইতেছে।

বর্দ্ধমান জেলায় কলাইঝুটি নামক গ্রামে ১১৮২ সালে ইনি জন্মগ্রহণ

করেন। ১২৮১ সালের ১৫ই পৌষ ইহাঁর মৃত্যু হয়। অতএব ইনি এক শত বৎসর জীবিত ছিলেন। ইনি বিবাহিতা হয়েন নাই।

ইঁহার পিতার নাম ৺ নারায়ণ দাস। এবং মাতার নাম সুধামুখী ছিল। নারায়ণ দাসের অনেকগুলি সন্তান হইয়া সূতিকা গৃহেই মারা যায়। অবশেষে এই কন্যাটি রক্ষা পায় বলিয়া, তাঁহারা অবহেলা করিয়া অযত্নে ইহাঁর নাম রাখেন, "হাটু।" নচেৎ তাঁহার অপর নাম ছিল "রূপমঞ্জরী।" এই নাম তিনি গুরু গৃহ হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়, নারায়ণ দাস বৈষ্ণব ধর্ম্মের লোক ছিলেন।

বাল্যকালে হাটু বা হাটিকে গ্রাম্য পাঠশালায় দেওয়া হয়। ইহা হিন্দুদের চিরকালের প্রথা। কিন্তু ইনি এই প্রথায় পড়িয়া একটু বিশেষ অভিনিবেশের কার্য্য দেখাইলেন। তাঁহার লেখা পড়ার ঝোক্ দেখিয়া, অল্প বড় হইলেও, গ্রাম্য লোকের পরামর্শে এবং গুরু মহাশয়ের যত্নে ইহাঁকে পাঠশালা ছাড়ান হয় নাই। ইঁহার বয়স যখন দশ বৎসর, সেই সময় হাটুর মাতা স্বর্গারোহণ করেন। হাটুকে সেই বৎসর পাঠশালা ছাড়াইবার কথা বলা হয়। কিন্তু হাটু এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে থাকেন। মেয়ের ইচ্ছা নয় বলিয়া, তাঁহার পিতা বেশী পীড়াপীড়ি করিলেন না। পরন্তু সেই বৎসর হাটুর পাঠশালের পড়া এক রকম শেষ হয়। এবং এই গুরুমহাশয়ের যত্নে সেই গ্রামের এক বৈয়াকরণিক অধ্যাপক মহাশয়ের টোলে হাটু ভর্ত্তি হইয়া ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই অধ্যাপক হাটুকে অতি যত্নে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এবং ইনিই কন্যার ন্যায় আদর করিয়া হাটুর নাম প্রদান করেন "রূপমঞ্জরী।"

রূপমঞ্জরী গুরু গৃহে অপরাপর শিষ্য সহ একত্রে বাস করিয়া ব্যাকরণ পড়িতেছেন, তিনি এক্ষণে ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী—বৈষ্ণব বলিয়া অবশ্য তাঁহার পিতা সমাজ-ত্যক্ত হয়েন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইনি পুরুষের সঙ্গে বিদ্যাগারে থাকিলেও ইঁহার চরিত্রে এক দিনের জন্যও—কোন কুলোকেও—বা শত্রুতাচ্ছলে—বা উপহাসচ্ছলে কেহই দোষ দেয় নাই। এমন কি আজীবন অবিবাহিতা ছিলেন, তবু ইহাঁর চরিত্র সম্বন্ধে এক দিনের জন্যও কোন কাণা ঘুষা পর্য্যন্ত হয় মাই। ইনি এত তেজী ছিলেন যে, অসৎ কথা শুনিলে বুনো বিড়ালের মত ফোঁস্ করিয়া উঠিতেন। পবিত্র উচ্চ চরিত্র এবং উচ্চ শক্তির নিকট সকলেই ঘাড়

হেট করে। ইহাই লোকের স্বভাব। বস্তুতঃ ঐ শক্তি তাঁহার ভিতর আসিয়াছিল বলিয়াই সহজে সকলেই তাঁহার কাছে নতশির হইয়াছিলেন। ব্যাকরণ পাঠাবস্থায় গুরু গৃহে সংবাদ আসিল, রূপমঞ্জরীর পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

রূপমঞ্জরী কাঁদিলেন! শিষ্যার কান্না দেখিয়া সেই গুরুই তখন তাঁহার পিতৃস্থানীয় হইয়া রূপমঞ্জরীকে সান্ত্বনা করিলেন। পিপাসার জল এক ঘটি খাইলেই তৃপ্তি হয়। কিন্তু রোগ বিশেষের পিপাসা হাজার ঘটি জল, ক্রমে ক্রমে দুই পাঁচ মাস ধরিয়া খাইলেও তৃপ্তি আইসে না। রূপমঞ্জরীর লেখা পড়ার পিপাসা ঐরূপ রোগ বিশেষ হইয়াছিল! তাঁহার গুরু এই রোগ দেখিয়া, তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। পরন্তু এই পথ দিয়া বিদ্যামন্দিরে যাইবার উপায়টি অতি সহজ। নচেৎ ইংরাজী ষ্ট্রীট্, লেনের ভিতর দিয়া যাইতে হইলে অনেক ব্যয় আছে। উহা মেঠ রাস্তা। ট্যাক্স খাজনা খুব কম। আগুন লাগিলে বাতাস বেশি হওয়া যেমন স্বাভাবিক, সেই রূপ স্বাভাবিক রূপমঞ্জরীর সংস্কৃত পথে দাঁড়ান। রূপমঞ্জরী ব্যাকরণ শেষ করিয়া পিতা মাতার প্রেতঃকৃত্য সম্পন্ন জন্য গয়াধামে গমন করিলেন।

তথা হইতে কাশীধামে গিয়া দণ্ডীদের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপরে দেশে আসিয়া তিনি গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সাহিত্য অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। সাহিত্য পাঠ শেষ হইলে, ইনি "বিদ্যালঙ্কার" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এইবার আমাদের "হাটু বিদ্যালঙ্কার" হইলেন। তবু হাটু পাড়া ছাড়িলেন না। তিনি ঐ অধ্যাপকের নিকট পুনরায় "চিকিৎসা শাস্ত্র" অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। চরক, সুশ্রুত, নিদান অধ্যয়ন করিয়া ইনি অদ্বিতীয়া চিকিৎসকা হইলেন। সময়ে সময়ে ইঁহার নিকট অনেক চিকিৎসক উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

ইনি বাল্যকাল হইতে স্ত্রী লোকের মত চুল করেন নাই। পুরুষের মত চুল কাটিতেন। বিদ্যালঙ্কার উপাধি পাইয়া ইনি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত মস্তক মুড়াইয়া শিখা রাখিয়াছিলেন। গৈরিক বসন পুরুষের মত পরিধান করিতেন এবং উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় রাধারমণ দাস নামক এক ব্যক্তিকে পালক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমাদের পূর্ব্বকালের মহাপুরুষেরা গার্গি, লীলা, খনা, মৈত্রী প্রভৃতি রত্নগুলি মা সরস্বতীর মুকুটে বসাইয়া দিয়া গিয়াছেন। একালে দীন হীন আমরা, আমাদের রূপমঞ্জরী, তরুদত্ত প্রভৃতিকে মা'র শ্রীপাদপদ্মের কঙ্কনে বসাইয়া পূজা করিতেছি।

---

(২)

তরু দত্ত।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ এই স্ত্রী-কবি কলিকাতাস্থ রাম বাগানের দত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যু ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট। অতএব ২১ বৎসর মাত্র ইনি জীবিতা ছিলেন। এই বয়সের মধ্যে ইহঁা দ্বারা বাঙ্গালী সমাজের যে মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। গোবিন্দ বাবুর দুই কন্যা এবং এক পুত্র হইয়াছিল। ইঁহার তিনটি সন্তানেই কিছু বিশেষ গুণ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এ দেশের মন্দভাগ্য এই যে, তিনটি সন্তানই অল্প বয়সেই মর্ত্ত্য লীলা সাঙ্গ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

ইঁহার পুত্রের নাম ছিল, অজকুমার দত্ত—অজ ১৪ বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। তৎপরে ইহঁার জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম অরুবালা; এবং কনিষ্ঠা কন্যার নাম কুমারী তরুবালা। ইনিই কুমারী তরুবালা দত্ত। চলিত হিসাবে ইঁহাকে সকলে "তরুদত্ত" বলিয়া তৎকালে নাম দিয়াছিল।

গোবিন্দ বাবু গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কার্য্য করিতেন। শেষ অবস্থায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সিবিলিয়ন মিষ্টার রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মত ইনিও বিলাতবাসী হইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু রমেশ বাবু যেমন "বিলাতবাসী" হইতে গিয়া আবার দেশে আগমন করিলেন, (অবশ্য ইহা দেশের ভাগ্য বলিতে হইবে) সেইরূপ গোবিন্দ বাবুও "বিলাতবাসী" হইতে গিয়া ইংলণ্ডে কিছু দিন এবং ফ্রান্সে কিছুদিন ছিলেন। মোটের উপর সর্ব্ব সমেত ইয়োরোপে ৪ বৎসর মাত্র ছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিলাত গমন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

ইনি যখন বিলাত যাত্রা করেন, তখন পুত্রটি জীবিত ছিল না। সঙ্গে অরু এবং তরু দুই কন্যাই গমন করে। তরুর বয়স তখন ১৪ বৎসর মাত্র।

এই কন্যাদ্বয় বাল্যকাল হইতেই পিতার নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া

ছিল। ইহারা কখন স্কুলে যায় নাই। কেবল ফ্রান্সে অবস্থান কালে তরু তথাকার বালিকা বিদ্যালয়ে ৫।৬ মাস আন্দাজ গিয়াছিল। ফলে, তাহা দ্বারা তরুবালার বিশেষ কিছুই শিক্ষা হয় নাই। পিতার গুণে এবং ধনে অধিকারিণী হইয়াই ইঁহারা তৎকালে জগৎমান্যা বা জগৎগণ্যা হইয়াছিলেন। এই দুই ভগ্নীর প্রতিভা প্রায় সমান ছিল! তরু যেমন বিদেশী ভাষা সকল আয়ত্ব করিয়াছিল, অরু সে পক্ষে কম থাকিলেও সেই কমটুকু অন্য শক্তি দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তরু ছবি আঁকিতে জানিতেন না। অরু তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, গোবিন্দ বাবু স্বদেশে আগমন করিয়া, এক বৎসর পরেই এই কন্যাটি হারাইলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অরু স্বর্গারোহণ করিল। কেবল সন্তানের মধ্যে তরুই রহিল।

তরু ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালা অনেক পদ্য ইংরাজীতে পরিবর্ত্তন করিয়া, ইংলণ্ডে গিয়া তথাকার সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন। তৎপরে ফ্রান্স এবং জর্ম্মণী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারা যখন ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় প্রুসিয়ার সহিত ফ্রান্সের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। সে যুদ্ধে প্রুসিয়ার জয়লাভ হয়, এবং ফ্রান্সের পতন হয়। এই পতন উপলক্ষ করিয়া তরু দত্ত ষোল বৎসর বয়ক্রমে ল্যাটিন ভাষায় ফ্র্যান্সের এক সংবাদ পত্রে একটি পদ্য লিখিয়াছিলেন, সে পদ্যের মর্ম্মার্থ এই যে "ফ্রান্সের পতন হয় নাই; মূর্চ্ছাগত হইয়াছে মাত্র; সকলে মিলিয়া ইহার শুশ্রূষা কর। দুর্ভাগ্য ফ্রান্স! তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় কাঁদিতেছে।"

বিদেশে অবস্থান কালে উক্ত সকল দেশের সংবাদ পত্রে তরু যে সকল পদ্য লিখিয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিয়া তরুর পিতা ঐ সকল একত্র করিয়া এক পদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের দাম হইয়াছিল, ৭৲ টাকা। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত হইল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তরু ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া তরু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। মরিবার দুই দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার হস্তে দুইটি কার্য্য ছিল। ১ম, বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থ খানি ইংরাজীতে অনুবাদ হইতেছিল। ২য়, ল্যাটিন ভাষায় লিখিত "ভারত-রমণী" গ্রন্থখানি বঙ্গানুবাদ হইতেছিল। পরন্তু তরু আর দুইখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। প্রথম

খানি ল্যাটিন ভাষায় লিখিত এক উপন্যাস। দ্বিতীয় খানি ইংরাজীতে লিখিত ভারতের গান। তরু মরিয়া যাইবার দুই বৎসর পরে এক ফরাসি রমণী তরুর লিখিত উপন্যাস প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকের সঙ্গে তিনি তরুর সংক্ষিপ্ত জীবনী পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন। তৎপরে ইংরাজী পদ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি খানি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তরুর পিতা প্রচারিত করেন।

তরুর যশ বাতাসে বিদেশেই হেলিয়া দুলিয়াছিল। তরুর জীবনীতে যে পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহার সুগন্ধ এদেশী গাছের হইলেও এদেশী লোকে পায় নাই—সে আঘ্রাণ সাহেব বিবির অদৃষ্টে ছিল, তাহারাই সে তরুর আদর করিয়াছিল। এ তরুর ফুলে কিন্তু ফল হয় নাই। প্রায় ফুলের ফল ভাল হয় না !!

ফল হইবে কি? তরুর বিবাহ হয় নাই। পর্ব্বত সদৃশ জ্ঞানী গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে তরু যদি দিনের মধ্যে, আটটি তর্ক করিত, তাহার ৬টি তর্কে গোবিন্দ বাবু পরাস্ত হইতেন! তরুর রন্ধন কার্য্য, এবং গান, বাজনা ইত্যাদি কার্য্যেও বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

রামবাগানের দত্তপরিবারে মধ্যে মধ্যে যথার্থ স্বর্গের দেব দেবীরা আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তরু যথার্থই স্বর্গের দেবী ছিলেন। এই পরিবারের আর এক মহাপুরুষ, আমাদের বিবেকানন্দ স্বামী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

আদর্শ নারী।

যাহা সত্য, তাহা সার্ব্বজনীন। ধর্ম্মগত ও জাতিগত পার্থক্যে তাহার ব্যতিক্রম হয় না। সত্য কখন এক বই দুই হইতে পারে না। মিথ্যা কথা, চৌর্য্য প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম বলিয়া সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এগুলি সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। তবে এখনও জগতের জাতিগণের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। সে কেবল বুঝিবার দোষে। যে সকল জাতির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য, কেননা উক্ত মনীষিগণ জাতি ও সম্প্রদায়ের

প্রভাব হইতে উচ্চে অবস্থান করিয়াছিলেন। জাতিগত, ধর্ম্মগত, সম্প্রদায়গত ভাব তাঁহাদের বিমল প্রতিভাকে সকল সময় কলুষিত কবিতে পারে নাই। যাহা সত্য, তাহা অবিকৃত অবস্থায় তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। সুতরাং নিরপেক্ষ ভাবে ইঁহাদের মত পর্য্যালোচনা করিলে অনেক বিষয় সম্বন্ধে অভ্রান্ত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। যে সকল ব্যপার লইয়া আমরা নানা দ্বন্দ্ব করিতেছি, তাহাদের অনেক গুলির মীমাংসা হইয়া যায়। বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, প্রায় সকল বিষয়েই প্রথম শ্রেণীর কবিগণ প্রায় একরূপ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের কথা, সমাজের কথা, প্রভৃতি নানা কথার বিচার কবিগণ করিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ বিষয়েই তাঁহাদের সকলের মত মূলতঃ এক। সমাজ সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা দেখিলে বুঝা যায়, তাঁহারা আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ স্বামী একরূপই চিত্রিত করিয়াছেন। ম্লেচ্ছ কবি সেক্ষপীর এসম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, আর্য্যকবি কালিদাস প্রভৃতিও তাহাই করিয়াছেন। আজ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, আদর্শ স্ত্রী চরিত্র সেক্ষপীর কিরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, আমাদের আর্য্যকবিগণের অঙ্কিত চরিত্রের সহিত তাহার কত টুকু সাদৃশ্য আছে, আর কতটুকুই বা নাই।

সেক্ষপীর আর্য্যকবিগণের ন্যায় জানিতেন, পতিই স্ত্রীর পরম দেবতা। স্ত্রীর পক্ষে পতির আদেশ অনবহেলনীয়, স্ত্রীর শরীর ও সম্পত্তি যাহা কিছু তাহা স্বামীরই সম্পত্তি, স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অধীন, তাহার স্বাধীনতা নাই। এই সকল কথা বুঝাইবার জন্য তিনি নানা স্ত্রীচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তবে ইমোজেন চরিত্রে স্ত্রীর কর্ত্তব্য বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমরা ইমোজেন চরিত্র প্রয়োজনানুরূপ আলোচনা করিব।

ইমোজেন রাজকন্যা, রাজ্যেশ্বর পিতার একমাত্র সন্ততি। পিতার অজ্ঞাতসারে পস্থিউমস্ নামক দরিদ্র যুবককে বিবাহ করিয়াছেন। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার স্বামীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। পতিপরায়ণা ক্ষুব্ধ হৃদয়ে পিতৃগৃহে অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। সহসা একদিন তাঁহার স্বামী কোন দূরবর্ত্তী স্থানে তাঁহাকে সাক্ষাৎ জন্য আসিতে আদেশ করিলেন। কোন বিবেচনা না করিয়া, পতিদর্শনাকাঙ্ক্ষায় উন্মাদিনী হইয়া, ইমোজেন ভৃত্যের সহিত তথায় গমন করিলেন। কিন্তু হায়! তথায় কি দেখিলেন?

যাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় পিতার স্নেহে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি পাগলিনী-বেশে এত দূর পথ অতিক্রান্ত করিলেন, তিনিত আইসেন নাই! ভৃত্য তাঁহার স্বামীর নামাঙ্কিত এক পত্র তাঁহাকে দিল। আহা! অভাগী সেই পত্রে প্রেম সম্ভাষণের পরিবর্ত্তে কঠোর প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিল। দেখিল, স্বামী তাহাকে দ্বিচারিণী ভাবিয়া ভৃত্যের প্রতি তাহার প্রাণবধের আদেশ দিয়াছেন! স্বাধ্বী বুঝিতে পারিলেন না, কিরূপে তিনি দ্বিচারিণী হইয়াছেন। পতিবিরহে দারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইয়া, অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিলে কি দ্বিচারিণী হয়? তিনি পতির চরিত্রে সন্দিহান হইলেন। ভাবিলেন, তাঁহার স্বামী হয়ত অপর কোন স্ত্রীলোকের প্রণয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি এই গুরুদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় ব্যথিতা হইয়া তিনি মৃদু ভাবে পতিকে ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, তাঁহার স্বামীর চরিত্র কপটতাময়। তাঁহার অমন স্বামী যখন কপটতা দেখাইতে পারিলেন, তখন জগতে পুরুষকে ত কেহ বিশ্বাস করিবে না।

O,
Men's vows are women's traitors! All good seeming,
By any revolt, O husband, shall be thought
Put for villany; not born where 't grows,
But worn a bait for ladies.

ইমোজেন পতির উদ্দেশে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তিরস্কারের মাত্রা ইহা অপেক্ষা কার অধিক হয় নাই। তাঁহার পতির আদেশ পালনীয় ইহা বিবেচনা করিয়া, ভৃত্যকে প্রভুর আদেশ পালন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামী যখন তাঁহাকে মরিতে আদেশ করিয়াছেন, তখন তিনি কেন বাঁচিয়া থাকিবেন? কিন্তু হৃদয়বান ভৃত্য কিছুতেই তাঁহার প্রাণবধে সম্মত হইল না, তবে কি হইবে? তাঁহার বাঁচিয়া থাকা যে উচিত নহে। আত্মহত্যা করিবেন? না, তাঁহা যে মহাপাপ বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ইমোজেনের মরা হইল না।

আমরা হিন্দু। স্ত্রীচরিত্রের এরূপ উৎকর্ষ দেখিলে ভক্তিতে আমাদের হৃদয় গলিয়া যায়। ইমোজেন জানিতেন, তাঁহার কোন অপরাধ নাই। বিনাদোষে, স্বামী তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন; ইহাতে কাহার হৃদয় না বিচলিত হয়? ইমোজেন স্বামীকে কপটাচার বলিয়াছেন, কিন্তু

তখনও স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তির কিছুমাত্র তারতম্য হয় নাই। তাহা হইলে তিনি স্বামীর আদেশ পালন করিবার জন্য ভৃত্যের প্রতি অত নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখাইতেন না। ইমোজেন পতিকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে ক্রোধের চিহ্নমাত্র নাই। তাহা কেবল পতির এরূপ অধঃপতন জন্য দুঃখে পরিপূর্ণ!

দুষ্মন্তও শকুন্তলার প্রতি অতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। কত তোষামোদ করিয়া, কত প্রণয় কথা বলিয়া, বনবাসিনী সরলা শকুন্তলার মন ভুলাইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিয়া আসিয়া আর তাহার কোন সন্ধান লইলেন না। আবার যখন শকুন্তলা অনাহূতা হইয়াই পতি সমীপে পরিগ্রহ প্রার্থনা করিলেন, তখন দুষ্মন্ত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। দুঃখে শকুন্তলার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কত কথা বলিয়া পতিকে বুঝাইতে, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইতে চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই দুষ্মন্ত বুঝিলেন না। শকুন্তলা যে কপট ব্যবহার করিতেছেন, তাহা বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহাতে শকুন্তলার বড় রাগ হইল। বলিলেন—

"অণজ্জ অত্তণো, হিঅ আণুমাণেণ কিল সর্ব্বং পেক্‌খসি কোণাম অণ্ণো ধর্ম্মকঞ্চু অব্যবদেসিণো তিণচ্ছণ্ণ কুবোবম স্ম তুহ অনুআরী ভবিস্মদি।"

অনার্য্য, আপনার হৃদয় অনুসারে অপরকে বিচার করিতেছ, তোমার মত কপট ধর্ম্মীর অনুকরণ অপরে কে করিবে?

শকুন্তলার তিরস্কার এই পর্য্যন্ত হইল। ইমোজেনের তিরস্কারের সহিত এই তিরস্কারের কম পার্থক্যই আছে। বেশীর ভাগ শকুন্তলার রাগ ও দুষ্মন্তকে অনার্য্য বলিয়া গালি দেওয়া। কবি শকুন্তলাকে যেরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ না হইলে অসঙ্গত হইত। শকুন্তলা তাপস কন্যা। কাপট্য কাহাকে বলে, তাহা তিনি কখনই জানেন না। বনবাসিনী তাপস কন্যার পক্ষে কিছু তেজস্বিনী হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ তিনি রাজার সহিত কয় দিন ব্যবহার করিয়াছেন? রাজার হৃদয় জানিবার তাঁহার সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে সরলা বালিকার কোপ প্রকাশ করা অসঙ্গত হয় নাই। ইমোজেনও স্বামীর প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছিলেন, তাহাও স্বাভাবিক হইয়াছে। ইমোজেন স্বামী স্ত্রী ভাবে পস্‌থিওমসের সহিত অধিক দিন সহবাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বামী সুন্দরী যুবতী পরিপূর্ণ ইটালী দেশে বাস করিতেছিলেন।

তাহার উপর তাঁহার প্রতি এই নির্দ্দয় ব্যবহার! ইহাতে যে তিনি স্বামীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অমার্জ্জনীয় অপরাধ হয় নাই।

পাঠক এইবার তুল্যাবস্থাপন্না, মূর্ত্তিমতী সতীত্ব রূপিনী, সীতা দেবীর অবস্থা দেখুন। তিনিও শকুন্তলা ও ইমোজেনের ন্যায় পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া কি বলিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। তাহার পর বিচার করুন। ভাগীরথী তীরে লক্ষ্মণ যখন সীতাকে রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন, তখন সীতা বলিয়াছিলেন—

"বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা
বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষং।
মাংলোক বাদ শ্রবণাদাহা সীঃ
শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলশ্য॥"

লক্ষ্মণ, তুমি রাজাকে আমার কথা মতে বলিও, আপনি সর্ব্বজন সমক্ষে আমাকে হুতাশনে পরীক্ষা করিয়া লইয়াও, লোকাপবাদ শ্রবণে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কি আপনার কুলোচিত হইয়াছে?

এই কথায় একটু তিরস্কারের গন্ধ আছে। সীতার ন্যায় স্ত্রীও পতিকে তিরস্কার করিলেন। যাহা হউক, সেক্ষপীর যাহা করিয়াছেন, কালিদাসও তাহাই করিলেন। উভয়ে ত পরামর্শ করেন নাই। সত্য সর্ব্বস্থানেই সমান। তাহার পর সীতা বলিয়াছেন, তাহা সীতা ভিন্ন অপরে কেহ বলিতে পারেন না।

"কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং
ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তর পাতকানাম্
বিপাক বিস্ফুর্জ্জথুব প্রসহ্যঃ॥"

অথবা আপনার সর্ব্বতোভাবে হিতাহিত বুঝিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। সুতরাং আপনি যে করিয়া এইরূপ করিয়াছেন, ইহা কখন সম্ভবপর নহে। আমিই পূর্ব্ব জন্মে যে সকল পাতক করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে এইরূপ ঘটিয়াছে।

"সাহং তপঃ সূর্য্য নিবিষ্ট দৃষ্টি
রূর্দ্ধং প্রসূতে শ্চরিতং যতি ষ্যে।

ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা নচ বিপ্রযোগঃ ॥"

অতএব আমি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর সূর্য্যে নিবিষ্টদৃষ্টি হইয়া এরূপ তপস্যা করিব, যাহাতে পুনরায় জন্মান্তরেও আপনি আমার পতি হন, কিন্তু যেন বিচ্ছেদ না হয়।

ইহা অপেক্ষা উচ্চ কথা হইতে পারে না। ইমোজেন ও শকুন্তলার ব্যবহার অপেক্ষা সীতার ব্যবহার অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। তাহার কারণও আছে। বিবাহের পর হইতে সকল সময়েই সীতাদেবী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিতেছেন। রাম চরিত্র বুঝিতে তাঁহার কিছু বাকী নাই। বড় দুঃখের উচ্ছ্বাসে তিনি প্রথমে রামচন্দ্রকে দোষ দিয়াছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংযম করিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীও স্বামী কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা ও লাঞ্ছিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু মৃণালিনী তজ্জন্য স্বামীকে কোন দোষ দেন নাই। যে দিন স্বচ্ছসলিলা বাপী তটে হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, সে দিন হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে স্বৈরিনী ভাবিয়া স্বীয় বক্ষস্থিত মৃণালিনীর মস্তক ইষ্টক সোপানে আহত করিয়া চলিয়া যান, সে দিন মৃণালিনী গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে মৃণালিনী মাতা পিতা পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে হেমচন্দ্রের জন্য ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই মৃণালিনীই আজ হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রহৃত হইলেন। মৃণালিনী ইহাতে হেমচন্দ্রের প্রতি কিছুই রুষ্ট হয়েন নাই। গিরিজায়ার কিন্তু বড় রাগ হইয়াছিল। সে মৃণালিনীকে নবদ্বীপ ত্যাগের পরামর্শ দিয়া বলিল, "রাজপুত্রের সহিত এজন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল, তবে আর কার্ত্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন?" মৃণালিনী বলিল "গিরজায়া, হেমচন্দ্রের সহিত এজন্মে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী।" গিরিজায়া মৃণালিনীকে বুঝাইয়া দিল যে, পূর্ব্ব দিন হেমচন্দ্র তাঁহাকে তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন। মৃণালিণী বলিল, "সে আমারই দোষ, আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই—কি বলিতে কি বলিয়াছিলাম।"

ইহার উপর আর কথা চলে না, গিরিজায়া হারি মানিল। এই সব বিবেচনা করিলে, মৃণালিনী চরিত্র বড় উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। মৃণালিনীর নিকট

যেন ইমোজেন, শকুন্তলা, সীতার পরাজয় হইয়াছে। তাহার পর একবার মিলন দৃশ্যটা দেখা যাউক। আমরা স্বতঃই আশঙ্কা করিতে পারি, না জানি ইঁহারা কত অভিমান, কত তিরস্কার করিয়াছিলেন। বালকবেশে ইমোজেন পিতার নিকট দণ্ডায়মান। তাঁহার স্বামী, যে দুরাত্মা তাঁহার এত দুর্গতির কারণ, সেও অপর অনেকেই দাঁড়াইয়াছে। ইমোজেন কৌশল করিয়া উক্ত দুরাত্মার নিকট সকল কথা বাহির করিলেন। পস্‌থিউমসের মনে ইমোজেনের চরিত্রে যে সন্দেহ ছিল—তাহা অপনীত হইল। ইমোজেনও বুঝিলেন যে, কুলোকের চক্রান্তে পড়িয়া স্বামী তাঁহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার এক নূতন বিপদ জুটিল। পস্‌থিউমস্ ইমোজেনকে ছদ্মবেশে চিনিতে না পারিয়া কোন কারণ বশতঃ প্রহার করিলেন। তাহাতেও ইমোজেনের রাগ হইল না। পরস্পর জানা শুনা হইলে ইমোজেনই স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—

"Why did you throw your wedded lady from you?
Think that you are upon a rock and now
Throw me again."

সব মিটিয়া গেল।

আর শকুন্তলা? তিনি দীর্ঘ বিরহের পর, এত দুর্দ্দশার পর, মারীচের আশ্রমে দুষ্মন্তকে দেখিয়া কি বলিয়াছিলেন? তিনিত তখনও জানিতেন না যে, দুষ্মন্ত তাঁহাকে কেন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অথচ দুষ্মন্তের প্রতি তাঁহার কোনরূপ রাগ নাই, কোন অভিমান নাই। দুষ্মন্তকে দেখিয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিলেন। পূর্ব্বকথা কিছুই যেন মনে নাই। দুষ্মন্তের কাতরোক্তি শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনার জয় হউক," দুষ্মন্ত পদতলে পতিত হইলে তিনি বলিলেন, "উঠুন উঠুন, শেষে আমার সুখ হইবে বলিয়া প্রথমে কষ্ট পাইয়াছিলাম।" অর্থাৎ ইহাতে দোষ তোমার নাই—দোষ অদৃষ্টের। আর মৃণালিনীর কথা পাঠকত বুঝিতেছেন। হেমচন্দ্র যখন বলিলেন "আর একবার ক্ষমা কর—আর কখন তোমায় ত্যাগ করিব না" তখন মৃণালিনী কি করিল? বঙ্কিম বাবুর ভাষাতেই শুনুন।

"নিরভিমানিনী নির্লজ্জা মৃণালিনী আবার তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইয়া স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন। সীতার সহিত রামচন্দ্রের আর মিলন হয় নাই। চারিটি প্রাতঃস্মরনীয়া আদর্শ নারী-চিত্রের এক পার্শ্ব আপনাদের সমক্ষে

ধরিলাম। ইহাদের সৌন্দর্য্যের ছটা স্বর্গ হইতে গৃহে গৃহে পতিত হইয়া অন্ধকার দূর করিতেছে।”

লোহিয়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিকুঞ্জ বাবু লোহিয়ার ভাব দেখিতেন, তাহার দুর্ব্বলতায় মর্ম্মস্থান তিনি বিশেষ বুঝিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মগ্রন্থি সূত্র তাঁহারই হাতে তাহা বিশেষরূপ তাঁহার জ্ঞান হইয়াছিল; তিনি লোহিয়ার এই ভাব দেখিতেন, আর মনে মনে হাসিতেন। সরলা বনবিহগিনী জালবদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইতেন; সুধু আনন্দ নহে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা আত্মম্ভরীতা, একটা দর্প, যেন নাচিয়া বেড়াইত, নিকুঞ্জ বাবু তাহা গোপন করিতে চাহিলেও তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় তাহা প্রকাশ করিয়া দিতে কসুর করিত না।

স্বীয় বিদ্যাবলে একটি সরলা রমণীকে, সরলা বন্য হরিণীকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা যখনই ভাবিতেন, তখনই তাঁহার ওষ্ঠাধরে হাস্যরেখা দেখা যাইত, মুখে গর্ব্ব চিহ্ন প্রকাশ পাইত। তিনি বিশেষ চরিত্রবান্ লোক ছিলেন, মধুর বাসন্তী সন্ধ্যায়, বকুল, বেলার সুমিষ্ট মৃদু সুবাসামোদিত গন্ধবহের মৃদু মধুর সঞ্চালনে, যখন যুবক নিকুঞ্জ হারমোনিয়মদ্বিতীয় হইয়া নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা লোহিয়াকে স্বীয় সম্মুখে দেখিতেন, তখন আত্মযোনিকে কোন দিনই ‘প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যত’ দেখিতে পান নাই। লোহিয়ার সে নিশ্চল ভ্রমরকৃষ্ণ তারকা-সমন্বিত লোচনের চাহনির মধ্যে লুক্কায়িত প্রেমতৃষ্ণার অবগুণ্ঠিত মুখ কোন দিনই তিনি দেখেন নাই, অথবা নিজ হৃদয়েও কোন দিন ‘তপোবন-বিরোধী, নীতি-বিদ্রোহী কোন ভাবের হটাৎ আক্রমণ অনুভব করেন নাই। সেই নির্জ্জনে যখন উভয়ে সম্মুখীন হইতেন, তখন দুইটি বিভিন্ন ভাব উভয়ের মন বিভোর করিয়া দিত। লোহিয়া সেই স্বর লহরীর নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়া অতি পবিত্র, অগাধ সুখে বিভোর হইত, আর নিকুঞ্জ বাবু বাণাঘাতে হরিণী বিদ্ধকারী বা জালে হরিণী বদ্ধকারী ব্যাধের ন্যায় বিজয়ানন্দে বিভোর হইতেন, এবং আহতা, বদ্ধার উপর আনন্দ-মিশ্রিত কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন; করুণ হইতে করুণতর স্বরতন্ত্রে

আঘাত করিয়া হৃদয়ের অজ্ঞাত বিরহ ব্যথা জাগাইয়া দিয়া কখন চিত্তোন্মাদকারী স্বরজাল বিস্তার করিতেন, এবং বিজয়োৎফুল্ল নেত্রে লোহিয়ার দিকে চাহিয়া দেখিতেন, শিকার এবার কেমন বিঁধিল। বিচিত্র-হৃদয়হারী গীত-তরঙ্গে লোহিয়ার হৃদয় কাড়িয়া লইয়া কোথায় ভাসাইয়া দিয়া হঠাৎ সে স্বর-স্রোত রুদ্ধ করিয়া ফেলিলে দেখিতেন, লোহিয়া পাগলের মত অস্থির হইয়া তাঁহার হৃদয়খানি তল্লাস করিতেছে; কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে না পাইয়া অস্থির হইয়া মনে মনে গাহিতেছে ‘কি হোলো সখি, বুঝিবা আমার হৃদয়খানি হারিয়েছি।’ লোহিয়ার চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত, সে ছটফট্ করিত, ‘তোর পায় পড়ি’ তুই বন্ধ করিস্‌নে’ বলিয়া বারান্দায় মাথা কুটিত, আহত শিকার ছটফট্ করিলে শিকারী তাহা যে উল্লাসের চক্ষে দেখে, আমাদের নিকুঞ্জ বাবুও ঠিক সেই চক্ষে তখন তাহাকে দেখিতেন। যখন বুঝিতেন খুব হয়েছে, যখন সে কষ্ট দেখিয়া তাহার উল্লাস সম্পূর্ণ হইত, তখন হঠাৎ আবার সে ঝঙ্কার জাগিয়া উঠিত, জাগিয়া উঠিয়া লোহিয়ার হৃদয়খানি কাঁপাইয়া আলোড়িত করিয়া আবার ঠিক কেন্দ্রস্থ করিয়া স্থিরভাব আনিয়া দিত।

কোন কোন দিন নিকুঞ্জ বাবু ঠিক সময় ইচ্ছা করিয়া বাদ্য বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতেন; লোহিয়ার প্রাণ ঘরে উড়ু উড়ু করিত, অস্থির, উতলা হইয়া পড়িত, অহিফেনে-সবী যেমন উপযুক্ত মৌ-তাতের সময় তদভাবে কাতর হইয়া পড়ে, আড্ডায় উপস্থিত হইয়া হা হতাশ করিতে থাকে, শেষে ধরাশায়ী হয়, লোহিয়ারও ঠিক সেই দশা হয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণা হইলেই লোহিয়া আর ঘরে থাকে না, ছুটিয়া বাঙ্গালায় আসে, নিকুঞ্জের পায় পড়ে, ধূলায় গড়াগড়ি দেয়, ছুটাছুটি করে, নিকুঞ্জ বসিয়া হাসেন, কখন একটা ‘সা’ কি একটা ‘নি’ টানিয়া দেন, বা এক বা অর্দ্ধ কলি গান হারমোনিয়মে আবৃত্তি করেন, আবার নিস্তব্ধ হন; লোহিয়া দগ্ধে মরে; প্রেমিকার প্রিয়-বিরহ যেমন অসহনীয়, অভিসারিকা স্বীয় নায়কের প্রতি যেমন প্রেমবতী, লোহিয়াও হারমোনিয়ম স্বরের সহিত সেইরূপ সম্বদ্ধ। এইরূপ কিছুকাল দগ্ধাইয়া নিকুঞ্জ শেষে বাদ্য আরম্ভ করেন, অমনি লোহিয়া প্রকৃতিস্থ হয়, সব কষ্ট দুঃখ দূর হয়, প্রাণ শান্ত হয়, লোহিয়া যেন সুখোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠে ‘সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি।’

নিকুঞ্জ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রত্যহ বাজান বলিয়া লোহিয়া তাঁর উপর

বড় সন্তুষ্ট, তাঁর উপর বড় কৃতজ্ঞ; সারাদিন সে প্রাণ দিয়া শরীর পাত করিয়া তাঁর সব কাজ করিয়া দেয়।

নিকুঞ্জের তিন চারিজন চাকর আছে, তিনি লোহিয়াকে কোন কাজ করিতে অনেকবার নিষেধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু 'কঃ ঈপ্সিতার্থে স্থির নিশ্চয়ং মনঃ, পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতাপয়েৎ' সব যুক্তি তর্ক বালির বাঁধের ন্যায় ভাসিয়া যায়,লোহিয়া নিবৃত্তা হয় না। সারাদিন লোহিয়া কাজ করে, ঘরের কাজেরও সাহায্য করে, আর বনে বনে বেড়াইয়া সুগন্ধি বনফুল সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গলার প্রাঙ্গণস্থিত বকুল গাছের ফুল সংগ্রহ পূর্ব্বক সুবৃহৎ একগাছি করিয়া মালা গাঁথে; সন্ধ্যায় যখন সে গীতাকর্ষিতা হইয়া আসে, তখন শালপত্রপুটে সযত্ন রক্ষিত মালা ছাড়া মণি মানিক্য অপেক্ষাও অধিক যত্নে অঞ্চলে ঢাকিয়া লইয়া আইসে. গীত শ্রবণান্তে আনন্দে মালাটি হারমোনিয়মের উপর রাখিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে প্রাণের অব্যক্ত ভাষা সুব্যক্ত করিয়া চলিয়া যায়। নিকুঞ্জ বাবু এই সব প্রীতি উপহার চিহ্ন মালা গুলি সযত্নে স্বীয় বিজয়-লুণ্ঠিত ধনের ন্যায় দেওয়ালে কাঁটা মারিয়া ঝুলাইয়া রাখেন, আর দিনের বেলায় সেই সব মালা দেখিয়া স্বীয় বল বীর্য্যের প্রকৃষ্ট চিহ্ন মনে করিয়া আনন্দিত হন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,ইহাদের উভয়ের মনে আর কোন অভিপ্রায় দিনৈকের তরেও উদয় হয় নাই, কিন্তু এই সব অযাচিত কার্য্য, মাল্যোপহার, প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাঙ্গলায় আগমন ইত্যাদি সমবেত হইয়া নিকুঞ্জের কর্ম্মচারীগণের মনে সন্দেহ বীজ বপনের হেতু হইয়া পড়িল এবং স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সে বীজ উপ্ত হইবা মাত্র ২।১ দিনের মধ্যেই প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা যুক্ত বৃক্ষে পরিণত হইয়া পড়িল; অনেকে লোহিয়াকে নিকুঞ্জের সহিত একাসনে বসিতে, কপোলে কপোল; ওষ্ঠে ওষ্ঠ সম্মিলিত হইতে দেখিবার সম্বন্ধে স্বীয় নয়নকে অভ্রান্ত সাক্ষ্য স্বরূপ প্রচার করিল। অন্যে তাহার উপর একস্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্বীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির সম্যক্ পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে লোহিয়াকে দ্বিপ্রহর রাত্রে নিকুঞ্জের গৃহ হইতে এসেন্স-সুবাসিতা এবং গলিতকুন্তলা অবস্থায় বাহির হইতেই দেখিল। কথা যখন উঠিল, তখন সুধু কর্ম্মচারীদের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না, বাতাসের আগে ছড়াইয়া পড়িয়া সাঁওতালদিগের মধ্যেও তাহার একটু আদটু আভাস পৌছিল। তাহারা সরল, অস্থির মতি! স্বল্পেই বিশ্বাসী। সুতরাং একবার

তাহারা বুঝিবা মাত্র জ্বলিয়া উঠিল, হাকিমকে বধ করার জন্য বদ্ধপরিকর হইল।

নিকুঞ্জ এ সংবাদ শুনিলেন, বুঝিলেন, ভাবিলেন, সারা দুপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাদচারণা করিয়া বেড়াইলেন, শেষে কোন ফল না পাইয়া শুইয়া পড়িলেন। একজন বিশ্বস্ত পাইক রাজধানীতে পত্র লইয়া ঘোড়ার ডাকে রওনা হইল।

সন্ধ্যার ছায়া বনভূমিকে আবার ঢাকিয়া ফেলিল, অভ্যাস মত লোহিয়া বকুলমালা হস্তে লইয়া বারান্দার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু আজ নিকুঞ্জ নাই, তাঁর চেয়ার নাই, হারমোনিয়ম নাই, লোহিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিল, খানিক ছুটাছুটি করিল, শেষে আর অপেক্ষা করা অসহ্য হইয়া পড়িল। বাঙ্গালার দিকে তাকাইয়া দেখিল, বাতায়ন উন্মুক্ত রহিয়াছে, ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠিল, বাতায়নে মুখ দিয়া দেখিল, নিকুঞ্জ শয্যায় শয়ান। কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল 'গম্‌কে গম্‌কে' (হাকিম) চমকিয়া উঠিয়া নিকুঞ্জ তাকাইলেন, দেখিলেন, নিরপরাধিনী তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাণের হেতুভূতা লোহিয়া স্বর্গীয় সরলতা-মণ্ডিত বদনে বাতায়নে দাঁড়াইয়া!

নিকুঞ্জ মনে করিলেন, তিনিই অপরাধী; এতদিন তিনি মনের আনন্দে সরলা বন্যহরিণীর যে বিজয়ানন্দ উপভোগ করিয়াছেন এবং বৃথা তাহাকে আন্তরিক কষ্ট দিয়াছেন, এখন তাহার প্রায়শ্চিত্তের সময়! প্রাণে যেন বড় ব্যথা লাগিল, বড় অনুতাপ হইল, কতদিন লোহিয়া মাটিতে গড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়াছে। একটু বাজাইতে বলিয়াছে, তিনি হাসিয়া সে কষ্ট দেখিয়াছেন, তাহা মনে পড়িল, কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন 'লোহিয়া, আমায় ক্ষমা কর।'

অসভ্য সাঁওতাল-কন্যা লোহিয়া ক্ষমা করার অর্থ বুঝে না, সে তাহা জানে না, ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া বলিল, 'তু কি বল্‌ছিস্? বজাবি না, মোর মনডা কিম্‌তি করুছি। উঠি আয়, বজাই দে।' এমন মিষ্ট স্বরে, এমন আগ্রহের সঙ্গে লোহিয়া ঐ কথাগুলি বলিল যে, নিকুঞ্জের প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গেল। নিকুঞ্জ উঠিয়া বসিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন 'লোহিয়া আমি খুন হইয়া যাইব, আমাকে মারিয়া ফেলিবে।' কাঁদিয়া উঠিয়া লোহিয়া বলিল 'সে কি; তু মরিবি তো বাজা বাজাইব কে? তা হব নাহি। তু মোর বজা যত্ন করিস্, বজা শুনাস্, তোর বিনা কে তা করিব; তা হব নাহি,

তু মোর প্রাণে যে সুখ দিছু, তু মরিবি কাঁহে? মু তোকে মরিতে দিব নাহি! তু ওঠ্, আয়, বজা! বজা! মোর মনডা বড় কেমন করুছি! আর ঠিক রহি.পারি না!'

নিকুঞ্জ শুনিলেন, সুমিষ্ট আহ্বান শুনিয়া তিনি সবল হইলেন, দ্বার খুলিয়া দিলেন, হারমোনিয়ম বাহির করিয়া দ্বারের সম্মুখে চেয়ার সরাইয়া লইলেন, এবং কোলের উপর হারমোনিয়ম রাখিয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিলেন। আজ নিকুঞ্জ অতিশয় মনোনিবেশ করিয়া সুশিক্ষিত বাদন বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। যেন আজ জন্মের শেষ গানবাদ্য করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার বাধ্য বাদ্যযন্ত্রও যেন আজ তাহা বুঝিয়াছে, কোথা হইতে আজ সে তাহার দেহে স্বর্গীয় স্বরের সমাগম করিয়াছে; সে আজ হৃদয়-দ্রবকারী করুণকণ্ঠে কোন অজ্ঞাত শোক গাথা গাহিতেছে। অমার অন্ধকারে দেহ মিশাইয়া নীরব নিস্পন্দ লোহিয়া সে স্বর লহরী অঞ্জলি পূরিয়া পান করিতেছে, কিন্তু তাহাতেও যেন তার তৃপ্তি নাই, সে আরও চায়, সে হৃদয় চিরিয়া সে স্বরের প্রত্যেক আঘাত মর্ম্মস্থানে অঙ্কিত করিয়া লইতে চায়। তাহলে বুঝি তার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়, অথবা সে ভাবিতেছে যে হৃদয়খানি দ্রব করিয়া সেই স্বর তরঙ্গের সঙ্গে যদি মিশাইয়া দিতে পারে যে, তাহার হৃদয় আর স্বর লহরীতে কোন পার্থক্য, কোন অন্তর না থাকে, তা হলে বুঝি তার প্রাণের শান্তি হয়।

হারমোনিয়ম করুণকণ্ঠে আলাপ করিতে লাগিল। মুলতানের স্বরে প্রাণস্পর্শী চিৎকারে বনভূমিকে চমকিত করিয়া তুলিতে লাগিল, সে স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাদকের হৃদয় যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে লাগিল; সে কাতর ধ্বনি লোহিয়ার কোমল প্রাণে সহিল না, লোহিয়া মনে করিল, হারমোনিয়ম বড়ই প্রাণের ব্যথায় কাঁদিতেছে! তাহার চক্ষে অশ্রুধারা বহিল, সে অবসন্ন হইয়া পড়িল, স্বরলহরী থামিয়া গেলে রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'ও অমন করিয়া কাঁদে কেন? অত কাঁদা তো মু সহি পারি না। নিকুঞ্জ কহিলেন, 'ও আজ মরিবে তাই কাঁদিতেছে।'

চমকিয়া লোহিয়া উঠিয়া বসিল, বিস্মিত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল 'মরিবে? কাঁহে? মু রহিতে ওকে মরিতে দিব না। কি দুঃখে মরিবে? মারিবে কে?''

নিকুঞ্জ কোন উত্তর দিলেন না; আবার যন্ত্রকে চালিত করিলেন, আবার

স্বর তরঙ্গ বনভূমি ভাসাইয়া দিল। এদিকে অন্ধকারে দেহ মিশাইয়া কতকগুলি ক্রুদ্ধ সাঁওতাল দাত্র হস্তে নিকুঞ্জকে বধ করিতে আসিয়াছে, তাহারা বাঙ্গলার উত্তর বারান্দায় চুপে চুপে দাঁড়াইয়া আছে; স্বরতরঙ্গ তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সে সঙ্গীতপ্রিয় মর্ম্মের ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাণ ভূমিষ্ট করিয়া দিয়াছে, এমন গীতবাদনকারীর প্রাণবধের সঙ্কল্প তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে। ধীর স্থির নিস্পন্দ হইয়া তাহারা সে বাদন শ্রবণ করিতেছে। এমন সময় নিকুঞ্জ বাবু সে স্বর বন্ধ করিয়া দিলেন। একটু নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিলেন। কি একটু ভাবিলেন, আবার ঝঙ্কার দিয়া যন্ত্র জাগাইয়া তুলিলেন; নিকুঞ্জ লোহিয়ার প্রিয় গীতটি কয়েকবার শুনিয়াছিলেন; হারমোনিয়মে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, আজ সেই গীতটি ঠিক লোহিয়ার সুরে হারমোনিয়ম গাহিয়া উঠিল। লোহিয়ার গলাটি বড় মিষ্ট ছিল, হারমোনিয়মের গীতটি ঠিক প্রায় লোহিয়ার স্বরের মত হইয়া উঠিল। এবার লোহিয়ার প্রাণে প্রেমের ঝড় বহিল, সে আর আত্ম সংবরণ করিতে পারিল না। হস্তের সযত্ন রক্ষিত মালাটি গলে পরিয়া দেশ কাল পাত্র জ্ঞান রহিত হইয়া করতালি প্রদান পূর্ব্বক সুরে সুর মিলাইয়া গাহিয়া উঠিল 'কতদিন জাগি মু রহবি রে তোর লাগি।' সে স্বরে মোহিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নিকুঞ্জ যন্ত্র সঞ্চালন করিলেন, নির্জ্জীব যন্ত্রকণ্ঠ সজীব রমণীকণ্ঠে মিলিত হইয়া অমৃতের নদী সৃষ্টি করিল, সে অমৃতে নিকুঞ্জের প্রাণ মোহিত হইল, লোহিয়া ডুবিয়া গেল, প্রকৃতি সে স্বর্গীয়ামৃত ধারায় স্নাতা হইয়া পূতভাব ধারণ করিল। কিন্তু হায়, সে নদীর স্রোতে সাঁওতালের সৎসঙ্কল্প ভাসিয়া গেল, সে অমৃতের নদীতে লোহিয়ার কণ্ঠ কালকূট সৃষ্টি করিল, লোহিয়ার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া সাঁওতালদিগের ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল, তাহারা একযোগে ৪।৫ জন হাঁ হাঁ করিয়া উত্তোলিত দাত্র হস্তে তথায় ছুটিয়া আসিল, নিকুঞ্জ চমকিয়া উঠিলেন, কোল হইতে হারমোনিয়ম পড়িয়া গেল, লোহিয়া চমকিয়া উঠিয়া 'মেরোনা, ওকে মেরোনা' বলিয়া দুই হস্তে সে নির্জ্জীব যন্ত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, হটাৎ বাধা পাইয়া সাঁওতালদের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইল, লোহিয়া তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় চিত্তোন্মাদকারী প্রণয়ী যন্ত্রস্পর্শে পুলক রোমাঞ্চিতা হইয়া উঠিল, আরও বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া প্রাণের উল্লাসে বিপদ-বিবেচনা শূন্য হইয়া গাহিল 'মিলল লো মেরি পিয়া বহুকাল পর' বায়ু চালক ভস্ত্রায় কোনরূপে আঘাত লাগিয়া, বক্ষস্থ হারমোনিয়মও একযোগে ৪।৫

সুরে যেন লোহিয়ার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। ক্রোধোন্মত্ত সাঁওতাল উত্তোলিত দাত্র লোহিয়ার পৃষ্ঠদেশে সজোরে বসাইয়া দিল, নিকুঞ্জ 'খুন খুন' বলিয়া চিৎকার করিয়া স্বহস্ত ধৃত রিভল্‌ভারে আওয়াজ করিলেন, সাঁওতালের হাতে গুলি লাগিয়া দা পড়িয়া গেল; পশ্চাতের একজনও সেই সময় লোহিয়াকে আঘাত করিতেছিল, বন্দুকের শব্দে আঘাত করিয়াই সে অন্যান্য দলসহ পলায়নপর হইল। .. ইতিমধ্যে রাজধানী প্রেরিত ১২ জন অশ্বারোহী সসজ্জ অবস্থায় পৌঁছিল এবং পলায়নপর সাঁওতালদিগকে অবিলম্বে গ্রেফ্‌তার করিল।

লোহিয়া আহতা হইয়াও গাহিতেছিল 'মিলল গো মেরি পিয়া'; রক্তে নদী বহিতেছিল, কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে নিকুঞ্জ বাতি লইয়া উপস্থিত হইলেন, কি দেখিলেন? মরণের পথে অগ্রসর, ম্লানমুখী লোহিয়া রক্ত নদীতে স্নান করিয়া হারমোনিয়ম বুকে করিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া আছে, নিকুঞ্জ আলো লইয়া সম্মুখে গেলেন, দেখিলেন মুখ দিয়াও রক্ত বমন হইতেছে; নিকুঞ্জ উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন 'লোহিয়া'। লোহিয়া চক্ষু ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিয়া নিকুঞ্জের মুখের দিকে চাহিল, কথা সরিল না, একবার নিকুঞ্জের মুখের দিকে আরবার বক্ষস্থ হারমোনিয়মের দিকে চাহিয়া ম্লান-হাসি হাসিল, তারপর জন্মের মত নয়ন মুদ্রিত করিল। গলার মালাটি হারমোনিয়মের সজোর চাপে তাহার গায় লাগিয়া গিয়াছিল। নিকুঞ্জ সেই দিনই সর্ব্বসমেত সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

সাঁওতালগণ মধ্যে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; হত্যাকারীদের রাজদরবারে বিচার হইল, ইংরাজগবর্ণমেণ্টের লোক বিচার করিলেন। শাস্তিও হইল। ক্রমে বিদ্রোহ থামিয়া গেল, দেশে শান্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু জাঙ্গালবাণ্ড্‌ গ্রামে শান্তি রহিল না, বাঙ্গলায় রাত্রে লোহিয়া গান করে আর বাজনা বাজায়, এই জনরব সর্ব্বত্র। ভূতভীত সাঁওতাল সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেল, জঙ্গল বসতি আবার জঙ্গল হইল।

আর শান্তি রহিল না নিকুঞ্জের মনে। প্রতি রজনীতেই তিনি যেন লোহিয়ার গীতধ্বনি 'মিলল রে পিয়া' কি 'কতদিন রহবি' শুনিতেন, আর চমকিয়া উঠিতেন। লোহিয়ার রুধির রঞ্জিত হারমোনিয়মটি মাল্যসহ তিনি চিরকাল রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনে আর কখন হারমোনিয়ম স্পর্শ করেন নাই।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

সংবাদ।

ভারতেশ্বরীর প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌ বাহাদুরের আপদুদ্ধার বার্ত্তা অবগত হইয়া, বীরভূমস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমণ্ডলী সম্প্রতি স্থানীয় আনন্দ ভবনে সায়ংকালে সমবেত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আমেদ সাহেব বাহাদুর ঐ দিন বেলা ২টার সময় কাছারী বন্ধ করিয়াছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদাস সোভান বাহাদুরের প্রযত্নে ঐ দিন সান্ধ্য-সম্মিলনেরও আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে সমাগত দরিদ্রগণকে অর্থ, বস্ত্র ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইয়াছিল। আপামর সাধারণ সকলেই নগর সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়া সহর মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। বেল্লাগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় এতদুৎসবে ব্যয় জন্য ৩০্‌ টাকা দান করিয়াছিলেন।

বীরভূম লাভপুর থানার সমীপবর্ত্তী কুড়ুম্ব গ্রামের ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ গ্রামের আদায়কারী পঞ্চাইত, এবং ভূষণচন্দ্র দত্ত তাঁহার অধীনস্থ দফাদার বা সর্দ্দার চৌকীদার। ঐ গ্রামের অন্যতম প্রজা অবধৌত মিস্ত্রীর চৌকীদারী ট্যাক্স বাকী পড়ায়, পঞ্চাইতের হুকুম ক্রমে দফাদার মহাশয় অবধৌতের গৃহস্থিত বাসন পত্র ও অস্ত্রাদি ক্রোক করে। মিস্ত্রী বাসনগুলি ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু ব্যবসায়োপযোগী যন্ত্রগুলি ক্রোক করিতে দেয় নাই। এইজন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সমীপে তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৩৫৩ ধারানুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ডেপুটী বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের বিচারে অবধৌতের একমাস কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাস দণ্ড ও ৩৫্‌ টাকা অর্থ দণ্ড হয়। আসামী উক্ত হুকুমের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত সেসন জজ বাহাদুরের সমক্ষে আপীল করত ১৫্‌ টাকা মাত্র অর্থ দণ্ড দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছে।

বীরভূম হেতিয়া গ্রামের নীলরতন রায় থামজোড়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন; ধূম পানার্থ, এমনি সজোরে তিনি হুঁকায় টান মারিতেন যে সময়ে সময়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহাকে ভূশয্যায়

শায়িত হইতে হইত। বিগত ১০ই বৈশাখ রবিবার প্রদোষকালে ধূমপানের পরিণামে তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইয়াছে।

নিজগুণেই হউক, আর জামাতার গুণেই হউক, অনেকানেক হিন্দুকুল পুঙ্গব আজকাল জামাতা ভবনে কন্যা প্রেরণে নিতান্তই পরাঙ্মুখ। নিজ সিউড়ী সহরের শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বীয় স্ত্রীর শরীরের ও সম্পত্তি রক্ষণের অভিভাবক নিযুক্ত হইবার প্রার্থনায়, স্বশ্বশুর যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে, জেলার জজ বাহাদুরের সমক্ষে এক আবেদন পত্র দাখিল করেন। জজ বাহাদুরের আদেশক্রমে, কন্যাও শিবিকারোহণে বিচারভবনে আনীতা হন; জজ বাহাদুর সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যানমধ্যস্থিতা আবৃতা কন্যার এজাহার গ্রহণ করেন; কন্যার একটী সন্তান গত ও একটী বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তিনি নাবালিকা। স্বামী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে যথোচিত প্রহার করায় তিনি স্বামী ভবনে থাকিতে অনিচ্ছুক; এই কারণে জজ বাহাদুরও তাঁহাকে পিতৃভবনে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন। জজ বাহাদুরের সৌজন্য সন্দর্শনে সকলেই তাঁহার ভূয়সি প্রশংসা করিতেছেন।

বীরভূম-পুরন্দরপুর গ্রামের শ্রীকৃষ্ণ দাস, চৌকীদারী-ট্যাক্স-আদায় করণ-কালে, জনৈক চৌকীদারকে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া স্থানীয় পুলিশে অভি-যুক্ত হইয়া, দণ্ডবিধির ৩৫৩ ধারানুসারে, বিচারার্থ প্রেরিত হয়। ডেপুটীবাবু জগর্দ্দুর্লভ বসাক বাহাদুরের বিচারে কৃষ্ণ ছয় সপ্তাহের জন্য কারারুদ্ধ হয়। অনন্তর সেশন-জজ বাহাদুরের সমীপে আপীল করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ, নিরপরাধ সাব্যস্ত হওয়ায়, মুক্তি পাইয়াছে। বঙ্গবাসী।

সম্প্রতি বীরভূমের সমীপবর্ত্তী হুসেনাবাদ গ্রামের কল্যাণী বাউরিণী ঐ গ্রামের আকবরী বাউরিণীর বিরুদ্ধে স্থানীয় পুলীশে বাসন-চুরীর অভিযোগ উপস্থিত করে। পুলীশ তদন্ত করত মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট দেয়। অনন্ত মোকদ্দমার সত্যতা প্রমাণ জন্য, বাদিনীর উপর আদেশ হইল। বাদিনী তাহা সপ্রমাণ করিতে না পারায়, তদন্তকারী ডেপুটী মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরও মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট দেন। এবার, কল্যাণী কেন মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য, আদিষ্ট হয়; তাহার উপর নোটীস জারী হয়। কল্যাণী নিতান্ত দুঃখিনী; ধার্য্য দিনে উপস্থিত হইয়া, কারণ দর্শাইবার দরখাস্তে টিকিট দিতে না পারায়, আমলাগণ দরখাস্ত ফিরাইয়া দেন। অনন্তর মাজি-ষ্টর শ্রীযুক্ত আমেদ বাহাদুর নিজেই তাহাকে ডাকিয়া, বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন এবং সেই সাদা দরখাস্ত গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে দণ্ডবিধির ২১১ ধারার কঠোর বিধান হইতে অব্যাহতি দেন। বঙ্গবাসী।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ] আষাঢ়। [৯ম সংখ্যা।

বিজয়োৎসব।

মেফিকং উদ্ধার।

(১)

আজি আনন্দের দিনে এস ভ্রাতৃগণ,
গাইয়ে বিজয়গীতি প্রফুল্ল পরাণে
আনন্দ-সাগরে সবে হই নিমগন।
মনোল্লাস ভুঞ্জি হেন সুখময় দিনে।

(২)

এস সবে মিলে আজ, অতীব যতনে
সাজায়ে বিপণি-শ্রেণী, রাজপথচয়,
স্থাপিয়ে পতাকা-রাজি, আলোক প্রদানে
জগৎ সমক্ষে খুলি প্রফুল্ল হৃদয়।

(৩)

অবরুদ্ধ মেফিকিং হয়েছে উদ্ধার,
বৃটিশ-কেশরী আজি লভিছেন জয়,
পর্য্যুদস্ত হইয়াছে অসভ্য বুয়ার;
খরনদী স্রোতশীলা কত দিন বয়?

(৪)

ভাইরে, আনন্দ-বারি বাড়ি অনিবার
উথলি হৃদয় আজ শরীর ভাসায়;
ভাইরে, পরাণ আজ মিলাইয়ে তার
ব্রিটিশের জয়-গীতি ফুল্ল প্রাণে গায়।

(৫)
গাও গাও, গাও আজি, গাও সবে মেলি
বৃটিশ বিজয়-গীতি পরাণ ভরিয়ে,
দাও দাও, দাও সবে, দাও করতালি,
আনন্দ আজিরে আর না ধরে হৃদয়ে।

(৬)
এস এস ভ্রাতৃগণ, সবে সমস্বরে
ভক্তিভরে করজোড়ে সর্ব্বশক্তিমানে
মাগি প্রাণ পূরে বৃটিশের জয় তরে—
ত্বরা যেন হয়ে জয়ী লভে রাজ্যধনে।

(৭)
এস সবে মিলে আজি শান্তির কারণে
অশান্তি বারণে ডাকি, খুলি প্রাণমন,
এ বিশাল ভবরাজ্যে বল তিনি বিনে
কে পারে করিতে পুনঃ শান্তি সংস্থাপন ?

(৮)
এই যে বিগ্রহ-বহ্নি দেখিবারে পাই,
দক্ষিণ আফ্রিকাভূমে বৃটিশ-বুয়ারে
বুয়ার পতঙ্গ শেষে হইলেও ছাই
তিনি বিনা নিবাইতে আর কেবা পারে ?

(৯)
তাই আজ এস সবে, খুলি প্রাণমন,
বৃটিশ বিজয় তরে মাগি বিভু ঠাঁই,
অবশ্যই ত্বরা দূরিবেন এ বেদন,
কামনা পূরাতে তিনি বিনে কেহ নাই।

(১০)
গাও গাও, গাও আজি, গাও সবে মেলি
বৃটিশ বিজয় গীতি পরাণ পূরিয়ে,
ঘন ঘন ঘন সবে দিয়ে করতালি
মাগ বিভু ঠাঁই জয়, ভক্তি পূর্ণ হিয়ে।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক।
বীরভূম জেলাস্কুল।

প্রবাদ প্রসঙ্গ।

"যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়ে দেখ তাই,
পাইলে পাইতে পার
লুক্কায়িত রতনে।"

কথাটা ঠিক। চেষ্টা করিলে, হয়ত সামান্য মাত্র কারণ হইতেও আমরা আশাতিরিক্ত ফললাভ করিতে পারি। এই নিমিত্ত অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে কিছুই উপেক্ষনীয় নহে।

আমাদের উদ্দেশ্য, সঙ্কল্পিত "বীরভূমির ইতিবৃত্তের" যথাসম্ভব উপকরণ সংগ্রহ করা। যখন পুরাবৃত্ত কথামালা গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষিত হয় নাই, তখন আমাদিগকে সেই সমুদয়ের প্রকৃত বিবরণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে অবগত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতে হইলেও নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। পাঠকগণ সে সকলের পরিচয় ক্রমশঃ অবগত হইবেন।

প্রবাদ, প্রবচন, ছড়া প্রভৃতি বংশপরম্পরায় লোকমুখে সুরক্ষিত হইয়া স্মরণীয় বিষয়ের বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতিটুকু আজিও আমাদের হৃদয়ে উজ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

বর্ণিত বিষয়ের আনুসঙ্গিক ব্যাপার আদৌ বিবৃত না রহিলেও অথবা অতিরঞ্জিতভাবে চিত্রিত থাকিলেও, মূল বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বড় সন্দিহান হইতে হয় না। ইহাও কি ঐতিহাসিক হিসাবে পরম লাভের কথা নহে ?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে, জনসাধারণের অপরিচিত স্থানীয় কবি, গ্রন্থকার, পণ্ডিত, মহাজন ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী মহোদয়গণ সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে প্রবাদ অথবা প্রবচন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে যত্নপর হইব। এবং ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণের গুরুভার মূল "ইতিবৃত্ত" প্রবন্ধের উপর ন্যস্ত করিয়া, সুযোগ-ক্রমে সংক্ষেপে দুই এক কথা মাত্র বলিতে প্রয়াস পাইব। অগ্রে ভস্মরাশি সংগৃহীত হউক, পরে তাহা হইতে লুক্কায়িত ঐতিহাসিক রত্ন 'পাইবার' সবিশেষ চেষ্টা করা যাইবে।

কোন বিষয়ে একাধিক প্রকার প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে সংক্ষেপে সে গুলির উল্লেখ করিতে বিরত থাকিব না। তবে এ বিষয়ে সাধারণের উপযুক্ত

সহায়তা আবশ্যক করে। কিন্তু তাহা দুষ্প্রাপ্য হইলেও এ আকাঙ্ক্ষা এখনও একবারে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। *

লেখক।
শ্রীশিবরতন মিত্র।
সিউড়ী—বীরভূম।

১। বিরূপাক্ষ গোস্বামী।

কালাপাহাড়ের কাটা,
বিরূপাক্ষের ফাটা।

এতদঞ্চলে প্রচলিত এই প্রবাদবাক্যটি এখনও আমাদিগকে বিরূপাক্ষের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। বিরূপাক্ষ গোস্বামী তন্ত্রমতে মহা সাধক ছিলেন। তাঁহার কথা, একদিন বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অধিকাংশ স্থলেই আলোচিত হইত। শুনিতে পাই, তন্ত্রশাস্ত্রেও তাঁহার নামোল্লেখ আছে; যথা—

'অবতারে শঙ্করোঽহং বিরূপাক্ষ স্তথৈবচ'

এবং তিনি তন্ত্রবিষয়ক কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। † ?

উপকথা। বিরূপাক্ষ 'তিলঘট' 'যবঘট' তপস্যানন্তর নায়িকা দর্শন লাভ করেন। কিন্তু স্বয়ং ভগবতীর কৃপালাভে বঞ্চিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, নায়িকা, তাঁহার মন্ত্রোক্ত শ্লোকের অশুদ্ধতার কথা প্রকাশ করেন। মন্ত্রের অশুদ্ধতা অসিদ্ধির হেতু, এ কথা বিরূপাক্ষ কিন্তু কোন মতেই স্বীকার করেন না, কারণ অক্ষরই ব্রহ্ম এবং সেই নিমিত্ত যে কোন অক্ষরগ্রথিত মন্ত্রদ্বারা সাধনা লাভ করিতে পারা যায়। নায়িকা এই ভুল মন্ত্র বিল্বপত্রে অঙ্কিত করিয়া ভগবতীকে প্রদান করেন। ভগবতী সামান্যমাত্র সংশোধন করিয়া স্বয়ং বিরূপাক্ষকে দর্শন দেন।

বিরূপাক্ষ যে 'আসনে' বসিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই আসন এখনও তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া কুলদেবতার ন্যায় নিত্য পূজাদি

* বীরভূম জজকোর্টের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমার ইতিবৃত্ত প্রবন্ধ সংকলন কার্য্যে বিশেষরূপ সহায়তা করিতেছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী রহিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধ ১-২ প্রবাদ ইনিই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

† লেখক তন্ত্রশাস্ত্রে একবারে অপ্রবিষ্ট; কথাটা সত্য কি না কেহ বলিয়া দিবেন কি?

লেখক।

প্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রস্তরাসনে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে। ব্রাহ্মণেতর জাতির তাহা শ্রবণ করিবার অধিকার নাই, এই নিমিত্ত খোদিত শ্লোকটি প্রকাশিত করিতে অক্ষম। এই আসনটি "আদ্যা যন্ত্র" নামে খ্যাত। প্রবাদ আছে, স্বয়ং ভগবতীকেও ভক্তের জন্য এই আসনটি বহন করিতে হইয়াছিল।

ভগবতী বিরূপাক্ষের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে, যে প্রতিমাতে প্রকৃত দেবতার অধিষ্ঠান না থাকিবে, তাহা তিনি প্রণাম করিবা মাত্র 'ফাটিয়া' যাইবে। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়াই ললাটোদ্ধৃত শ্লোকটি রচিত হইয়াছে—কালাপাহাড় যেমন বহুতর দেবমূর্ত্তি বিকৃত করিয়াছিলেন, বিরূপাক্ষ কর্ত্তৃক তেমনই অনেক দেবমূর্ত্তি বিকৃত হইয়াছিল।

বিরূপাক্ষ বলিতেন,

যত দেখ্‌লাম ক্ষেপার হাট,
বদে পাথর, জগা কাঠ।

অর্থাৎ শ্রীশ্রী৺ বৈদ্যনাথ দেব ও শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের প্রতিমূর্ত্তিতেই প্রকৃত দেবতার অধিষ্ঠান আছে, অন্যত্র নহে।

বিরূপাক্ষের সহিত দেবীবর ঘটকের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা কেহ কেহ উল্লেখ করেন। কিন্তু দেবীবর চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি, ন্যূনাধিক চারি শত বৎসর পূর্ব্বকার কথা। কিন্তু বিরূপাক্ষের যে বংশতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে তাঁহাকে অতদিনের পুরাতন লোক বোধ হয় না।

ইহারা বলেন যে দেবীবরই নায়িকাসিদ্ধ ছিলেন এবং বিরূপাক্ষের সহিত ভগবতীর সাক্ষাৎ করাইবার জন্য প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু দেবীবর যাঁহাকে ভগবতী জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিরূপাক্ষ অষ্টমদ্বারের নায়িকা বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বিরূপাক্ষ তখন পর্য্যন্ত নিজে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তজ্জন্য ভগবতীর নিকট বিল্বপত্রে লিপি প্রেরণ করিয়া অসিদ্ধির হেতু অবগত হইবার প্রার্থনা করেন। জয়া প্রতি-লিপিতে তাহার মন্ত্রের অশুদ্ধতার কথা অবগত করান। বিরূপাক্ষ সদর্পে তাহা পদতলে নিক্ষেপ করিয়া দেন এবং ভুল মন্ত্রেই সিদ্ধি লাভ করেন।

কেহ কেহ বলেন যে, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে বিরূপাক্ষের আর একটি আসন রক্ষিত আছে।*

* কিন্তু মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে 'কিরীটেশ্বরী প্রবন্ধে ইহার কোন উল্লেখ দেখিলাম না।

পরিচয়।—বিরূপাক্ষের পূর্ব্ব নিবাস কাটোয়ার সন্নিকট বামনকোন্দা গ্রামে। তিনি সিউড়ীর দুই মাইল দক্ষিণ জামল গ্রাম নিবাসী কোন ব্রাহ্মণ শিষ্য কর্ত্তৃক আনীত হইয়া অদূরস্থিত সিঙ্গুরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। গোত্র ভরদ্বাজ, গাঁই সমুদ্রগোল এবং উপাধি গোস্বামী; কিন্তু ইহার বংশধরেরা বর্ত্তমান ব্যবসানুসারে ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত।

বিরূপাক্ষের পূর্ব্বপুরুষগণের বংশতালিকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইঁহার বংশধর সিঙ্গুর গ্রাম নিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত মদনগোপাল বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই বংশ তালিকাটী আমায় প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

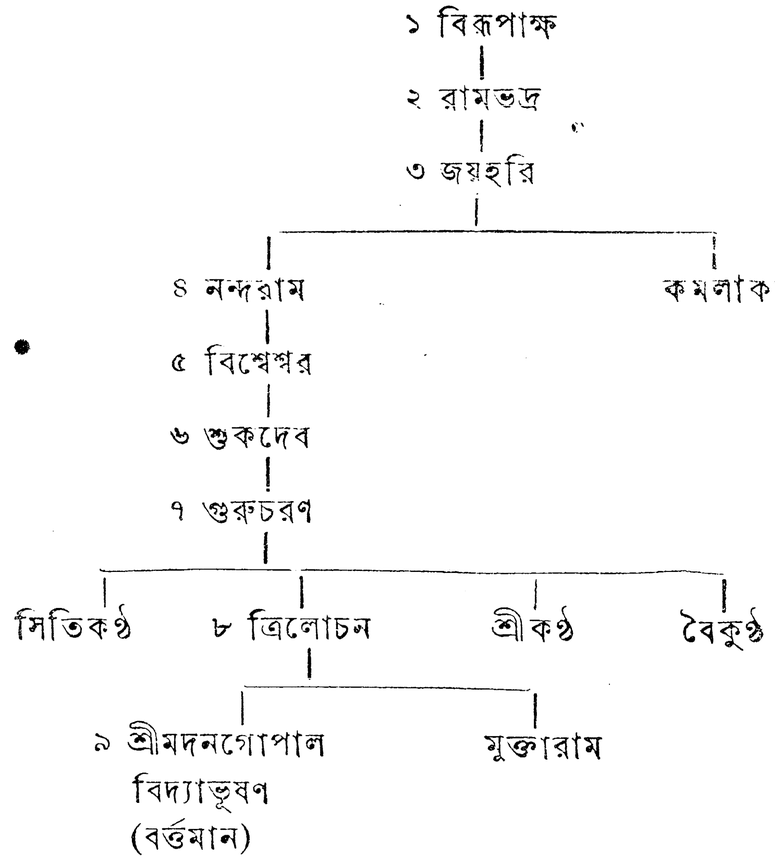

শুনিতে পাই, বিরূপাক্ষের পুত্র রামভদ্র বিরচিত একখানি সত্যনারায়ণের পাচালি প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, রামভদ্রই প্রথমে সিঙ্গুরে বাস স্থাপন করেন।

২। কেদার রায়।

রেতের ঠাকুর কেদার রায়।
রেতে আসে, রেতেই যায়॥

বীরভূমের অন্তর্গত মহম্মদ বাজারের দুই মাইল পূর্ব্বে অঙ্গার গ'ড়ে নামক গ্রামের নিকট বিস্তৃত ময়দানে কেদারের আবাসভূমি ছিল।

তাঁহার গৃহভিত্তির চিহ্ন দর্শন করিয়াছেন, এমন দুই একজন বৃদ্ধ বর্ত্তমান আছেন; চেষ্টা করিলে এখন ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বকালে এই বিস্তৃত ময়দানে বহু লোকের বাস ছিল। হলকর্ষণ করিবার সময় শাল বনাত প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা গলিত প্রায়। চুন্নী প্রভৃতিও পাওয়া যায়। বিস্তৃত ময়দানে যে জলাশয় আছে, তাহা লোকে কেদারের খিড়কীর ও বৈটকখানার পুকুর বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কেদারের কুলদেবী ছিন্নমস্তার প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী এখনও বর্ত্তমান আছে; স্থানটি অতি মনোরম হইলেও ভীতিব্যঞ্জক।

ব্রাহ্মণ কেদার রায়, মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে চাকুরী করিতেন তিনি স্বীয় আবাসভূমি আঙ্গারগড়ে গ্রাম হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত একটি বৃহৎ শরণি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও এতদঞ্চলে ও মুর্শিদাবাদে 'কেদার রায়ের শরাণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। রাজনগর হইতে গয়সুদ্দীন কর্ত্তৃক গৌড় পর্য্যন্ত যে সুবৃহৎ শরণি প্রস্তুত হইয়াছিল, কেদারের শরণি তাহা হইতে ঋজুভাগে বাহির হইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে। এই শরণির পার্শ্বে ক্রোশান্তর এক একটি পুষ্করিণী খনিত আছে। জনশ্রুতি এই যে, তাঁহার জননী গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার কালে এক একটি পুষ্করিণী 'প্রতিষ্ঠা' করিয়া পূতসলিলা জাহ্নবী-নীরে স্বকীয়া নশ্বর দেহ পবিত্র করিয়াছিলেন।

কেদারের বৃহদায়তন বাসভূমি এখন জনশূন্য প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে, লোকে এই প্রান্তরকে এক্ষণ 'কেদার রায়ের ডাঙ্গা' কহিয়া থাকে।

জনশ্রুতি এই যে, কেদার প্রত্যহ কর্ম্মস্থল মুর্শিদাবাদ হইতে সন্ধ্যা সমাগমে গৃহ প্রত্যাগমন করিতেন এবং রাত্রি শেষে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিতেন। দিবাভাগে তাহাকে কেহ বাটীতে দেখিতে পাইত না; এই নিমিত্ত তিনি "রেতের ঠাকুর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, তিনি দ্রুতগামী ঘোটকে যাতায়াত করিতেন। আবার তাহার 'গুটিকা সিদ্ধ' থাকার কথাও প্রচলিত আছে।

কেদারের বংশ এক্ষণ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত খাগড়ায় বর্ত্তমান আছে। বংশ পরিচয় বারান্তরে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশিবরতন মিত্র। সিউড়ী—বীরভূম।

মিলন আশায়।

তার তৃষিত নয়নে আশার ছবিটি
আঁকিয়া রেখেছে কে!
সেযে চটুল চঞ্চল নিমেষ পলকে
ওই বুঝি এল সে।
দ্রুত পবন স্বননে আঁখি হতে আশা
পথ পানে যায় ছুটে
হায় ভগ্ন দীর্ঘ শ্বাস ছোট হৃদি খানি
মরম সহিত টুটে।
পুনঃ তরঙ্গ নূতন নূতন জীবন
আঁখিতে নূতন উঠে।
কত আশার কলিকা আধ ফোটা হয়ে
হৃদয় সরসে ফুটে।
তার আঁখি জ্যোছনায় শারদ চন্দ্রিমা
মলিন হইয়া যায়।
দেখি নধর অধর চাপিয়া রাখিতে
দ্বিগুণ ফুটায় তায়।
ছোট হৃদি খানি তার কিজানি কি লাগি
কাঁপিয়া উঠিছে মুহু।
হৃদে আশা কুহকীর আনন্দ-লহরী
আঘাত করিছে বহু।
সেযে সুখের অশান্তি সাগরে পড়িয়া
হয়েছে আপন হারা।
তাই কি করিতে গিয়া গিয়াছে ভুলিয়া
উন্মনা পাগল পারা।
যত লাজ আবরণে চাহিছে ঘিরিতে
আশার তরঙ্গ লীলা

তত পড়িছে ছড়ায়ে বাতাসের গায়
প্রেমানন্দ বীচি-মালা।
গেছে মরমে মরিয়া কোথায় গোপনে
রাখিবে আপন দেহ
সুধু দেখিবে আপনি আবেগ লহরী
দেখিবেনা আর কেহ।

*　　　*　　　*

কত অতীত স্মিরিতি সঞ্জাত কুসুমে
মালা গেঁথে রাখে তুলি।
কত আঁখিজল আনিছে খুজিয়ে
চরণ ধোয়াবে বলি।
সেযে স্নেহপক্ক কত তরল ভাষার
শ্রুতি-মধুকরী বাণী।
চুপে মানস ভাণ্ডারে করিছে সঞ্চয়
আশার কুহক শুনি।
কত শারদ যামিনী দিতেছে কাটায়ে
অজ্ঞানে অনিদ্রা কোলে
কত আরক্ত কপোল লাজ নত আঁখি
ভাবিছে স্বপন ভুলে।
কাণে মধুমাখা বাণী প্রেম প্রতিদান
স্নেহাদর প্রেমময়,
সদা উঠিছে বাজিয়া বরষিছে মধু
মত্তকরী কল্পনায়।
মনে অযাচিত কত কবোষ্ণ চুম্বন,
প্রাণস্পর্শী আলিঙ্গন,
কত লক্ষ্যহীন কথা, অহেতুকী হাসি
অকথিত আকিঞ্চন,
কত অকারণ মান, অপাঙ্গ ঈক্ষণ
নীরবতা ছলকরা
কত কপট কোপের বিবর্ত্তিত মুখ,
মান ভাঙ্গা পায় ধরা।

ওগো সন্তান বাহিনী কল্পনার নদী
সবেগে হৃদয়ে পশে,
তার সারা অতীতের বিরহ স্মিরিতি
তাহাতে ভাসিয়া আসে।
তাহা কুড়ায়ে যতনে রাখিছে তুলিয়া
নিভৃত মরম দেশে,
কেন এত আয়োজন স্বপন প্রয়াণ ?
তাহারি মিলন আশে।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

হতে অ।

অন্ধের অঙ্ক শিক্ষা

দি ২

অন্ধদিগকে নানা উপায়ে অঙ্ক শিখান যাইতে চীনদেশে অঙ্ক কষিবার এক প্রকার বাক্স আছে। বাক্সটির ডালা খোলা; খোলা স্থানে শ্রেণীভাবে কতকগুলি কাটি আঁটা আছে। উক্ত কাটির ভিতর কাষ্ঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল সংযুক্ত আছে। এই বলগুলিই তাঁহাদের ১,২,৩, প্রভৃতি অঙ্ক চিহ্ন লেখা প্রকাশ করে। কিন্তু ইহারা বল বা কাষ্ঠ গোলকগুলির প্রকার ভেদ রাখে নাই। এজন্য ইহাঁদের স্মৃতির কার্য্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে করিতে হয়। অর্থাৎ উক্ত বলের সাহায্যে উহাদের "সাট" রাখিতে হয়। মনে করুন, একটা বল "১" দুইটা বল "২" এইরূপে উহারা দশটা বলকে "১০" করিয়া, প্রকৃত "১০" রাখিবার সময় উপর কাটিতে একটী বল সরাইয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখিলেই উক্ত একটা বলের দ্বারাই "১০" লেখা হইয়া গেল, এজন্য "দশটা বল" রাখিতে হয় না।

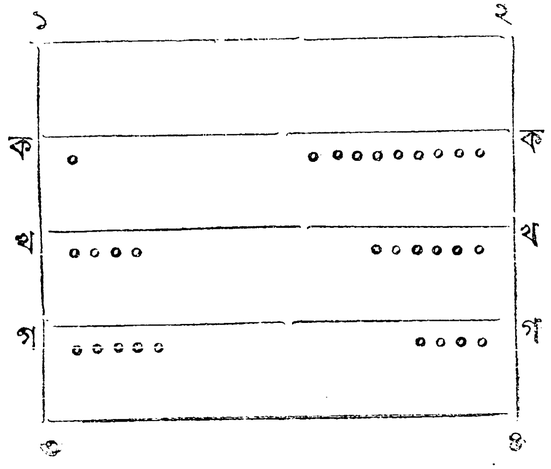

১, ২, ৩, ৪ এই চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটা বাক্স। "ক" "ক" চিহ্নিত একটি কাটি উহাতে আট্‌কান হইয়াছে। উক্ত কাটির একদিকে নয়টা শূন্য যাহা দেখান হইয়াছে, উহা "৯" বল বা কাষ্ঠগোলক জানিতে হইবে। এবং এই লাইনটি "এক শত হইতে হাজার" অঙ্ক লিখিবার ঘর। উক্ত লাইনের একটি বল স্বতন্ত্র রাখিলে (যেমন চিত্রে রাখা হইয়াছে) "১০০" শত বুঝায়। ঐরূপ দশটা বলকেই বাঁ ধারে টানিয়া দিলে "হাজার" লেখা হইয়া যায়। দুইটাকে দিলে "২০০" শত বুঝায়। তিনটাকে দিলে "৩০০'' বুঝায়। এইরূপ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এবং ১০, টাকে দিলে ক্রমান্বয়ে "৪০০" "৫০০" "৬০০" "৭০০" "৮০০" "৯০০" এবং "১০০০" বুঝাইয়া থাকে। উহার নিম্নেই "খ" "খ" চিহ্নিত দ্বিতীয় কাটি। উক্ত লাইনেও দশটি বল আছে। এই লাইনের একটি বল সরাইলে, "১০" লেখা হইয়া যায়। অতএব এই লাইনের বলের দ্বারা "১০" হইতে "১০০" পর্য্যন্ত লেখা যায়। এই লাইনের একটা বল সরাইয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখিলে যেমন ১০ হয়; সেইরূপ ২ টা সরাইলে ২০ হয়; ৩টা সরাইলে ৩০ হয়, এইরূপ যথাক্রমে ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এবং ১০ সরাইলে, ক্রমান্বয়ে ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০,এবং ১০০ লেখা হইয়া থাকে। তৎপরে কতকগুলি শত লিখিতে গেলেই উহার উপরের লাইনের বল সরাইতে হয়।

তৎপরে "গ" "গ" চিহ্নিত কাটিতে "দশটা" বল আছে। উহা দ্বারা আমাদের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ উহার একটা বল সরাইলে ১ হয়, ২ টা সরাইলে ২ হয়। এইরূপ দশটা সরাইলে দশ হয়।

"গ" চিহ্নিত লাইনে আমরা ৫টা সরাইয়াছি, অতএব উহা ৫ পাঁচ হইয়াছে। তৎপরে, "ক" চিহ্নিত শতের ঘরে ১টা সরান আছে; অতএব উহা "এক শত" তাহার পর দশকের ঘরে ৪টা সরান আছে, অতএব উহা ৪+১০=৪০ চল্লিশ হইয়াছে। এইবার ঠিক দিউন ১ শত ৪০ এবং ৫=৪৫, মোট ১৪৫ তিন লাইনের যোগফল।

আচ্ছা, যদি বলা যায়, ১৪৫ এবং ২১০ একত্রে কত হইবে ? তাহা হইলে উহারা কি করিবে জানেন ? অগ্রে ১৪৫, অঙ্ক বল বা ঘুটি সরাইয়া রাখিবে। যেমন পূর্ব্বে আমরা লাইন অনুসারে রাখিয়াছি, উহা দেখিবেন বা এখানে একটু নূতন ভাবে রাখিয়া দিতেছি। আপনারা লাইন অনুসারে ধরিয়া লইবেন। আমাদের যেমন একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত এবং

কোটি প্রভৃতি শ্রেণীভাবে লেখা হয়, উহারা তেমনি লাইনের কাটির গাত্রে বল রাখিয়া অঙ্ক রাখিবার শ্রেণী বিভাগ করিয়া লয়। প্রথম শিক্ষার্থীদের অবশ্য জটিল বোধ হইবে, (কোন্ বিষয় প্রথম শিখিবার সময় জটিল বোধ না হয়? তৎপরে ঐ ঘুটি চালা দ্বারা এমন সুন্দর অভ্যাস হয় যে, কোন অঙ্ক আমরা কাগজে কলমে অথবা শ্লেট পেনসিল দ্বারা যত শীঘ্র কষিতে পারি, উহারা ঐ বল দ্বারা তত শীঘ্র কষিতে পারে। এখানে ১৪৫, উহাদের নিয়মে রাখা হইল,—

	(বাঁয়ে।)	(ডাইনে।)
শতর ঘর	০	০০০০০০০০০
দশকের ঘর	০০০০	০০০০০০
এককের ঘর	০০০০০	০০০০০

বাঁয়ের অঙ্কর "বল" রাখাই ধর্ত্তব্য। উক্ত ১৪৫ সঙ্গে ২১০ যোগ করিতে বলা হইয়াছে। অতএব দুই শতের "দুই" গোলা শতকের ঘরে সরাইয়া দাও। তৎপরে দুই শত দশের দুই শত গেলে, বাকী রহিল "এক দশ" অতএব দশকের ঘরে এক বল বা ০ এক শূন্য সরাইয়া দাও। দশকের ঘরে আছে "০০০০" চারি শূন্যে ৪ দশ বা ৪০ চল্লিশ, উহাতে আর এক শূন্য ০ বা বল সরাইয়া দিলে "০০০০০" পাঁচ দশ বা পঞ্চাশ হইল। ২১০, বলা হইয়াছে, অতএব এককের ঘরে আর অঙ্ক রাখিবার জন্য অবশিষ্ট নাই। কাজেই এককের ঘরে পাঁচ একক বা ৫ রহিয়া গিয়া ঠিক দিয়া হইল,—

শত	০০০	০০০০০০০
দশ	০০০০০	০০০০০
এক	০০০০০	০০০০০

অর্থাৎ ৩৫৫ হইল। এইরূপে উহারা সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করিয়া যোগ দিয়া যায়। উহাদের বিয়োগ কষিবার নিয়ম সুন্দর। নিম্নে দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

প্রশ্ন আঠার হইতে দশ গেল বাকী রহিল কয়? প্রথম ১৮ রাখা হইতেছে, যথা এক দশক এবং আট এক্ক।

	বামদিক	দক্ষিণ দিক
দশক	০	০০০০০০০০০
এক্ক	০০০০০০০০	০০

এই আঠার হইতে দশক বা দশ বাদ দিতে হইলে, দশকের ঘরের বলটি সরাইয়া দক্ষিণ দিকে রাখা হইল। তাহা হইলে উত্তরে কেবল আট এক্ক দাঁড়াইল, অতএব উত্তর ৮ আট।

আচ্ছা, ৬৫২৩, হইতে ৪৮২১, বাদ গেলে কত বাকী থাকে?

সহস্রের ঘরে	০০০০০০	০০০০
শতের „	০০০০০	০০০০০
দশকের „	০০	০০০০০০০০
এককের „	০০০	

ইহা হইতে চারি হাজার আট শত একুশ বাদ যাইবে। অতএব ৪৮২১ উহাদের নিয়মে বলের দ্বারা রাখা হইল।

সহস্র ঘরে	০০০০	০০০০০০
শতের „	০০০০০০০০	০০
দশকের „	০০	০০০০০০০০
এককের „	০	০০০০০০০০০

এইবার বাদ দিয়া রাখিয়া যাউক, প্রথম এককের ঘরে এককের ঘরে বাদ দিয়া, পরে দশকের ঘরে দশকের ঘরে বাদ দিয়া, তৎপরে শতকের ঘরে শতকের ঘরে বাদ দিয়া, সর্ব্বশেষ সহস্রের ঘরে সহস্রের ঘরে বাদ দিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের যেমন এককের ঘর হইতে পর পর উচ্চ ঘর দিয়া বাদ কাটিয়া যাইতে হয়, উহাদের সেই নিয়ম। যাহা হউক, এক্ষণে ধরুন, প্রথম এককের ঘরে "০০০" শূন্য আছে, এবং দ্বিতীয় এককের ঘরে "এক" ০ হইতে বাদ যাইতেছে; অতএব "০০০" হইতে "০" বাদ দিলে "০০" দুই শূন্য থাকিল। তৎপরে দশকের দুইটি ঘরেই দুই ০০, দুই ০০ শূন্য আছে। অতএব দুই হইতে দুই বাদ গেলে কিছুই থাকে না। কাজেই দশকের ঘরে কোন বল বা গোলা রাখা হইল না। ফাঁকা রহিল। আমরা এ স্থানে দশকের ঘরে একটা ড্যাস "—" দিয়া রাখিলাম। এইবার ঊর্দ্ধ শতকের ঘরে "০০০০০" পাঁচটা এবং নিম্ন শতকের ঘরে "০০০০০০০০" আট্‌টা আছে। অতএব ৫ হইতে ৮ বাদ যায় না। কাজেই একটা হাজারের বল ভাঙ্গাইতে হইল। হাজারের বল ১টা বাম হইতে দক্ষিণ দিকে সরাইয়া দিয়া উহাকে দশ শত ০ ধরিয়া, তৎসঙ্গে ০০০০০ শূন্যে পাঁচ শত এবং হাজার বল ভাঙ্গানি দশ শত মোট ১৫ শত হইতে এইবার "০০০০০০০০" আট শূন্য আট শত

বাদ গিয়া অবশিষ্ট রহিল, ৭ সাত "০০০০০০০" শূন্য। তৎপরে হাজারের ঘরে ৬টা বল অর্থাৎ ছয় হাজার ছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে উহা হইতে এক বল সরান হইয়াছে, কাজেই এখন হাজারের ঘরে "০০০০০" পাঁচ শূন্য বা পাঁচ বল আছে। অতএব পাঁচ শত হইতে অপর হাজারের ঘরের ৪ বাদ গেল, কাজেই বাকী রহিল "০" এক শূন্য বা এক হাজার। মোট বিয়োগের উত্তর এই রাখা হইয়াছে।

সহস্র	০	০০০০০০০০০
শত	০০০০০০০	০০০
দশ	———	০০০০০০০০০০
এক	০০	

অর্থাৎ ১৭০২ অবশিষ্ট রহিল। এইরূপে উহারা গুণ ভাগ ইত্যাদি সমুদয় অঙ্ক কসিয়া থাকে। এবং লাইনের হিসাব রাখিয়া উহা দ্বারা, সিকি, আনা এবং পয়সা, কড়া, ক্রান্তি পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া লয়। এই সংকেত দ্বারা চক্ষুষ্মান বালক এবং অন্ধ বালক উভয়ে এক স্থানে বসিয়া অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। কারণ যাহার চক্ষু আছে, সে ইহা দেখিয়া বল নাড়াইবে, অন্ধ বালক চক্ষুর কার্য্য হস্তাঙ্গুলির সাহায্যে হাঁৎড়াইয়া করিতে অভ্যাস করিবে।

অনেক বাঙ্গালা স্কুলে দেখিয়াছি, বোর্ডের মত করিয়া কাষ্ঠবলের মালা সাজাইয়া, উহা দ্বারা ছোট ছোট বালকদিগকে গণনা শিক্ষা দেওয়া হয়। এইবার ঐ সকল বলের সাহায্যে অন্ধ বালকদিগকে অঙ্ক কসান শিক্ষা দেওয়া যাইবে। অথবা কতকগুলি মারবেল বা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক খণ্ড বা শিলাখণ্ড অথবা তেঁতুল বিচি, অথবা কড়ি দিয়া অন্ধদিগকে অঙ্ক কসান শিক্ষা দেওয়া যায়। উহার সংকেত পূর্ব্বোক্তভাবে। উদাহরণ যথা,—

আমরা যেমন ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ইত্যাদি অঙ্ক লিখিয়া থাকি; অন্ধেরা ঐ লেখার কার্য্য কড়ি ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের দ্বারা সম্পন্ন করিবে। পাঠশালে একদিকে চক্ষুষ্মান বালক বালিকা যেমন শ্লেট্ পেনসিল দিয়া অঙ্ক কষিতে বসিবে, তাহাদের পার্শ্বেই অন্ধ বালক বালিকা কাপড়ে কড়ি লইয়া অঙ্ক শিক্ষার জন্য বসিতে পারিবে। আমরা যেমন, ১৩ তের লিখিতে হইলে, প্রথম একটা 'এক' তৎপরে একটা 'তিন' লিখিয়া থাকি, অন্ধেরাও তেমনি "তের' বুঝিতে হইলে, প্রথম মাটিতে এক স্থানে একটা 'এক

কড়া কড়ি' রাখিবে, তৎপরে উহার একটু পার্শ্বে তিনের জন্য 'তিন কড়া কড়ি' রাখিবে। তৎপরে হস্ত বুলাইয়া উহা উপলব্ধি করিবে।

মনে করুন, কোন অন্ধ বালককে বলা হইল, 'তের,' 'আটাশ' এবং 'ষোল' যোগ দিয়া কত হইবে? সে প্রথম 'তের' রাখিবার জন্য কড়ি গুলি এইরূপে রাখিলে (নিম্নে 'o' শূন্য গুলি দ্বারা কড়ি বা তাদৃশ কোন বস্তু বুঝিতে হইবে।)

(বাম)	(দক্ষিণ)
o	ooo

অন্ধ বালক প্রশ্ন করিল, তের রাখিয়াছি তারপর?

"তৎপরে ২৮ রাখ।"

উত্তর 'আচ্ছা' oo oooo oooo ২৮ রাখিয়াছি; তারপর?

'তারপর ১৬ রাখ।"

'আচ্ছা' o ooo ooo ১৬ রাখা হইল, এইবার ঠিক দিব বলিয়া, সে দক্ষিণ দিক হইতে পর পর থাকা গুলি হস্ত বুলাইয়া, প্রত্যেক থাকায় ক'কড়া কড়ি আছে, তাহা গুণিয়া ঠিক দিতে আরম্ভ করিল। একটা বুদ্ধিমান অন্ধ বালক দেখি যে, সে দক্ষিণদিকের 'থাকা' গুলি পর পর কোন্ থাকায় ক'কড়া হিসাব না রাখিয়া থাকার শেষ ঠিকে যে ক' কড়া বসে, তাহা বসাইয়া তৎপরে বামদিকের থাকাটি গুণিয়া ঠিক দিয়া বলিল '৫৭ সাতান্ন হইয়াছে।"

প্রশ্ন রাখ,

এক হাজার তিন শত তেইস।

তৎপরে, দুই „ ছয় „ কুড়ি।

„ তিন „ চারি „ বাইশ।

অন্ধ বালক কড়ি মাটিতে এই ভাবে সাজাইয়া গেল,—

সহস্র	শত	দশক	একক,
o	ooo	oo	ooo
oo	ooo ooo	oo	—
oo o	oo oo	oo	oo
ooo ooo	oo o	ooo ooo	ooo oo

ঠিক দিল "এককের" ঘর হইতে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় "সহস্রের" ঘরের যোগফলে ক' কড়া কড়ি আছে, তাহা হাৎড়াইয়া শুনিল, বুঝিল ৬ কড়া বলিল '৬ সহস্র' শতের ঘরে তিনকড়া অতএব 'তিন-শত" দশকের ঘরে ছয় শূন্য, অতএব উহা ৬ কড়ায় ছয় দশ অর্থাৎ ৬০ ষাটি। তৎপরে ৫ একক, অতএব ৬০ + ৫ = ৬৫ হইল।

উত্তর "৬৩৬৫" হইয়াছে।

এইরূপ সঙ্কেতে উহাদের সমুদয় অঙ্ক কসান চলে। এবং আনা পয়সার জন্য অন্য ভাবের কোন বস্তু যথা তেঁতুল বিচি হইল আনা, কুরুই বা নুড়ি বা প্রস্তর খণ্ড হইল পয়সা রাখিবার সংঙ্কেত, কড়ি হইল, টাকার সংঙ্কেত। এইরূপ ভাবে উহাদের অঙ্ক কসাইতে শিখাইলে, অন্ধদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইতে পরিবে। এবং আপিসের হিস্নাব দোহারা করিবার জন্য ইহাদের আপিসে কর্ম্ম হইলেও হইতে পারিবে। রীতিমত শিক্ষা পাইলে, ইহারা 'অন্ধ বিদ্যালয়' করিয়া, টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। চোখ'-ওলা বিদ্যালয় অপেক্ষা 'অন্ধ বিদ্যালয়' এদেশে অনেক বেশি হওয়াই সম্ভব কারণ এ দেশের ক'টা লোকের চক্ষু আছে?

অন্ধদের জন্য স্বতন্ত্র অক্ষরের পুস্তক হইবে, সেই পুস্তক উহারা পাঠ করিবে। "গীতা" খানা অন্ধদের অক্ষরে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে, উহারা তাহা পাঠ করিয়া, কত হরিসভা, ব্রহ্মসভা করিবে। ক্রমে যখন অন্ধেরা অনেকে লেখা পড়া শিখিবে, তখন উহাদের অক্ষরে কত সংবাদপত্র বাহির হইবে। অন্ধ সম্পাদক উহা লিখিবে, অন্ধ গ্রাহকেরাই উহা পড়িবে। সমাজের, অর্দ্ধ অন্ধ, সিকি অন্ধ এবং দু'আনা অন্ধ যত চস্‌মাধারী বাবুরা আছেন, তাঁহারাও এই সময় হইতে কিছু কিছু অন্ধদের সঙ্কেত শিক্ষা করিতে চেষ্টা করুন। ইহাদ্বারা পরিণামে তাঁহারা অনেক ফল পাইবেন, এবং উপস্থিত ইহা দ্বারা অনেকের 'অন্ধজ্ঞান' কাটিবার ঔষধের ন্যায় এই সকল প্রবন্ধ কার্য্য করিবে।

যেখানে যত চক্ষুষ্মান মহাভাগ আছেন, সকলেরই উচিত, যাহাতে অন্ধেরা লেখা পড়া সুকৌশলে শিক্ষা করিতে পারে, তাহার কৌশলগুলি সাধারণকে বলিয়া দেওয়া। কেবল একটি অন্ধ বিদ্যালয় (কলিকাতায় যাহা হইয়াছে।) করিলে হইবে না। অনেক গ্রামে গ্রামে অন্ধ পাঠশালা বসাইতে হইবে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

কেনবা বিষাদে ভরা ক্ষুদ্র হৃদিতল ?

হাসে চাঁদ, হাসে তারা, গায় পাখীগণ,
প্রকৃতি নিহার বিন্দু করে বরিষণ,
কাননে কুসুম ফুটে, লোভে অলি মেতে উঠে,
গুণ গুণ রবে ছুটে প্রফুটিত ফুলে,
হংস, ক্রীড়া করে সরসী সলিলে।

কাঁপাইয়া তরুলতা, সুখদ মলয়
জুড়ায় তাপিত হিয়া, ব্যথিত হৃদয়।
বায়ুর হিল্লোলে খেলে, স্রোতস্বতী কুতূহলে,
সকলের সুখপ্রদ সুশীতল বায়
মরুভূ হৃদয় মোর 'লু' বহিছে তায়।

প্রিয় পরিজন সনে ভ্রমি সারাদিন,
তবুও বিষাদে কেন তনু অতি ক্ষীণ ?
আছে বটে নিজ গেহ, যত্ন পাই অহরহ ;
নানাবিধ মিষ্ট কথা শুনিতে সকল
তথাপি বিষাদ ভরা কেন হৃদিতল ?

সব (ই) আছে তবে কেন বিষাদে মগন
কেন তবে আঁখি-নীরে ভাসে দু-নয়ন ?
আছে সাধ, আছে হাসি, মায়াময়ী আশারাশি
তবে, কেনবা বিরলে বসি কাঁদি অবিরল
কেনবা বিষাদে ভরা ক্ষুদ্র হৃদিতল ?

ভুলি নাই এখনও অতীতের স্মৃতি
এখনত জাগে মনে শৈশবের গীতি,
ছিল ভাল ছেলেখেলা, করিতাম হাসি, খেলা,
এবে শোক-স্রোতে ভাসে দেহ অবরিল
কেনবা বিষাদে ভরা ক্ষুদ্র হৃদিতল ?

শ্রীশঃ
বালী।

বীরভূমে প্রাচীন পুঁথি।

৪। দণ্ডীপর্ব্ব।

(রাজারাম দত্ত)

আরম্ভ—

পুথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ চরণ
জ্ঞেন তিমির ধ্বংশ কৈল জেই জন
অথ দণ্ডিরাজার উপাক্ষান লিখ্যতে
ভারতের পুন্নকথা অমিও লহরি
সুনিলে পাতক খণ্ডে পরলোকে তরি
একদিন জনমেজয় জৈমিনিকে পুছে
পাণ্ডবের দন্দ সঙ্গে কৃষ্ণে দন্দ কি
নিমিত্তে (পৃঃ ১)

অন্যত্র—

শ্রীভাগবত কথা ব্যাসের কবিত্ত গাথা
পদবন্দি কথা অনুসারে
ভারতের পদতলে রাজারাম দত্ত বলে
সেই কথা রচিয়া পয়ার

পুঁথি খানি খণ্ডিত ; ৩৮টি মাত্র পত্র আছে। শেষপত্রে শেষ পংক্তি, যথা,—

সিব বলে ভীষ্মবীর সহ মোর বান
বুঝিব তোমার সক্তি ধনুর সন্ধান
বলি ইহা বাউ বান জুড়ে সন্ধানিয়া
রথ সহ ভীষ্মকে নিলেক ডরাইআ
মহাবলবন্ত বীর সান্তনু কুমার
মুহুত্তেকে সেই (৩৮ পৃঃ)

৫। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

(পরশুরাম চক্রবর্ত্তী)

আরম্ভ,—

ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরাণের সারগাথা
কন শুক ব্যাসের তনয়
কৃষ্ণপদে রচিত শ্রোতা তাহে পরীক্ষিত
ঋষিগণ যুত তাহা কয়
হরিপদে অভিলাষী নৈমিষকাননবাসী
কন সুত ব্যাসের আসনে
নয়ানে আনন্দ নদী শ্রোতা তথি
সৌনকাদি
সাটি সহশ্ব ঋষিগণ (পৃঃ১)

অন্যত্র—

অপূর্ব্ব তোমার মায়া করিয়া বিস্তার
মুখমিলি জননীরে দেখাল্যে সংসারে
চক্রবর্ত্তী পরশুরাম গাইল কৌতুকে
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল পুঁথি সুন সর্ব্বলোকে।
(পৃঃ ৪১)

পুঁথিখানি খণ্ডিত। শেষ পত্র ১০০

শেষপত্রে—

শুনরে ভকতলোক হঞা একচিত
রুক্মিণীহরণ কথা কহিব বিদিত
ভাগবতে কৃষ্ণকথা সর্ব্বপাপ নাশা
দ্বিজ পরশুরাম গান গোপাল ভরসা
ইত্যাদি— (পৃঃ ১০০)

প্রাপ্তি স্থান, কড়িধা।

৬। মনসা মঙ্গল। (বিষ্ণুপাল)

আরম্ভ—

বন্দদেবগণপতি বিনএ ভকতি স্তুতি
তুমি দেব হরের নন্দন।
দির্ব্ববস্ত পরি [illegible]ন সদাই মন্তজ্ঞান
আগে পূজা করে দেবগণ
... ...
বর পাঞা বসুমতি বসিল ধেয়ানে
মনসার বরে কবি বিষ্ণুপালে ভনে
(পৃঃ ১-২)

মধ্য—

[illegible] নাগ পাঠাইয়া যেন বিষহরি,
প্রভুর [illegible] যেন খায় অভাগিণী
আমি মরেঞা গেলে প্রভুর ঢের দাসী হব
প্রভু মর্‌্যে গেলে আমি অনাথিনী হব
তরুতে ল[illegible] তাতে ছুটি রহিল বেড়িয়া
দুমুখে রহিল রানা এক মুখ হঞা॥
বাসরে যুইল রে বেউলা নখিন্দর।
(পৃঃ ৭১)

পুঁথিখানি খণ্ডিত। বর্ত্তমান পত্র সংখ্যা ১৭ + ১২২ = ১৩৯। প্রথম ১৭ পত্রে বন্দনা পালা সমাপ্ত।

শেষ পত্রে—

এতেক দেবীর আজ্ঞা মাদাএর গমন
একেক পা ফেলিছে মাদাই চোরাসি
জোজন
ইত্যাদি (পৃঃ ১২১)

প্রাপ্তি স্থান সেহাড়া জেলে বাড়ী।

৭। মোহমুদ্গর।

আরম্ভ,—

এক দিন সিবদুর্গা বসিঞা কৈলাসে
রহস্যের কথা কহেন পরম হরিসে
পার্ব্বতি কহেন নাথ করি নিবেদন
কৃষ্ণভক্তি কথা কিছু করিব শ্রবণ

মধ্য,—

হাসিঞা পার্ব্বেরে তবে কহেন নারায়ণ
যুনিলে ইহার কথা পাণ্ডব নন্দন
... ...
কোথাকারে গেল মোহমোদ্গর তনয়
বড়ই কঠিন দেখি তোমার হৃদয়
সংসারের সার জানে প্রধানজে ভাই
সহোদর বিনে আর ত্রিভুবনে নাই
(পৃঃ ১৬)

অন্যত্র,—

স্ত্রীপুত্র গেলে পুন পাইএ সর্ব্বথা
ভাই গেলে পুনরপি নাহি পাই কোথা
ঐ

পুঁথিখানি খণ্ডিত। শেষ পত্র ১১

মালা তিলক কর তুমি কপট আচার
লোকেতে বলাহ তুমি অতির্থ ব্যাহার
(পঃ ১১)

প্রাপ্তি স্থান ঐ। গ্রন্থকারের নাম বা পরিচয় নাই।

৮। বিহদ বিরাট পর্ব্ব।

(সারণ কবি।)

পুঁথিখানি কীট দষ্ঠ (আরম্ভ ও শেষ উভয় এই) ১৩৪ পত্র শেষ। তারিখ ২২ ফাল্গুন (বৎসর কীট দষ্ট)। লেখক সূর্য্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাং বীরসিংপুর। পটক (কীট দষ্ঠ)সাকিম অটঙ্গন।
... ...

দ্বাদশ বৎসর মোরা রহিব বিপিনে
এক সম্বৎর অজ্ঞাত বঞ্চিব ছয় জনে
অজ্ঞাত বৎসরে জদি বিদিত হইব,
ইহার উপায় চিন্তি কোথাএ রহিব
(পঃ ১)

মধ্য—
বিরাট নন্দনে ডাকি অর্জ্জুন কহিল
সত্যভমা এই মতে বিজয় নাম দিল
পুনরপি উত্তর করেন জিজ্ঞাশন,
রচিল সারণ কবি উৎকল ব্রাহ্মণ
(পঃ ৭৩)

অন্যত্র,—
কি ছার কৌরবগণ কিবা ভয় তায়
ইন্দ্র যমে ভয় নাহি তোমার স্বহায়
ইন্দ্রের নন্দন তুমি গোবিন্দের সখা
সর্গ মর্ত্ত জিনিবারে পার তুমি একা
(পঃ ৮৮)

শেষ পত্র ঃ—
ভীম গিয়া কহিলেন সব সমাচার
জতুগণ সঙ্গে নঞা ভদ্রার কুমার
আইলা দ্রোপদ রাজা জত পরিবার
পাণ্ডবের বন্ধুগণ যত ছিল আর
(পঃ ১৩৪)

প্রাপ্তিস্থান কড়িধা

৯। ধর্ম্মপুরাণ। (ময়ূর ভট্ট

আরম্ভ—
মন দিয়া শুন সভে ধর্ম্ম পুরাণ
সকীয় মাহিমা শুন হঞা সাবধান
... ...
তাহার সেবক কবি, ময়ূরভট্ট অনুভবি
বিরচিল অনাদ্য মঙ্গল।

মধ্য—
মন মন মাথা কুড়ে কন্দ উচ্চস্বরে
কোথাকারে গেলে ব রাখিয়া
আমারে।

শেষ—খণ্ডিত
জথা তুমি উপনীত তৎ ... ... গীত
তোমা বিনু আনন্দে ...ল (?)
দ্বিজ ময়ূর ভট্ট বঙ্গে ... ...য়নস্থলে
গাই গীত ... ... মঙ্গ...
পত্র সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট; ...দাজ
দেড়শত, প্রাপ্তি স্থান নুড়ই। যুগী-
বাড়ী।

১০। ধর্ম্মপুরা[ণ]।

শ্যা[ম]পণ্ডিত।

পুঁথিখানি খণ্ডিত।
নিরঞ্জন মঙ্গলের অপূর্ব্য বন্দন
শ্রীসাম পণ্ডিত ভাসে করিঞা ভাবনা
(পঃ ৩...)

পদ্মচিনী মোছা ... ঘৃত মধু সমা...
দধি দুগ্ধ আর গুআ পান
আনিবে তীর্থের পয় ... ... প্রকাশ...
ধূপ দীপ সুগন্ধি চন্দন
... ...
শুনিয়া দত্তের বাণী ভবনে চলিলা...
মোনে ২ করিয়া ভাবনা
নিরঞ্জনপদ আসে, শ্রীসাম পণ্ডিত ভা...
অবধানে শুন সর্ব্বজনা
... ...
শতভার তীর্থ পয় ইথে কিছু অন্য না...
দধি দুগ্ধ তাহাতে প্রচুর

আম্র ... ... তাল নারিকেল সুরসাল
দাড়িম্ব কেউর পানিফল
পুঁথিখানি খণ্ডিত—কয়েকটি পত্র মাত্র। প্রাপ্তি স্থান ঐ।

১১। অর্জ্জুন সংবাদ।

প্রথম পত্র নাই।
পুনর্ব্বার অর্জ্জুন তবে পোছে জগন্নাথে
বৈষ্ণবের গতাগতি জানি ভাল মতে
আর কিছু স্থনিতে আছয়ে মোর মন
ভক্তিযোগ কথা কিছু কহ নারায়ন।
(পঃ২)

মধ্য,—
কেমতে নিস্তার পাব কহ ভগবান
ভক্তের কথা কহ প্রভু হউক ভালজ্ঞান
... ...
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা তবে তোমাকে স্মোরএ
ওপদ কোমল ধ্যান সদাই করএ
পঃ ৭

শেষ—
এতেক জানিয়া জেবা করে হরি নাম
জন্ম ২ কৃষ্ণচরণে তার ধাম
ক্রোটী জন্মে হরির চরণে রাখে ভক্তি
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার হয়ত ওন্নতি

ইতি অর্জ্জুন সংবাদ সমাপ্ত। পাঠক শ্রীসরূপলাল দাস সাং সিউড়ী পরগণে খটঙ্গা মতালগে জেলা বিরভোম সন ১৮৩০ সাল তাং ১৪ মার্চ্চ সন ১২৩৬ সাল তাং ২২ চৈত্রী রোজ রবিবার;

পত্র সংখ্যা ১১। গ্রন্থকারের নাম বা পরিচয় নাই। প্রাপ্তিস্থান ঐ।

১২। শ্রীকৃষ্ণ বিলাস।

(শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর)

পুঁথিখানি খণ্ডিত। প্রথম পত্র জীর্ণ

আরম্ভ—
... ...
প্রথমে বন্দিব——পরাসরে
ব্যাসরূপে গোবিন্দ জন্মিলা জার (ঘরে)
পঃ ১

অন্যত্র,—
শ্রীকৃষ্ণ বিলাস রস সর্ব্ব পরাৎপর
রচিল পরম ভক্তি শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর
শ্রীনন্দন পদে রহু মোর মন
যুগে ২ পাই জেন অভয় চরণ
... ... ইতি শ্রীবলিছলন কথা সম্পূর্ণং
(পঃ ৭)

মধ্য—
একদিন নারদ আসীঞা অন্তপুরে
বুঝিবে গোবিন্দ নীলা অন্তরে
... ... সহসা বলিলা দেখি ঋষি
মনে অনুমান করে যোগাসনে বসি
বেদে বলে অনন্ত মুরারী ভগবান
ঘরে ২ রহি ইহা দেখিব প্রমাণ
একেলা গোবিন্দ শত ২ পুরনারি
একা হঞা সভার ... ... করে হরি
(পঃ ৯৩)

শেষ খণ্ডিত
শেষপত্র ১৭৪
* রূপী ভৃগুর চরণে পরণাম
জার গুণে শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর হৈল নাম
জার গুণে গোবিন্দ ভজনে হৈল আস

জার গুণে কৈল হরিদাসের সন্তাস
জার গুণে শ্রীনন্দন প্রাণধন
জার গুণে সৎসঙ্গ মিলনে কৈল মন
জার গুণে মনের তিমির হৈল নাস
জার গুণে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস পরকাশ
জার গুণে শ্রীকৃষ্ণ চরণে করিল প্রণতি
জারগুণে সৎসঙ্গ মিলনে কৈল মতি
গোবিন্দের গুণে গুরু করিল আদেশ
শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর বলি (?) করিল আদেশ
বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীগোপাল দাস
আজন্ম ভরিয়া কৈল গুরুতে বিশ্বাস
অঙ্গমার ব্রতে দেহ করিয়া সোধন
অন্তে সুরধনী মধ্যে পাইল নারায়ণ
সর্ব্ব কবিগণে আমি করি পরিহার
আপনার গুণে দোষ না লবে কাহার
কহিতে গোবিন্দ গুণ কিসের সকতি
তবে জে কহিল পাঞা সাস্ত্র অনুমতি
অশেষ গোবিন্দ লীলা মহিমা অনংক্ষ
ইহা * * কৈল লক্ষ লক্ষ
মুই অতি হীনমতি অধম পাসান
অল্প গুণে কি করিব সে গুণ বাখান
অনন্ত সহস্ব মুখে না পাইল ওর
জার নাম নঞা সিব হইলা বিভোর
চারি যুগে পঃ ১৭৪

১৩। বীরভূমে সাঁওতাল হাঙ্গামা।

রাই কৃষ্ণদাস। ছড়া—

আরম্ভ,—

যুন ভাই বলি তাই সভা জনের কাছে
শুভ বাবুর হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুঁকেছে
বেউরো কোক ছাড়িল জড় হইল হাজারে হাজার
কখন এসে কখন লোটে থাকা হলভার
হল্য সব দুভ্যাবনা রাড়কান্দনা সভাই ভাবে বসে
ঘড়াঘটী মাটিতে পোতে কখন লিবে এসে।

মধ্য,

পূর্ব্বে হনুমান লঙ্কাখান জেমতে পোড়ায়
ঘরাঘরি অগ্নি দিয়ে সাঁওতাল বেড়ায়
…গ্রাম নিবাস সাধুদাস তার সঙ্গে জন চারি
সিউড়ি আসি জজের কাছে বলছে বিনয় করি
আরত্য প্রাণ বাঁচে না কি মন্তনা করছেন হুজুর বস্যে
ঘরকর্ন্না পুড়ায়ে আমার ভাইকে কাটীলে শেষে

শেষ

হাতে ধনুর্ব্বাণ টাঙ্গিখান কান্দেতে লাগিয়ে
সাঁওতালের বুনিজানি এই সাহষ করিয়ে
সাঁওতালের সঙ্গে নানা রঙ্গে কথায় ভুলিয়ে
লখণ্ডা ছলনা করি আনিল ছাড়িয়ে
রাই কৃষ্ণদাসে* ভনে সংক্ষেপনে কিছু লেখা হল

* এখনও জীবিত।

বিস্তার লিখিতে হল্যে অনেক বাহুল্য
কাএস্ত কোলে জন্ম মোর রাইকৃষ্ণদাস
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় যে নিবাস
জেলা বীরভূম তাহে লোনি পরগণা
লাউ রাম তাহে লাঙ্গলের আনা
আমি তাবি মোনে সাঁওতালগণে রাখিল যে যুক্ষাতি
জে কিছু লিখিলাম আমি সকলি ত সত্তি
কথা মিথ্যা নয় সর্ত্ত হয় এই জে বিবরণ
হরি ২ বল দিন গেল অকারণ
১২৬২ সাল এই গোলমাল বড় ভাবনা মনে
কুলকুড়ি লোট হয় ২৩ শ্রাবণে॥
ইথে যদি থাকে ভোল গোনি লোক
হয়ে কুল শোধরণ করিয়া দিবেন।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

রাজসিংহের পুণ্য কীর্ত্তি।

রাজ সুমন্দ্ হ্রজ।

রাজস্থানের রাজন্যবর্গ যেমন অসাধারণ অধ্যবসায় সম্পন্ন বীর ছিলেন, সরলতা, মহানুভবতা, প্রজাবৎসলতা প্রভৃতি লোকোত্তর গুণরাশিরও তাঁহারা তদ্রূপ অধিকারী ছিলেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহারা যেমন সকল সুখ-সচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া অকাতর প্রাণে যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, প্রজাপুঞ্জের দুঃখ ও অভাব মোচনার্থ প্রজাহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহারা সেইরূপ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

মিবার রাজ রাজসিংহের প্রজাবৎসলতার পরিচায়ক একটী পুণ্য কীর্ত্তির বিষয় বিবৃত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই পুণ্যকার্য্যের সমসাময়িক দুই একটী ঘটনা এবং যে জন্য এই কার্য্যানুষ্ঠান আবশ্যক হইয়াছিল, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অত্যাবশ্যক বোধে এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইল।

যে সময়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সাহজাহান ভারতের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন, সে সময়ে ভারতবর্ষের সুখ সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। অম্বররাজকুমারীর গর্ভে জাহাঙ্গীর এবং মারবার রাজকুমারীর গর্ভে সাহজাহান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দু-শোণিত তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবাহিত ছিল বলিয়া হিন্দুপ্রধান স্থান ভারতবর্ষকে তাঁহারা প্রকৃত হিন্দুরাজার ন্যায় শাসন

করিয়াছিলেন। এ সময়ে জাতিগত বিদ্বেষে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইয়া অকারণে নরশোণিত পাত হয় নাই।

রাজস্থানের মিবার ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে অতি প্রসিদ্ধ স্থান। উদয়পুর মিবারের রাজধানী জাহাঙ্গীরও সাহজাহানের সময়ে মহারাণা কর্ণ ও তৎ পুত্র জগৎ সিংহ উদয়পুরের মস্‌নদে উপবিষ্ট ছিলেন। মহারাণা কর্ণ তাঁহার রাজ্য শাসনের শেষ আট বৎসর শান্তিতে ও নির্ব্বিবাদে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহান্তে তৎ পুত্র মহারাণা জগৎ সিংহ পঞ্চবিংশতি বৎসরের ঊর্দ্ধ কাল শান্তিতে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। যখন রাজ্য মধ্যে কোন বিবাদ বিসংবাদ না থাকে, বহিঃশত্রুগণের আক্রমণের কোন আশঙ্কা না থাকে, তখন মহানুভব রাজন্যবর্গ লোকহিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। জগৎসিংহও প্রজাপুঞ্জের সুখ-সৌভাগ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি করিয়াছিলেন। যাহাতে প্রজাবর্গের সমধিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, যাহাতে শান্তিতে তাহাদের অর্থাগমের সুবিধা হইতে পারে, এরূপ শিল্প ও কৃষি বিষয়ের উন্নতি সাধনার্থ কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেন। স্থপতি কার্য্যে তাঁহার বড় অনুরাগ ছিল। উদয়পুরের উদ্যান পরিবেষ্টিত, মার্ব্বেল প্রস্তর বিনির্ম্মিত সুবিশাল হর্ম্ম শ্রেণী তিনিই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

জগৎ সিংহের দুই পুত্র। তন্মধ্যে রাজসিংহই জ্যেষ্ঠ। জগৎ সিংহ লোকান্তরিত হইলে রাজসিংহ পিতৃ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। যে সুখ শান্তিতে পিতা পিতামহ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন রাজ সিংহের ভাগ্যে সে সুখ-শান্তি ঘটিল না। সিংহাসন প্রাপ্তির পর হইতেই তাঁহাকে নানাবিধ বিপজ্জালে জড়িত হইতে হইল।

সম্রাট সাহজাহান বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়াছিল। জীবনের আর আশা ছিল না। তাঁহার পুত্রগণ সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য পরস্পরের মধ্যে মহা বিপদের সূত্রপাত করিলেন। পরিশেষে সাহজাহান সিংহাসনচ্যুত করিয়া কূটবুদ্ধি আওরঙ্গজেব নানাবিধ কৌশল জাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণকে নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন।

মোগলকুলগৌরব সম্রাট আকবরসাহ যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়া সমগ্র ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর ও সাহজাহান যে নীতির বলে আকবরের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাজ্য দৃঢ় হইতেও দৃঢ়তর

করিয়াছিলেন, জাতিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া আওরঙ্গজেব সেই দৃঢ় ভিত্তির মূলদেশে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। সিংহাসন প্রাপ্তির পর হইতেই তাঁহার নানারূপ কূটবুদ্ধির, আত্মম্ভরিতার, স্বার্থপরতার ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। আজীবন হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। সেই বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু রাজন্যবর্গের উপর, হিন্দু প্রজাপুঞ্জের উপর জিজিয়া কর নির্দ্ধারণ প্রভৃতি নানারূপ উৎচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন।

মিবারভূমি আওরঙ্গজেবের বিদ্বেষ নয়নে নিপতিত হইল। কারণ কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মিবাররাজ রাজসিংহকে বাধ্য হইয়া আওরঙ্গজেবের স্বার্থপরতাময় ইচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইল।

আর্ত্তের দুঃখ মোচন, শরণাগতের সংরক্ষণ, ন্যায্য পক্ষের সমর্থন প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী প্রত্যেক রাজপুত রাজার অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ ছিল। তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, উদারতা ও ক্ষমাশীলতায় তাঁহারা জগতে অতুলনীয় ছিলেন। এ সকল গুণের মধ্যে রাজসিংহের কোন গুণেরই অভাব ছিল না।

এক দিকে রাজসিংহের হৃদয় যেমন সর্ব্ব সদ্‌গুণের আধারস্বরূপ ছিল, অন্যদিকে আওরঙ্গজেবের হৃদয় তেমনি সর্ব্বপ্রকার কুপ্রবৃত্তির কলুষনিচয়ে আচ্ছন্ন ছিল।* একদিকে দয়া, অন্যদিকে নিষ্ঠুরতা। একদিকে পরার্থপরতা, অন্যদিকে স্বার্থপরতা। একদিকে মহানুভবতা, অন্যদিকে নীচতার জঘন্য প্রকাশ। সুতরাং পরস্পরের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। বহুবিধ কারণে রাজসিংহের সহিত আওরঙ্গজেবের বিবাদ বাধিল। তন্মধ্যে তিনটী কিংবা চারিটী কারণই প্রধান বলিয়া পরিগণিত।

প্রথমতঃ—আওরঙ্গজেব যখন স্বীয় পিতা সাহজাহানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, তখন রাজসিংহ কর্ত্তব্যের অনুরোধে সাহজাহানের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের মতানুবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

সাহজাহানের পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে দারা জ্যেষ্ঠ। দারা পিতৃসিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী ছিলেন। যখন আওরঙ্গজেব দারাকে পিতৃসিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিয়াছিলেন,

* এত কড়া কথা বলা লেখকের উচিত ছিল না। আরঙ্গজেবের কোন সদ্‌গুণই কি ছিল না? বীঃ স।

তখন রাজসিংহ আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ—রূপনগরের রাজকুমারীর অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া আওরঙ্গজেব তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে দিল্লী আনয়নার্থ রূপনগরে দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। তেজস্বিনী রূপনগররাজকন্যা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। "রাজহংসী কি বক সহচরী হইবে", "পবিত্র হৃদয়া রাজপুতমহিলা কি যবন সন্তানের অঙ্কশায়িনী হইবে?" ইত্যাদি তেজোগর্ভ উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে একখানি পত্র লিখিয়া রাজকুমারী রাজসিংহের শরণাগতা হইলেন। শরণাগতের উদ্ধার সাধন রাজপুতগণের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। তেজস্বী রাজসিংহ অকুতোভয়ে সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বর আওরঙ্গজেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া রাজকুমারীকে যবনকবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ—যখন আওরঙ্গজেব মারবাররাজের সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার শিশু পুত্র অজিতকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন রাজসিংহ তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া প্রকৃত রাজধর্ম্মের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজসিংহ হিন্দুবীরের ন্যায় এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখাইতে গিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানপরিশূন্য ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত আওরঙ্গজেবের বিষনয়নে পতিত হইলেন। যাহাতে সমগ্র মিবারভূমি একেবারে উৎসাদিত হয়, যাহাতে মিবারের সিংহাসন মোগল করকবলিত হয়, যাহাতে রাজসিংহ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া মোগলসম্রাটের আজ্ঞাধীন হন, আওরঙ্গজেব এরূপ উপায় অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মিবার অতি ক্ষুদ্র রাজ্য, রাজসিংহ এই ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর। আওরঙ্গজেবের ভারতসাম্রাজ্যের তুলনায় মিবার অতি নগণ্যের মধ্যে পরিগণিত। একটী সুবিশাল সাম্রাজ্য জয় করিবার জন্য যে পরিমাণ সৈন্যের প্রয়োজন, আওরঙ্গজেব সেই পরিমাণ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। মিবারে ন্যায় একটী ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিতে এত অধিক সৈন্যের আবশ্যকতা কিছু ছিল না। কিন্তু মিবারের একবারে উৎসাদন সাধনাভিপ্রায়ে এই প্রবল অনিকিনী লইয়া আওরঙ্গজেব স্বয়ং মিবারভূমি আক্রমণ করিলেন।

ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনে যেমন নগর, প্রান্তর সমুদায় এককালে অতর্কিত ভাবে পরিপ্লাবিত হইয়া যায়, পতঙ্গপালের ন্যায় মোগল সৈন্য সেইরূপ মিবারের বহির্দ্দেশ অতর্কিত ভাবে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। এই ভয়ঙ্কর শত্রু-শ্রেণী পরিবেষ্টিত হইয়াও মিবারের রাজপুতগণের হৃদয় টলিল না। তাহারা স্বদেশ রক্ষার্থ নির্ভীক হৃদয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যবন সেনার গতি-রোধ করিতে রাজসিংহের পার্শ্বে সমবেত হইল। পরাজয়ের ভয়ে সহজে স্বাধীনতা রত্ন যবনপদে উৎসর্গ করিয়া কাপুরুষতা দেখাইল না; কিন্তু এই দুর্দ্ধর্ষ অসংখ্য মোগল সৈন্যের গতিরোধ করা তাহাদের সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইল। চিতোর, মণ্ডলগড়, মুন্দিশ্বর ও জীরন দুর্গ রাজপুতগণ প্রাণপাত করিয়াও আয়ত্তে রাখিতে সমর্থ হইল না।

পরিশেষে রাজসিংহ আরাবল্লী পর্ব্বতের * সানুদেশে সৈন্য সংস্থাপিত করিয়া মোগল সৈন্যের গতিরোধ করিলেন। সমুদায় পার্ব্বত্য জাতি এবং রাজস্থানের হিন্দুরাজগণ এই স্থানে রাজসিংহের লোহিত পতাকার নিম্নে সমবেত হইলেন। "বম্ বম্" "হর হর" শব্দে হিন্দুসৈন্যগণ প্রর্ব্বত প্রদেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া অমানুষিক পরাক্রমে যবনশত্রুর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। আওরঙ্গজেব একদিনের জন্যও জয়লাভ বিষয়ে সন্দিহান হয়েন নাই। মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্য অধিক দিন তাঁহার অসংখ্য সৈন্যের প্রতাপ সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাহা হইল না। অকারণে অপরের স্বাধীনতা হরণের প্রয়াসী হইয়া যে ব্যক্তি অনর্থক নরশোণিতপাত করিতেছে, বিধাতা যেন তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদানে সমুদ্যত হইলেন। বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় রাজপুত বীরগণের অদম্য তেজ, অমানুষিক বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকবার মোগল সৈন্যগণ পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িল। পরিশেষে ১৬৩৭ সম্বতের ফাল্গুনে বিজয়লক্ষ্মী রাজসিংহের অঙ্কশায়িনী হইলেন। মোগল সৈন্যগণ হৃতসর্ব্বস্ব, সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হইল। আওরঙ্গজেব অবনত মস্তকে পলায়নপর হইয়া আত্মরক্ষণ করিলেন।

যুদ্ধে জয়লাভ হইল বটে, কিন্তু মিবারভূমি দারুণ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইল। জন্মভূমি রক্ষার জন্য মিবারের প্রায় সমুদায় লোককেই যুদ্ধে যোগ দান করিতে হইয়াছিল। কৃষককুল কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া

* এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য নহে।

শিল্পিগণ শিল্পকার্য্য ছাড়িয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা কালীন শস্যোৎপাদন বিষয়ে কিংবা শিল্পকার্য্যে কেহ মনোনিবেশ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। অধিকন্তু, পূর্ব্ব সঞ্চিত শস্যরাশি যুদ্ধের সময়ে এক কালে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় সমগ্র মিবার একবারে শস্য-শূন্য হইয়া পড়িল।

যুদ্ধের পর বৎসর মিবারে আর এক বিষম বিপৎপাতের সূত্র হইল। আষাঢ় শ্রাবণ মাস অতিবাহিত হইল, বিন্দু মাত্র বৃষ্টিপাত হইল না। ভাদ্র আশ্বিনও চলিয়া গেল, তথাপিও বিন্দুবর্ষণ হইল না। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী করাল বদন ব্যাদন পূর্ব্বক মিবারবাসীর দ্বারে দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। জলাভাবে তৃণ গাছটী পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেল। মিবারের অধিবাসীগণ ক্ষুধার তাড়নায় অখাদ্য ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। স্বামী প্রণয়িনী ভার্য্যাকে, পতিপ্রাণা ভার্য্যা স্বামীকে পরিত্যাগ করিল। পিতা মাতা পুত্র কন্যা বিক্রয় করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস পাইতে লাগিল। যত দিন যাইতে লাগিল, বিপদ ততই ঘনীভূত হইতে লাগিল। খাদ্যাভাবে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইল। নদী, হ্রদ, তড়াগের সলিল সমুদায় শুষ্ক হইবার উপক্রম হইল। দারুণ ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির বর্ণগত পার্থক্য তিরোহিত হইল। যে যাহার পাইল, জোর জবরদস্তে কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল। ফল, ফুল, লতা, পাতা, বৃক্ষ, বল্কল পর্য্যন্ত দারুণ জঠরানলে ভস্মীভূত হইল। কিন্তু তাহাতে আর কত দিন চলিবে? ক্রমে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া আসিল। একদিকে যেমন ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণায় লোকের প্রাণবিয়োগ হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি মহামারীর প্রকোপে প্রত্যহ শত শত লোক কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল।

এই বিষম বিপদে রাজসিংহের করুণ হৃদয় দ্রব হইল। যাহারা তাঁহার রাজ্য রক্ষার্থ স্ত্রী-পুত্রাদির মমতা বিসর্জ্জন করিয়া যুদ্ধে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল, যাহারা উদরান্নের সংস্থান স্বরূপ শিল্প ও কৃষিকার্য্যে অবহেলা করিয়া অকাতর প্রাণে যুদ্ধ করিয়াছিল, যাহারা যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাহাদের সঞ্চিত যথাসর্ব্বস্ব শস্য প্রভৃতি রাজপদে সমর্পণ করিয়াছিল; রাজসিংহ সেই সমুদায় স্বর্গীয় বীরগণের অনাথ পরিবারবর্গের পিতৃস্থানীয় হইয়া প্রতিপালন করিতে, সেই সমুদায় স্বার্থত্যাগী, স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি-

গণের উদরান্নের সংস্থান করিবার জন্য মহা চিন্তিত হইলেন। যুদ্ধের ব্যয়ে রাজকোষে অর্থের অসচ্ছলতা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা সত্বেও প্রজা-পুঞ্জের প্রাণরক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও অসংখ্য অমূল্য মানবজীবন যাহাতে রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতে লাগিলেন। অলকা-বিনিন্দিত সুখসেব্য রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা একেবারে বিসর্জন দিয়া, দিবা-নিশি অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রজাপুঞ্জের দুঃখ-দুর্দ্দশার বিষয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদারতা ও সহৃদয়তা গুণে অর্থের অসচ্ছলতা দূর হইল। মিবারের ধনশালী জমিদার ও বণিক সম্প্রদায় তাঁহাদের সাধ্যাতিরিক্ত ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

মিবারের অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। বহুসংখ্যক ভদ্র ও বহুসংখ্যক শ্রমজীবি বাস করিত। প্রায় সকলেই দুর্ভিক্ষের তাড়নায় দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। প্রকাশ্যভাবে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া যাহাতে অনাথ ভদ্রপরিবারগণের মস্তক অবনত না হয়, সে বিষয়ের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিলেন। শ্রমজীবীগণের জন্য এক মহৎ উদ্দেশ্যের সংকল্প করিলেন। যে কার্য্যে শ্রমজীবীগণ বহু দিন ধরিয়া প্রতিপালিত হইতে পারে, যদ্বারা মিবারের এক প্রধান অভাব দূর হইয়া মহদুপকার সাধিত হয় এবং যদ্বারা মিবারে পুনরায় এরূপ মহা অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা না থাকে, এরূপ এক সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিলেন।

কোন বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে বা কোন বৎসর পর্জ্জন্যদেবের সম্যক্ কৃপা না হইলে মিবারভূমি যাহাতে এরূপে উৎসাদিত না হয়, সমগ্র মিবারের শস্যোৎপাদিকা শক্তি যাহাতে এককালে বিনষ্ট না হয়, এরূপ এক সুবিশাল হ্রদ খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু শ্রমজীবী এই স্থানে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

আরাবল্লী পর্ব্বতের সানুদেশ প্রবাহিনী বক্রগামিনী গোমতী নদীর গতি রুদ্ধ হইয়া যাহাতে হ্রদের জল পুষ্টি সাধিত হয়, এরূপভাবে আরাবল্লীর রমণীয় উপত্যকাপ্রদেশে অর্দ্ধবৃত্তাকারে এক সুগভীর ও সুদীর্ঘ হ্রদ খনিত হইল। হ্রদের উত্তর পূর্ব্ব ও উত্তর পশ্চিমের কতকাংশ আরাবল্লির শৈল-শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। হ্রদের অন্যান্য দিক দিয়া গোমতীর জলরাশি যাহাতে নিঃসৃত হইয়া না যাইতে পারে, এরূপ এক উচ্চ ও ছয় ক্রোশ পরিধিসমন্বিত মার্ব্বেল প্রস্তরের বাঁধ প্রস্তুত হইল। বাঁধের উপর হইতে হ্রদের তলদেশ পর্য্যন্ত বাঁধের সমুদায় দৈর্ঘ্য ব্যাপিয়া শ্বেত প্রস্তরের সোপান-শ্রেণী বিনির্ম্মিত হইল। হ্রদের অপর পার্শ্বে বাঁধের নিম্নভাগস্থ ভূখণ্ড অনুর্ব্বর প্রস্তর-স্তূপে পরিপূর্ণ ছিল। সে সমুদায় প্রস্তরস্তূপ অপসারিত করিয়া দূর প্রদেশ হইতে উর্ব্বরতা শক্তিশালিনী মৃত্তিকা আনয়ন করাইয়া সেই বিস্তৃত ভূখণ্ডের সমুদায় স্থল পরিপূর্ণ করা হইল। এই নূতন মৃত্তিকাপূর্ণ ভূখণ্ডের

কতকাংশে নানা জাতীয় ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপিত হইল এবং কতকাংশ শস্যক্ষেত্রোপযোগীরূপে পরিণত হইল। সাত বৎসরে ছিয়ানব্বই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে হ্রদের খননকার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। রাজসিংহের নামানুসারে হ্রদের নাম রাজসুমন্দ হ্রদ হইল।

হ্রদ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য শেষ করিয়া হ্রদের দক্ষিণ তীরে সমতল ভূমি হইতে সমধিক উচ্চ পাহাড় খণ্ডে এক অতুচ্চ দুর্গ এবং তন্নিম্নে একটী সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহার নামানুসারে নগরের নাম রাজনগর হইল।

দুর্গ ও নগর নির্ম্মিত হওয়ার পর, রাজসিংহ হ্রদের অব্যবহিত তীরে ঠিক বাঁধের উপর স্থপতিবিদ্যানিপুণ শিল্পিশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা মনোহর কারুকার্য্যে খচিত অশেষবিধ চিত্রসমন্বিত মর্ম্মর প্রস্তরের এক নয়নরঞ্জন মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়রঞ্জন প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিলেন।

মন্দিরপ্রান্তে সেই মনোহর চিত্রগুলির মধ্যে মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নামাবলী ও তাঁহাদের স্মরণীয় কীর্ত্তিকলাপের ধারাবাহিক অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ খোদিত করাইলেন।

হ্রদের উত্তরপূর্ব্ব ও উত্তরপশ্চিমাংশে আরাবল্লির সমুন্নত গণ্ড-শৈল-শ্রেণী দণ্ডায়মান। রজত-রেখার ন্যায় কয়েকটী বিমলা-সলিলা নির্ঝরিণী কুল কুল নাদে একত্র সম্মিলিত হইয়া গোমতীরূপ স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়া হ্রদ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সুবিমল জলরাশিপূর্ণ হ্রদের সেই বিশাল বক্ষ! বাঁধ সংলগ্ন শ্বেত প্রস্তরের সোপানাবলী হ্রদের সলিল দ্বারা সর্ব্বদা বিধৌত হইতেছে। বাঁধের পর হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র। তাহার পর সারিসারি ফল ও ফুলের বৃক্ষ। এ দৃশ্য বড় মনোরম, বড় হৃদয় উন্মাদকর।

যদি প্রজাপুঞ্জের শোণিত সম অর্থ শোষণ করিয়া কোন অদম্য বিলাসবাসনার পরিতৃপ্তির জন্য অযথা অর্থ ব্যয়ে এই বিরাট ব্যাপার কার্য্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে এ সমুদায়ের দৃশ্য এত মনোমুগ্ধকর হইত না। হইলেও মানব-হৃদয়ে এ দৃশ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা অনুভূত হইত না।

ক্ষুৎপিপাসায় কাতরকণ্ঠ, মুষ্টি পরিমাণ উদরান্নের জন্য মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন শ্রমজীবিগণের অমূল্য জীবন রক্ষার্থ এবং ভবিষ্যতে এরূপ বিষম বিপদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্য সাধনার্থ এই বহুব্যয়সাধ্য বিরাট অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া এ দৃশ্য রমণীয় হইতেও রমণীয়তর হইয়াছে। এ বিরাট দৃশ্যের প্রাণস্পর্শী উন্মাদকারী উদ্দামভাব হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় অনুভূত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ সিংহ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত নীলমাধব সরকার ও শশিভূষণ সরকার "বীরভূমির" এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। গ্রাহকগণ ইঁহাদের একজনের স্বাক্ষর ও আমার স্বাক্ষর যুক্ত ছাপা রসিদ লইয়া টাকা দিবেন। মণিঅর্ডার করিয়া ও এই রসিদ লইয়া টাকা দিলে তবেই তাহা গ্রাহ্য হইবে। অপর কাহাকে টাকা দিলে আমরা দায়ী হইব না।

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সংবাদ ও নানা কথা।

বীরভূম দুবরাজপুরের অন্তঃপাতী ইস্‌লামপুর গ্রামের কেয়ামত সেখ আপন পিতা, ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্র বধের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। সম্পত্তিসম্বন্ধীয় বিবাদই ইহার কারণ। হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বে কেয়ামত সাধারণের বাঁশ ঝাড়ে বাঁশ কাটিতেছিল। উল্লিখিত ব্যক্তিত্রয় তাহাকে বাধা দিতে যাওয়ায় দুষ্ট হস্তস্থিত কুঠারাঘাতে তাহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছে।

ভারতের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ জন্য বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ, পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় বীরভূম কালেক্টরী ভবনে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমীদার ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিবৃন্দ এই সভায় আহূত হইয়াছিলেন। হেতমপুরাধিপতি বাহাদুর এতদুপলক্ষে ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। অন্যান্য সকলেই সাধ্যানুসারে সাহায্য প্রদানে স্বদেশহিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আমেদ সাহেব বাহাদুর এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক সমবেত ভদ্রমণ্ডলী সমক্ষে সভার উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত করিয়াছিলেন।

বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ, দিবাবসান সময়ে ম্যাফেকিং উদ্ধারবার্ত্তা বীরভূমে আসিলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তৎসংবাদ সহরে বিদিত করিয়া পরদিনের জন্য বিচারালয় বন্ধের আদেশ দেন। নগরবাসিগণ মহানন্দে মগ্ন হইয়া ঐ দিন রজনীকালে স্ব স্ব বাটীর উচ্চতম স্থানে বহুসংখ্যক আলোক প্রজ্জলিত করত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। পরদিন প্রভাতে বিচারালয় ও তন্নিকটবর্ত্তী বিটপীরাজি বিবিধ রাগরঞ্জিত বিচিত্র জয় কেতনে সুশোভিত হইয়াছিল। ক্ষণে ক্ষণে পুলীশগণের অশনি সদৃশ তোপধ্বনি কুশল সংবাদ সুদূরে কীর্ত্তন করিতে লাগিল; তালে তালে তাহাদেরই উচ্চ আনন্দ আরব বিমানে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগমে নগরবাসিগণ স্ব স্ব ভবনের উচ্চতম স্থান ও রাজপথ সহস্র সহস্র দীপালোকে

সুশোভিত করিয়াছিল। বিচারভবন সুরনিকেতন বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। নানাজাতীয় সংকীর্ত্তন এবং মৃদঙ্গকরতালাদির ধ্বনিতে বিচারপ্রাঙ্গণ রঙ্গাঙ্গনে পরিণত হইয়াছিল।

কীর্ণাহারে দুর্ভিক্ষ-সভা।

বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়, স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের যত্নে, শিবচন্দ্র স্কুলগৃহে এক সভা আহূত হয়। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ কি উপায়ে চাঁদা হইতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ সভার উদ্দেশ্য ছিল। হাজারিবাগ জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু বিন্দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট পেন্‌সনার বাবু ত্বরিতানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, কবিরাজ কবিরত্ন মহাশয় সুললিত ভাষায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। ঝড় বৃষ্টির জন্য অনেকেই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহা হইলেও সভাস্থলে ১৬০৲ টাকা স্বাক্ষরিত হয়। তন্মধ্যে বাবু সত্যেসচন্দ্র সরকার ১০০৲ টাকা প্রদান করেন। তাহার পর চাঁদা সংগ্রহের নিম্নলিখিত রূপ উপায় অবলম্বিত হয়। প্রত্যেক গ্রামের প্রধান ভদ্র ব্যক্তি স্বীয় গ্রামের জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিবেন। যিনি যাহা দিবেন, সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা গ্রহণ করিবেন। এক মুষ্টি চাউলও গৃহীত হইবে। সাঁকুলীপুর থানায় ২০০ শতের অধিক গ্রাম আছে। যদি প্রতি গ্রামে ঐ উপায়ে ৫৲ টাকা করিয়া গড়ে আদায় হয়, তবে এক হাজারেরও অধিক চাঁদা সংগৃহীত হইবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া স্থায়ী দুর্ভিক্ষ-কমিটী গঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকার, জমিদার,.....সভাপতি।
" " রাখালদাস মুখোপাধ্যায় বি,এ, সেকেণ্ড মাষ্টার ও বীরভূমির কার্য্যাধ্যক্ষ।
" " পূর্ণানন্দ রায়, শিবচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার।
" " ভূজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" " রাধাকিঙ্কর রায়, সহ সম্পাদক।
" " গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাঁকুলিপুর থানার সব্‌ইন্‌সপেক্টর ঐ
" " সৈরেশচন্দ্র সরকার—জমিদার, ধনরক্ষক।
" " নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি,এ, হেড্‌মাষ্টার ও "বীরভূমি" সম্পাদক। সম্পাদক।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ] শ্রাবণ। [১০ম সংখ্যা।

মায়ের খেলা।

কে তুমি রূপসী বালা বয়সে শাশ্বতীঃ সমাঃ।
দিগ্বসনে দাঁড়াইয়ে মহাকাল মনোরমা॥
শশাঙ্ক তিমির হর, জাতবেদা বৈশ্বানর
ত্রিনেত্র প্রসারি হের, জগতের তিন কাল।
দশভুজ দশ দিকে, পদ অনন্তের বুকে,
সীমা নাই শোকে সুখে, পাতিয়া মোহের জাল।
ভ্রুকুটী কুটিলাননে, করুণা কটাক্ষ দানে
বরাভয় বিতরণে, উদ্যত কৃপাণ করে।
কি খেলা খেলিছ মা গো, বলনা বলনা মা গো
গুণাতীত গুণময়ি! ভীত সুরাসুর নরে॥
কত ভূত ভবিষ্যৎ কত বর্ত্তমান গত।
তথাপি কি খেলা তোর হ'ল না মা মনোমত।
গায়ে ধূলি মুখে হাসি, আকাশ প্রাঙ্গণে বসি
নবগ্রহ ভাঁটা লয়ে একই পথে গড়াইয়ে,
খেলিতেছ লীলাময়ি! করিয়ে সত্যের ভাণ।
জ্বালিয়ে তারকা-বাতি, জাগি থাক সারা রাতি
পাগলের এই রীতি, বলে এক করে আন॥
ভাঙ্গা নাই গড়া নাই, ভাঙ্গ চুর সর্ব্বদাই

হইতেছিল, তাহা কেমন করিয়া স্থায়ী এবং নিত্য হইয়া উঠিয়াছে। সে ত' বহুদিনের কথা। তবু তাহারা অল্পদিনেই বুঝিয়াছিল যে কবি তাহাদের চির-দিনের কবি, তাঁহাকে তাহারা কতকাল জানিয়াছে, তাঁহার গান যেন তাহাদের জন্মরাজ্যের পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুরাজ্যের পর পর্য্যন্ত অনাদি ও অনন্তকালের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

কবির প্রাণে যে সর্ব্বদা তটিনীর সান্ধ্যমর্ম্মরের মত একটা অস্ফুট গুঞ্জরণ জাগিয়া থাকিত, তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে। তিনি আপন মনে গুণ্‌গুণ্ করিয়া যাহা গাহিতেন তাহা পৃথিবীর সুখ দুঃখের কথা হইতে ভিন্ন কিনা জানা যাইত না, তাঁহার নিজের বিশেষ কোন' তৃপ্তি বা অতৃপ্তির পরিচয় স্পষ্ট ছিল না। তাঁহার গানে যদি কোন বেদনার আভাস থাকিত তবে তাহা এমন অর্থে ব্যক্ত করিতেন ও এমন সুরে গাহিয়া যাইতেন যে তাহা ধরা যাইত না; তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইত না, এবং ভাবের মাধুর্য্যে ও গভীরতায়, চক্ষুপ্রান্ত অজ্ঞাতে সিক্ত হইয়া উঠিলেও প্রাণে একটা মদিরতার মত আনন্দ অনুভব করা যাইত এবং তাহা বিশ্বজনীনতায় স্পষ্ট হইয়া উঠিত।

কবিকে কয়বার দেখিয়াছ? বেশী বার নহে। হয় ত' প্রাতঃকালে সবুজ ঘাস হইতে শিশির মুছিয়া ক্ষীণ জ্যোৎস্নার মত অস্ফুট সূর্য্যালোকে বক্ষে বাহুবন্ধ করিয়া ভূমি সংলগ্ন-দৃষ্টি কবিকে নির্জ্জনে পাদচারণা করিতে দেখিয়াছ; তখন তাঁহার দীর্ঘ অলকগুচ্ছ ঊষার বাতাসে মৃদু আন্দোলিত হইতেছিল এবং ওষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিতেছিল। কিম্বা হয়ত, দেখিয়াছ, নদীর তীর যেখানে সমতল ও কোমল শষ্পাচ্ছাদিত এবং জল হইতে একটু উচ্চ, সেখানে সন্ধ্যাকাশতলে হস্তে মাথা রাখিয়া জলের উপর ঝুঁকিয়া কবি নবজাগরিত ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিরাজির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

কিন্তু গান? তাহা সকলে শুনিয়াছে এবং সকল সময়ে কাণের' পর বাজিয়া উঠিতেছে। তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে বিপদে হৃদয়ের অন্তরতম বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কত লোক কবিকে চক্ষে দেখে নাই, কিন্তু কবির প্রাণের স্পন্দন কাহার অন্তরতটে পঁহুছিয়া প্রত্যুত্তরে স্পন্দিত করিয়া তুলে নাই? কোকিলকে কয়জন দেখিতে পায়? কিন্তু বসন্ত সমাগমে তাহার কণ্ঠস্বরে কাহার চিত্ত মদির কুহকময় হইয়া উঠে নাই? কবির গান তাহাদের নিত্য ভোগ্য ছিল। তাহার একটি পদ যদি তাহারা ধরিতে পারিত, তবে তাহা কতদিন ধরিয়া কণ্ঠে কণ্ঠে কুহরিত হইয়া উঠিত।

কবি যেন তাহাদের নিকট উদয়াচল হইতে নবীন প্রভাত লইয়া নামিয়া আসিয়াছিলেন। না দেখিলেও তাহারা স্বর্ণজ্যোতির মত একটা অপূর্ব্ব গৌরবে তাঁহাকে মনে মনে মণ্ডিত করিয়া লইয়াছিল। তিনি সাধারণ হইতে অনেক উচ্চে অথচ সাধারণতা ও সার্ব্বজনিকতার মধ্যেই বিশেষ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া-ছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা বৃহতে ও অসীমে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গান এবং উপরের নীল অনন্ত আকাশ যেন একই। তাহা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে আকাশেরই মত উদার গভীর এবং অসীমকে মুহূর্ত্তের জন্য ধরাইয়া দিত। প্রাতঃকালের শিশির যেমন অরুণিমায় ভরিয়া উঠে, কবির গানে তেমনি তাহাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

শেষ রাত্রি হইতে বৃষ্টি নামিয়া ভোরের বেলায় বাদল বাতাস যখন উতলা হইয়া উঠিত, তখন নৌকার উপর জেলে শুনিতে পাইত কাহার আর্দ্র কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া সিক্ত আকাশ মুখরিত করিয়াছে। যখন আকাশ অন্ধকার করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঝড় উঠিত, রাখাল বালক গাভীগুলিকে নিরাপদে গৃহে লইতে পারিত না, তখন বিদ্যুতালোকে দূরে অস্পষ্ট ও কাহার মূর্ত্তি! উচ্ছৃঙ্খল কেশপাশ বাতাসে উড়িতেছে, মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে মুক্ত কণ্ঠস্বর মিশিয়া গিয়াছে। আবার যখন দিকে দিকে জ্যোৎস্না উছলিয়া পড়িত, দখিনা বাতাসে নিস্তব্ধ বনভূমি পার হইয়া তাঁহার শান্তমধুর আহ্বান-গীত পান্থ নরনারীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিত।

কবি গাহিতেন, কে কাঁদিতেছে? কার মর্ম্মরুদ্ধ বেদনা আজ আর বাধা না মানিয়া করুণ বিলাপে শ্বাসিত হইয়া উঠিতেছে? মুখের উপর ঘন মেঘের মত কেশপাশ আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে ও তাহা বাহিয়া অবনত আঁখি দুটি অঝোরে ঝরিতেছে। করুণা আজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। বুকের ভিতর যে ব্যথা যে কাতর অক্ষমতা জমাট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই কি আজ আর্ত্ত ধরণীকে তরল স্নেহে স্নান করাইয়া শীতল করিয়া দিল? উতলা বাতাসে কার অভিমান? কে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে! অশ্রু কি সময়ে ঝরে নাই—স্নেহ বিলম্ব করিয়াছে? হায় অশ্রু! বুকের ভিতর যে বেদনা জাগিয়া উঠে সে কি সকল সময়ে অশ্রুতে ধরা দেয়, সে যে গুমরিয়া গুমরিয়া সারা প্রাণকে আতুর করিয়া তোলে। আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিতেছে কিরূপে বলিব—তাহার কি ভাষা আছে? জীবনের কত ব্যথা অচেতন হইয়া আছে; যখন আকাশে মেঘ করে, বায়ু বহিতে থাকে, তখন তাহা জাগিয়া উঠিয়া ঝঞ্ঝার মত স্মৃতির

বিভক্ত যথা—মন, বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার। কিন্তু চিত্ত মনের ও অহঙ্কার বুদ্ধির অন্তর্ভূতস্বরূপ গৃহীত হওয়ায়, অন্তঃকরণ মন ও বুদ্ধি এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ শক্তির সমষ্টিরূপ লিঙ্গদেহও যখন পাঞ্চভৌতিক জড়পদার্থ, এবং আমার ইচ্ছা দ্বারাই যখন উহারা পরিচালিত বা প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে, তখন ঐ শক্তিগুলির মধ্যে কোনটীই যে "আমি" নহে, তাহা নিশ্চিত। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে "আমি" ঐ সকল শক্তি হইতে অবশ্যই পৃথক্ পদার্থ। এই স্থলে হয় ত তোমার এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, যখন ইন্দ্রিয়াদি শক্তিগুলি চেতনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, তখন কেমন করিয়া বলা যায় যে, উহারা অচেতন ভৌতিক পদার্থ? কিন্তু উত্তরে আমি বলিতেছি যে, প্রকৃতই উহারা ভৌতিক পদার্থ। আমার পরবর্ত্তী বাক্যে ও জীবের সুষুপ্ত্যবস্থা ব্যাখ্যার সময় কথাটা আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আপাততঃ তোমার সন্তোষার্থ শক্তিগুলির ভৌতিকত্বের দুই একটা উদাহরণও এই খানে দেখাইতেছি।

প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, জীবের খাদ্য পদার্থের অভাব ঘটিলে, স্থূলদেহের ন্যায় মনোবুদ্ধ্যাদি শক্তিগুলিও দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। আবার তৃপ্তির সহিত ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, উহারা স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়। আরও দেখা যাইতেছে যে, সিংহব্যাঘ্রাদি মাংসাহারী জীব সকল স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর হইয়া থাকে; অথচ গবাদি উদ্‌ভিদ্ ভোজির প্রকৃতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি কদর্য্য বস্তু আহার করে বলিয়া ইতর লোকের বুদ্ধি প্রায়ই স্থূল হয়। অধিক পরিমাণে লঙ্কা ব্যবহার করার নিমিত্তই বাঙ্গালদের ক্রোধাবেগ অত্যধিক হইয়া থাকে, ইত্যাদি। অতএব বুঝা গেল যে, যখন আহারীয় পদার্থের উৎকর্ষাপকর্ষ নিবন্ধন স্থূলদেহ ও তদন্তর্গত শক্তিগুলিরও উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে, তখন উহাদিগকে ভৌতিক ভিন্ন আর কি বলিব? যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

উপরে যে স্থূলদেহ ও শক্তিময় লিঙ্গদেহের কথা বলা হইল, উহারা সকলেই অচেতন জড়পদার্থ বিধায় কার্য্য করিবার সময় "আমি" উহাদের সঙ্গে না থাকিলে, কেবল উহাদের দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারে না। অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা পদার্থের যে স্বরূপজ্ঞান হয়, সে জ্ঞানের অনুভবকর্ত্তা একমাত্র "আমি" ভিন্ন আর কেহ নাই।

কেননা চেতন পদার্থ ব্যতীত অন্ধ জড়শক্তির ত কোন প্রকার বিষয়জ্ঞান হইতে পারে না।

"আমি" বা জীবাত্মার অবস্থা ৩টী মাত্র। জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্ত্যাবস্থা। জাগ্রদবস্থায় স্থূলশরীর ও তদন্তর্গত শক্তির ক্রিয়া যে ভাবে সম্পাদিত হইতেছে, তাহা ত প্রত্যক্ষই তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ; সুতরাং সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহের ক্রিয়া বন্ধ হয়; কিন্তু শক্তিময় লিঙ্গদেহের ক্রিয়া চলিতে থাকে। অর্থাৎ স্বপ্নে তুমি দেখিতেছ যে, একটা বাঘ আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করায়, তুমি ভয়ে পলাইয়া যাইতেছ। কখন কখন স্বপ্নে আপনার শিরঃচ্ছেদনও দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ স্বপ্নাবস্থাতেও ইন্দ্রিয়শক্তি ও মন আদির দ্বারা পদার্থের যে স্বরূপ জ্ঞান হয়, সে জ্ঞানেরও অনুভবকর্ত্তা একমাত্র "আমি" ভিন্ন আর কেহ নাই। কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মন, বুদ্ধি ও সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি অচেতন জড়পদার্থ মাত্র; চৈতন্য স্বরূপ "আমির" সম্বন্ধ হওয়াতেই উহারা চেতনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। ফলতঃ "আমি" সঙ্গে সঙ্গে না থাকিলে, ঐ সকল শক্তির দ্বারা স্বপ্নের কার্য্যও চলিতে পারে না।

এইবার সুষুপ্তির কথা বলিব। সুষুপ্ত্যবস্থায় (সুনিদ্রাবস্থায়) স্থূলশরীর, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং মনোবুদ্ধ্যাদি জড়শক্তির ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। তখন কেবল একা "আমি" মাত্র জাগিয়া থাকি। "আমি জাগিয়া থাকি" এ কথাটা কেন বলিতেছি, বুঝাইয়া দেই। সুনিদ্রাবস্থাটা যে, বড়ই সুখময়ী বা আনন্দময়ী অবস্থা, বোধ হয় সেপক্ষে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সে সময়ে সংসারের জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ, শোকাদির অস্তিত্ব পর্য্যন্তও থাকে না। স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয়শক্তি ও মনোবুদ্ধ্যাদি তৎকালে অচেতনবৎ কোথায় লুক্কায়িত থাকে, তাহার স্থিরতা নাই। অথচ সকলেই জানেন যে, সুনিদ্রা ভঙ্গের পর বেশ স্মরণ হয়, "আমি বড় সুখে ঘুমাইয়াছিলাম"। কিন্তু সে সময়ে যখন মনোবুদ্ধ্যাদি শক্তিগুলির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিলনা, তখন ঐ নিদ্রাসুখ ভোগটা করিল কে? অতএব নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যাইতে পারে সে সময়ে চৈতন্য স্বরূপ "আমি" জাগিয়া থাকিয়াই সুখভোগ করিয়াছিলাম। এবং সেই জন্যই নিজের অনুভূত সুখের অবস্থাটা নিদ্রাভঙ্গের পর স্মরণ করিতে পারিলাম; নতুবা পারিতামনা। কেননা অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অননুভূত পদার্থের কখনই স্মরণ হইতে পারে না। এখন পরিষ্কাররূপে বুঝা গেল যে, সুষুপ্তির

সময় "আমির" যে আনন্দময়ী অবস্থাটী ছিল, সেইটীই তাহার স্বরূপাবস্থা, অর্থাৎ সুষুপ্তির সেই আনন্দটুকুই "আমি"। কেননা আনন্দ বাদ দিলে, সে সময়ে "আমি"র আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। "আমি" আনন্দময় ত বটেই, তদ্ভিন্ন "আমি" জ্ঞানময়ও বটে। কারণ জ্ঞান না থাকিলে, ঐ আনন্দের অনুভূতি হইবে কিরূপে? আবার "আমি" চৈতন্যময়ও বটে। কেননা একমাত্র "আমি"ই ত এই স্থূলদেহ ও তদন্তর্গত শক্তিগুলিকে চেতন করিয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্ববর্ণিত সমস্ত কথাগুলির সারোদ্ধার করিলে, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, "আমি" আনন্দ-স্বরূপ ও জ্ঞান-স্বরূপ চৈতন্য পদার্থ। "আমি" এই শরীরের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, গুণ ও বৃত্তির দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী। "আমি" নিত্য ও জন্ম মৃত্যু রহিত। শরীর আমাতে প্রকাশ পাইতেছে। অতএব কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ এই জড়দেহ তদন্তর্গত জড়শক্তিগুলিকে "আমি" বলা কতদূর অজ্ঞানের কার্য্য, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবে।

এইবার সচ্চিদানন্দন-স্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত "আমি" বা জীবাত্মার কি সম্বন্ধ, সেটীও একবার আলোচনা করা যাইতেছে। সর্ব্বশাস্ত্রের সারাংশ নিষ্কাশন ও বেদের তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বর ও জীবে স্বরূপতঃ কোনই ভেদ নাই। বাচ্যার্থ অবলম্বন করিয়া দেখিলে, আপাততঃ উভয়ের মধ্যে ভেদ প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু লক্ষ্যার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ ভেদজ্ঞান আর থাকে না। যেমন সমুদ্র ও জলবিন্দু, যেমন মহাকাশ ও ঘটাকাশ। এই স্থলে লক্ষ্যার্থ বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে যে, সমুদ্রের রাশীকৃত জলও যে জল, জলবিন্দুর জলও সেই জল; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাকাশও যে পদার্থ, ঘটমধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র আকাশও সেই পদার্থ। ফলতঃ মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে উপহিত চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, এবং অবিদ্যা অর্থাৎ প্রকৃতির মলিন সত্ত্বাংশে উপহিত চৈতন্যই কিঞ্চিৎ-জ্ঞ, কিঞ্চিৎ-কর্ত্তা ও অল্পশক্তিমান জীব। এই স্থলে মায়া ও অবিদ্যা এই দুইটি উপাধি বাদ দিলে, উভয়ের মধ্যে কেবল চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম-চৈতন্য ও জীব-চৈতন্যে স্বরূপতঃ কোনই ভেদ নাই।

এই স্থানে তুমি বলিতে পার যে, যদি "আমি" স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের অংশ মাত্র, তবে সে জ্ঞান আমাদের সর্ব্বদা থাকে না কেন? এবং কি কারণেই

বা জীবে ও ব্রহ্মে এইরূপ পার্থক্যভাব সংসারে লক্ষিত হইতেছে? ইহার উত্তর সংক্ষেপেই নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"আমি' স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের অংশ হইলেও যথাক্রমে ৩টী আবরণে আবদ্ধ থাকায়, "জীব' সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেছি। প্রথম আবরণ এই দৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ; দ্বিতীয় আবরণ সপ্তদশশক্তির সমষ্টিরূপ লিঙ্গদেহ; ও তৃতীয় আবরণ কারণদেহ। স্থূল ও লিঙ্গদেহের বিবরণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এখন কারণদেহ কাহাকে বলে, শুন। পূর্ব্বোক্ত স্থূল ও লিঙ্গদেহের কারণস্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞানের বিরোধী যে অজ্ঞান,তাহারই নাম কারণদেহ। অর্থাৎ যে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকাতে লোকে এই অচেতন জড়দেহটাকে"আমি"জ্ঞানে নানা বেশভূষায় সাজাইতেছে; ও তাহাকে অবিনশ্বর ভাবিয়া আত্মাভিমানে ফুলিয়া আছে; এবং নিজদেহটার সুখের জন্য অন্যের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না;এ দেহটা যে নশ্বর, ও দুদিন পরে ইহা শ্মশানে নিক্ষিপ্ত ও শৃগাল কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে, ইত্যাদি কথা যে অজ্ঞান মানুষকে ভুলাইয়া দিতেছে; যে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকাতেই মানব স্ত্রী পুত্র পরিবারকে "আমার" ভাবিয়া তাহাদের সুখের জন্য আজীবন টাকা টাকা করিয়া, ভূতের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছে; অথচ নিজের হিত কিসে হইবে, তাহা ভাবিবারও অবকাশ পাইতেছে না; এবং যে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকাতে, মানব ধনৈশ্বর্য্য ও উচ্চপদ গৌরবে উন্মত্তবৎ হইয়া, ধরাকে শরা জ্ঞান করিতেছে; এবং এই ধন, এই পদ দুদিন পরে যে কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহা একবার ভাবিয়াও দেখিতেছে না, সেই অজ্ঞানের নামই কারণদেহ।

পূর্ব্বোক্ত স্থূলদেহটী গৃহের ন্যায় ভোগের আয়তন ও লিঙ্গদেহ ভোগের সাধন মাত্র। যেমন তুমি পুরাতন ছিন্নবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয় নূতন বস্ত্র পরিধান কর, তদ্রূপ জীবও এক স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় স্থূলদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। এইরূপ গমনাগমনই জীবের মরণ ও জন্ম নামে সংসারে কথিত হইতেছে। ফলতঃ জীবের জীবত্বের একমাত্র কারণই লিঙ্গদেহ। মৃত্যুর পরেও জীব লিঙ্গদেহে আবদ্ধ থাকে। কর্ম্ম জন্যই এই সমস্ত দেহের উৎপত্তি হয়। এবং সমূল কর্ম্মের নাশ হইয়া লিঙ্গদেহ ভঙ্গ হইলে জীব মুক্ত হইয়া আনন্দময় স্বরূপে অবস্থিত হয়। ইহার নামই মুক্তি। অর্থাৎ মহাকাশের কিয়দংশ মাত্র ক্ষুদ্র ঘটে আবদ্ধ থাকায়, ঘটাকাশ

নাম যে কথিত হইতেছিল, এবং সেই ঘটটী ভাঙ্গিয়া দিলেই যেমন ঘট মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশের সঙ্গে মিশিয়া যায়, সেইরূপ জীব-চৈতন্যের মুক্তি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ফলতঃ যাবৎ জীবের এই মুক্তি না হয়, তাৎকাল পর্য্যন্ত লৌকিক জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া, এই দুঃখযাতনাময় সংসারে বার বার আসা যাওয়া করিতেই হইবে।

এখন আরও একটী কথার মীমাংসা না হইলে, এই "আমি" বা জীবতত্ত্ব ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকে। অর্থাৎ "আমি" যদি প্রকৃতই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ চৈতন্য পদার্থ এবং নিজে সাংসারিক দুঃখশোকাদির ভোক্তা না হইয়া, শরীরের ধর্ম্মকর্ম্মাদির দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী মাত্র হইলাম, তবে পায়ে কাঁটা ফুটিলে, কেহ অপমান জনক বাক্য প্রয়োগ করিলে, অথবা প্রিয়পুত্রের বিয়োগ ঘটিলে, দেহের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে অসহ্য যাতনা ও দুঃখ-শোকাদি উপস্থিত হয়, এই দুঃখশোকাদি তবে কাহার হয়? এবং কি কারণেই বা ঐ দুঃখাদি "আমি ভোগ করিতেছি" এইরূপ ধারণা হয়? এই দুইটী কথার উত্তর আমি শাস্ত্রের ভাষাতেই প্রদান করিতেছি। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"বিশুদ্ধঃ স্ফটিকো যদ্ধদ্রক্ত-পুষ্প সমীপতঃ।
তত্তদ্বর্ণযুতো ভাতি বস্তুতো নাস্তি রঞ্জনা।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি সামীপ্যাদাত্ম নোঽপি তথা গতিঃ॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারো জীবস্য সহকারিণঃ।
স্বকর্ম্মবশত স্তাত ফলভোক্তার এব তে॥
সর্ব্বং বৈষয়িকং তাত সুখং বা দুঃখমেব বা।
ত এব ভুঞ্জতে নাত্মা নির্লেপঃ প্রভুরব্যয়ঃ॥"

ভগবতী গীতা।

অর্থাৎ কোন নির্ম্মল স্ফটিক পাত্রের নিকট রক্তবর্ণ পুষ্প থাকিলে, সেই রক্তপুষ্পের আভা পড়িয়া স্ফটিকপাত্রটীও যেমন রক্তবর্ণ বলিয়া ধারণা হয়, অথচ বাস্তবপক্ষে স্ফটিকে কোন রক্ততা নাই; তদ্রূপ মনোবুদ্ধ্যাদি সমীপে অবস্থান হেতু "আমি" বা জীবাত্মা নির্ম্মল হইলেও, তত্তৎ পদার্থের সম-গুণ-সম্পন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ফলতঃ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জীবের সহকারী এবং আপনাদের কৃতকর্ম্মের ফল ও সর্ব্বপ্রকার

বৈষয়িক সুখ দুঃখ তাহারাই ভোগ করে নির্লেপ ও অব্যয় প্রভু জীবাত্মা কোন ফলই ভোগ করে না।

আমার নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান অতি সামান্য, অথবা নগণ্য বলিলেও হয়; সুতরাং এই অতি কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব বিশদরূপে বুঝাইতে পারিলাম কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল। আশা করি, পাঠক একাকী নির্জ্জনে বারবার এই পত্র খানি পাঠ ও মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। ফলতঃ এই "আমি" বা জীবতত্ত্ব জ্ঞান স্থায়ী হইলে, সংসারের জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখশোকাদি জনিত ঘোর অশান্তি মানবের ত্রিসীমায় ঘেসিতে পারে না। মানব সদানন্দে বিরাজ করিতে পারে। এই জন্যই এই "আমি" তত্ত্বের অনুধ্যান হিন্দুর দৈনিক নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। প্রত্যহ প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর ও শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে, যে সকল মন্ত্র পাঠ ও ভাবনা করিতে হয়, তাহার মধ্যে এই "আমি"ত্বের অনুধ্যানসূচক নিম্ন লিখিত মন্ত্রটীও আছে, যথা—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্য-মুক্ত-স্বভাববান্॥"

মন্ত্রটীর বাক্যার্থ এই যে, "আমি দেব" অর্থাৎ দীপ্তিমান বিশুদ্ধ চৈতন-স্বরূপ। তদ্ভিন্ন "আমি" অন্য কিছু বা জড়স্বরূপ নহে। "আমি" স্বয়ংই ব্রহ্মপদার্থ; সুতরাং সাংসারিক শোকভাগীও "আমি" নহে। "আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ; অর্থাৎ সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ; সুতরাং নিত্য ও মুক্তস্বভাববিশিষ্ট। এই ক্ষুদ্র মন্ত্রটীর ভাবার্থই এতক্ষণ আমি বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিলাম। ইতি

শ্রী *

রাজসিংহের পুণ্যকীর্ত্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহামতি টড্ সাহেব রাজস্থানের রাজ্য গুলি পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন রাজসিংহের নির্ম্মিত রাজনগরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সে স্থানে রাজসিংহের অতুল্য কীর্ত্তিকলাপ সন্দর্শন করিয়া রাজসিংহের

* লেখক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক—বীঃ সঃ।

প্রশংসাগীতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রাজনগরের রাজপ্রাসাদের একটী উচ্চ প্রকোষ্ঠে বসিয়া যখন তিনি শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজির অপূর্ব্ব শৈত্যশোভা, হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রের মনোমদ রমণীয়তা, স্ফটিক-স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ বিশাল হ্রদ বক্ষের প্রশান্ত গম্ভীরতা অবলোকন করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই উদ্দাম দৃশ্যের সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া ভাবের ভরে আত্মহারা হইয়াছিলেন।

মহাত্মা টড্ সাহেব তাঁহার অমৃতময়ী ভাষায় এ স্থানের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্মার্থ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

তিনি লিখিতেছেন—

"মরি মরি কি সুন্দর দৃশ্য! উচ্চ পাহাড়খণ্ডের উপর এক অত্যুচ্চ রাজদুর্গ। তন্নিম্নে সারি সারি বৃক্ষ, তন্নিম্নে দিগন্ত বিস্তৃত হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র। তাহার নিম্নে স্ফটিকনিভ হ্রদ বক্ষ। মনে হইল, প্রকৃতির বিলাস বৈভবের এমন সুন্দর নিকেতন বুঝি আর কখন নয়নগোচর হয় নাই। মনে হইল,—এই দিগন্ত বিস্তৃত হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র মাতা বসুমতীর অঙ্গের হরিদ্বর্ণ সাটী। বৃক্ষ সারিগুলিকে মাতা যেন মেখলা স্বরূপে ধারণ করিয়াছেন। প্রস্ফুটিত কুসুম স্তবক সমূহ যেন মাতার হাস্য স্ফুরিত অধর। এবং হ্রদের প্রশান্ত স্ফটিক স্বচ্ছ বক্ষ দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন মাতা বসুমতী আপনার বিলাস বৈভব ও হাস্য সুখ দেখিবার মানসে আপন অঙ্গে একখানি দর্পণ খুলিয়াছেন। স্থানটী যেমন নীরব, তেমনি গম্ভীর। দূরে পর্ব্বত কন্দর হইতে রজত সূত্রের ন্যায় কয়েকটী নির্ঝরিণী কুল কুল শব্দে প্রবাহিতা। মধুর কণ্ঠ বিহঙ্গগণের কাকলীর সহিত এই নির্ঝরিণী কুলের কুল কুল শব্দ মিশ্রিত হওয়াতে এই নীরব প্রদেশ বড় মনোজ্ঞ নিনাদে নিনাদিত। মানব হৃদয়ে সুধা ধারা ঢালিবার জন্য মাতা বসুমতী যেন ঐক্যতান বীণা বাদন করিতেছেন। এই নয়ন প্রীতিকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, এই শ্রবণ মনোহর শব্দ শুনিতে শুনিতে কতবার রাজসিংহের কথা মনে হইয়াছে। কতবার তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তির কথা মনে করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশে কত অশ্রু নয়ন হইতে বিগলিত হইয়াছে।"

এমন পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্র উজ্জ্বল কীর্ত্তি জগতে আর কি আছে? যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন রাজ সিংহের এই পুণ্য-কীর্ত্তির কথা প্রকৃতির জ্বলদক্ষরে লিখিত থাকিবে। এ স্মৃতি কত পবিত্র, কত উজ্জ্বল, কত

পুণ্যময়! যদি ভারতবাসীর চক্ষু থাকিত, হৃদয় থাকিত, তাহা হইলে রাজসিংহের এই কীর্ত্তীস্থল মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত।

আর আমরা ভারতবাসী, আমরা সেই দেশে সেই সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা ভারতবর্ষে আজ পানীয় জলের জন্য পিপাসিত কণ্ঠে রোদন করিতেছি। এ রোদনে কে কর্ণপাত করিবে? এখন আমাদের শিক্ষা দীক্ষার দূরদর্শিতা নাই। আমাদের রাজা ও ধনি সন্তানগণ রোগ শোকের বাহুল্য দেখিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া রোগী-নিবাস, ঔষধালয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু যাহাতে রোগ শোকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এরূপ উপায় অবলম্বনে আমাদের রাজা ও ধনিগণ একেবারে পশ্চাৎপদ। রোগী-নিবাস ও ঔষধালয়ের জন্য মাসিক যে অজস্র টাকা ব্যয় হয়, তাহার কিয়দংশ পরিমাণ যদি বৎসরে একবার মাত্র ব্যয় করিয়া বিশুদ্ধ পানীয়ের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে রোগী-নিবাস কিংবা ঔষধালয়ের জন্য এত অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে হয় না।

পূর্ব্বে দৈব বিড়ম্বনা উপস্থিত হইলে, রাজার সহানুভূতি হইতে প্রজাপুঞ্জ বঞ্চিত হইত না। রাজ সহানুভূতি তখন শাস্ত্রীয় অনুশাসন ছিল। এখন সে কাল গিয়াছে। প্রজা লইয়া রাজার রাজ্য, প্রজার সুখে রাজার সুখ, এ কথা যখন আমাদের ইংরাজরাজ হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রজাবর্গের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন, তখন ভারতে আবার সেইরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইবে। ভারত আবার সেইরূপ আনন্দের তরঙ্গে দুলিতে থাকিবে।

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ।

মনের ত্রিগুণ।

(১)

নানাবিধ ভাবের সমষ্টিকে "গুণ" বলে। মানুষের নানাভাব যথা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, দয়া, মায়া ইত্যাদি। ইহার মধ্যে রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতির কার্য্যে ইতরবিশেষ থাকিলেও উহারা যে এক ভাবের অর্থাৎ "এক ক্ল্যাশের" দ্রব্য তাহাতে কোন সন্দেহ আছে কি? অতএব উহাদের সমষ্টি "এক গুণ"। এই গুণকে "তমোগুণ" বলে। সেইরূপ মানুষের দয়া, মায়া,

স্নেহ, প্রেম ইত্যাদি ভাবগুলিতে প্রকার ভেদ থাকিলেও উহারা "এক বৃত্তি" বিশেষ। এইজন্য উহাদের সমষ্টিকে "সত্ব" গুণ কহে।

জলরেণু সংগ্রহানুসারেই জলাশয়ের নাম। সকল জলাশয়েই জলরেণু আছে। তবে সরোবর অপেক্ষা গঙ্গায় অধিক জল আছে বলিয়া, গঙ্গাকে সরোবর বলা হয় না, অথবা গঙ্গা অপেক্ষা সমুদ্রে অধিক জল আছে বলিয়া গঙ্গাকে সমুদ্র বলা হয় না। নচেৎ জল সবগুলিতেই আছে, কূপে আছে, নর্দ্দমায় আছে, গঙ্গায় আছে, পুকুরে আছে এবং সমুদ্রেও আছে। সেইরূপ "ত্রিগুণ" সকলের ভিতর আছে, তবে যে জীবের ভিতর উক্ত ত্রিগুণের যে গুণটি অধিক আছে, সেই জীবকে "সেই গুণে গুণী" বলা হয়। মানুষ, সবাই—মানুষ এক অদ্বিতীয়! এই মানুষ বিচারাসনে বসিলে, তাঁহাকে "বিচারক" বলে, মদ খাইলে, সেই মানুষকে মাতাল বলে, আবার মাতাল যদি চুরি করে, তবে সে "চোর" উপাধি প্রাপ্ত হয়। সংসারে কর্ম্মানুসারেই "উপাধি লাভ।" সেইরূপ মানুষের "ভাবানুসারেই" গুণ। আবার বলি, বাঁশীর A. B. C. ফ্ল্যাটের ভিতর প্রত্যেক ফ্ল্যাটে কিন্তু সা, রি, গা, মা, প্রভৃতি সুর থাকে। অর্থাৎ আমাদের ত্রিগুণ যথা, সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন ভাবের প্রত্যেক ফ্ল্যাটে অর্থাৎ প্রত্যেক ভাবের ভিতর নানাবিধ ভাব আছে,—এমন কি তমের ভিতর সত্ব আছে, তাহাকে "তমের সত্ব" বলে। এ সকল বিষয় একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝা যাউক।

ভাব কি? উপলব্ধি গ্রহণকে ভাব বলে। যেমন কন্যার মুখ চুম্বন করিলে এবং স্ত্রীর মুখচুম্বন করিলে মনে গিয়া দুই বুঝায়, অতএব উহা বুঝাই ভাব। প্রকৃতির ভিতরেও ভাব আছে। সময়ের ছয়টা ঋতুই কালের ছয়টা ভাব। আমাদের যে দ্রব্যের উপলব্ধি আছে, তাহারই ভাব আছে। শ্বাস যন্ত্রের বায়ুর গমনাগমনের যেমন দুই নাম, যথা নিশ্বাস এবং প্রশ্বাস, সেইরূপ স্নায়ুকেন্দ্রের ক্রীড়ার গমনাগমন যথা, গ্রহণ এবং ত্যাগ এই দুই কার্য্যের দুই নাম। স্নায়ুর গ্রহণ ভাবকে উপলব্ধি এবং ত্যাগ ভাবকে রিপু বলা হয়। আমাদের ভিতর হইতে যখন উহা নির্গত হইয়া যায়, তখন উহা রিপু যথা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য। এই সমুদয় রিপুগুলি বিশ্লেষণ করিলে, আমরা সেই পূর্ব্বের দয়া, মায়া, প্রেম, স্ফূর্ত্তি, আমোদ, প্রমোদ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতির রেণু পাইব মাত্র। বস্তুতঃ এই সকল প্রবৃত্তি গুলির "সারকেই" কাম, ক্রোধ, লোভ

প্রভৃতি বৃত্তি কহে। আবার কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি বাছাই করিয়া তিন ভাগ করা হইয়াছে; তাহাকেই ত্রিগুণ বলে।

দেশ কাল পাত্রানুসারেই উপলব্ধি স্বতন্ত্র হয়। এক প্রবৃত্তি পাত্রানুসারে বহুবিধ হয়। যেমন "ভালবাসা" প্রবৃত্তিটি পুত্রে থাকিলে স্নেহ; পিতায় থাকিলে শ্রদ্ধা, এবং স্ত্রীতে থাকিলে "পিরিত" নাম প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ শ্রদ্ধা, স্নেহ এবং প্রেম এক প্রবৃত্তি হইলেও উহাদের উপলব্ধি কিন্তু তিনটা নয় কি? তাই বটে, ভালবাসার বৃদ্ধ উপলব্ধি অর্থাৎ ভালবাসার উচ্চ-ভাবকে "শ্রদ্ধা" বলে। আবার ভালবাসার শিশু উপলব্ধি অর্থাৎ কোমল ভাবকে "স্নেহ" কহে। ভালবাসার "সমানে সমান" উপলব্ধিকে "প্রেম" বলে। এইরূপ, কৃতজ্ঞতা, আশীর্ব্বাদ এবং কর্ত্তব্যতা ভাবগুলি দয়া প্রবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য মাত্র। এইরূপ, সমুদয় প্রবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের নাম আছে। এই সকল ভাব যে যন্ত্রের খেলা করে, তাহাকে "মন" বলে।

মন কি? জড়ের নিরাকার অংশের নাম মন। মনের মীমাংসা অনেকে অনেক প্রকার করিয়াছেন, কেহ মনকে বায়ু বলিয়াছেন, কেহ বা স্নায়ু বলিয়াছেন, কেহ বা "হার্ট" বা হৃৎপিণ্ডকে মন বলিয়াছেন, বেদান্ত লিঙ্গশরীরকে মন বলিয়াছেন।

শবচ্ছেদ করিয়া মস্তিষ্ক দর্শন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; কারণ তাহা দ্বারা মস্তিষ্কের কার্য্য দেখা যায় না, এইজন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সময়ে সময়ে নিকৃষ্ট পশুদিগের জীবিতাবস্থায় মস্তিষ্কের ছাল বা চর্ম্মাবরণ ছাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাহাতেও "মন" দেখা হয় নাই। তাঁহারা বলেন, মস্তিষ্ক কর্ত্তন করিলে দুই প্রকার কোমল পদার্থ পাওয়া যায়, এক প্রকার হরিদ্রা বর্ণ, ইহা বাহিরে থাকে, আর এক প্রকার শ্বেত বর্ণ পদার্থ, ইহা মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিক প্রদেশে থাকে। পরন্তু মস্তিষ্কের পাণ্ডুবর্ণ বিশিষ্ট অংশকে বুদ্ধি বা জ্ঞানের স্থান বলা হইয়াছে। তাহার পর এই মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ুর উৎপত্তি। স্নায়ু দুই প্রকার। মোটার স্নায়ু (Motor Nerve) দ্বারা সঞ্চালন ক্রিয়া সাধিত হয়, এবং সেন্সরি স্নায়ু (Sensory Nerve) দ্বারা স্পর্শ শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ মতের প্রতিবাদ দেখা যায়। স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক যদি মন হইল, তাহা হইলে নিদ্রাবস্থায় উহারাত থাকে; তখন উহাদের দ্বারা মনের কার্য্য হয় না কেন? অতএব মন স্বতন্ত্র দ্রব্য।

পথে ধাবিত হইল। বালক ভাবিলেন 'সত্যই ত ইহার শরীর ও তো শরীর, ইহার শরীরে ও তো লাগে।' বালক যেন কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে সেই ঘোড়ার জায়গায় অনুভব করিলেন। সেই দিন হইতেই তাঁহার জীবনে এক পরিবর্ত্তন হইল। ইহার পর তিনি জীবজন্তুগণের প্রতিও অত্যন্ত করুণার চক্ষে চাহিতেন।

লিও টলষ্টয় বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিলেন না। তিনি ভাল করিয়া অন্যান্য বালকের মত পড়াশুনা করিতে কখন ইচ্ছা ও করেন নাই, চেষ্টা ও করেন নাই। তবে তাঁহাদের ফরাসীদেশীয় গৃহ শিক্ষক, বালকের প্রতিভা প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তিনি বলিতেন, 'এই বালকের অতি সুন্দর মাথা আছে—এ একটি ছোট খাটো 'মলিয়ার।'*

টলষ্টয়ের পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি কোর্টঅব্ওয়ার্ডের হস্তে ন্যস্ত হইল। পারিবারিক আয় কমিয়া গেল। সকলের পক্ষে আর সহরে থাকা সম্ভব নয়, কাজেই জ্যেষ্ঠ দুই জন লেখা পড়া শিখিবার জন্য মস্কোনগরে রহিলেন, অবশিষ্ট বালক বালিকাগণ গ্রামে গমন করিলেন। মস্কোনগরে 'টলষ্টয়'এর এক পিসিমাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিভাবকতা করিতেন। 'টলষ্টয়'এর এই পিসিমাতা অত্যন্ত ধর্ম্ম পরায়ণা ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মভাব 'টলষ্টয়'এর চিন্তারাজ্যে একটা বিশেষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

১৮৩৭—গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন।

১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে টলষ্টয়ের এই পিসিমাতার মৃত্যু হয়; তখন বালক বালিকাগণ তাহাদের অপর পিসিমাতার অভিভাবকতার অধীন হইলেন। এই অভিভাবকতার পরিবর্ত্তন বশতঃ 'টলষ্টয়'দিগের পরিবার কাজাননগরে স্থানান্তরিত হইল।

অতি বাল্যকাল হইতেই লিও টলষ্টয় মনে মনে কিরূপ জটিল দার্শনিক বিষয় সমূহের আলোচনা করিতেন তাহা চিন্তা করিলে ও বিস্মিত হইতে হয়। শৈশব, (Boyhood) নামক স্বপ্রণীত গ্রন্থ বিশেষে তিনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এইরূপ :—

শৈশব দার্শনিকতা।

"শৈশবে এক সময়ে আমার মনে এইরূপ ভাবনার উদয় হইল, যে বাহিরের কারণের উপর সুখ নির্ভর করেনা, বাহিরের বস্তুর সহিত আমাদের চিত্তের যে সম্বন্ধ, সুখ তাহারই উপর নির্ভর করে। চিরদিন যে লোক, দুঃখ সহ্য করিয়া

* বিখ্যাত ফরাসী নাটককার।

আসিতেছে সে যে অসুখী তাহা বলা যায় না। অতএব কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যাস করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই রূপ চিন্তা করিয়া আমি হাত লম্বা করিয়া একখানি বৃহৎ অভিধান পাঁচ মিনিট কাল ধরিয়া থাকিতাম। তাহাতে ভয়ানক কষ্ট হইত। কখন কখন এক নির্জ্জন ঘরে গিয়া নিজের পিঠে সপাসপ চাবুক মারিতাম, তাহাতে এত লাগিত যে চোখ দিয়া জল বাহির হইত।

"এক এক সময়ে আমার মনে হইত যে মৃত্যুত সব সময়েই হইতে পারে। মৃত্যুর কিছুই স্থিরতা নাই। কথাটা ভাবিবামাত্র আমি অবাক হইয়া যাইতাম, মনে হইত পৃথিবীর লোক এত দিন এই অতি সাধারণ কথাটা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সেই দিন আমি স্থির করিলাম যে যদি ভবিষ্যতের ভাবনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া মানুষ বর্ত্তমানের সুখ উপভোগ করিতে পারে,, কেবলমাত্র তাহা হইলে সে সুখের স্বাদ পাইতে পারে। এই রূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ায় পর আমি তিন দিন কাল আর পড়া শুনা কিছুই করিলাম না, বিছানায় শুইয়া শুইয়া কেবল উপন্যাস পড়িতে আর মধু ও শুঁটের গুঁড়ি দেওয়া রুটি (Honey-ginger-breads) খাইয়া আরাম করিতে লাগিলাম।

"এই সব চিন্তার মধ্যে সংশয়বাদের চিন্তার প্রভাব আমার জীবনের উপর যত বেশী হইয়াছিল তেমন আর কিছুই হয় নাই। এই ভাবনায় আমি একরূপ পাগল হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি কল্পনা করিতে লাগিলাম যে আমি ছাড়া জগতে আর কোন মানুষ নাই, কোন পদার্থ নাই; যাহা কিছু দেখা যাইতেছে সব ছায়া, মায়ার বিভ্রম মাত্র, যখন আমি তাহাদের দিকে মনোযোগ দিই তখনই তাহারা থাকে, অন্য সময় আর তাহারা থাকে না। জগতে যাহা আছে বলিতেছি তাহা সত্যই পদার্থ নহে আমার মনের বিলাস মাত্র। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সময়ে সময়ে এমন হইয়া পড়িতাম যে, একদিকে তাকাইতে তাকাইতে হঠাৎ অন্য দিকে তাকাইতাম, মনে হইত যে এই প্রকার করিতে করিতে 'কিছুই না' বলিয়া যে জিনিস তাহাকে একদিন ধরিয়া ফেলিব।

এই প্রকারে ভাবিয়া ভাবিয়া আমি অনেক তত্ত্ব ও অনেক সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলাম। এই সব সিদ্ধান্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে খুব অহঙ্কার হইত, মনে করিতাম আমি একজন খুব জ্ঞানী লোক; এমন সব দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছি যে তাহার দ্বারা মানব জাতির খুব উপকার হইবে। অন্যান্য লোকের প্রতি চাহিয়া মনে হইত, ইহারা অতি মূর্খ কিছুই জানেনা, কিছুই বোঝে না। ইহাদের অপেক্ষা আমি অনেকগুণে উচ্চ। আপনার মনে

করিবার জন্যই সময়ে সময়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়। তাঁহার অবির্ভাব হইলেই অবতারের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভগবানের দিকে ষোল আনা মন দিয়া, বিষয় কার্য্য আভাস মনে করিলে, যথার্থই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; পরমহংসদেব বলিতেন, লোকে ভগবানকে পায় না কেন? ষোল আনা মন দিয়া তাঁহাকে ডাকা হয় না বলিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার নিকট ষোল আনা মন থাকে, পরে সে যত বড় হয়, ততই সে মনের খরচ করিতে থাকে, তখন সে দুই আনা মন সমাজের ভালবাসায়, এক পয়সা মন দেশহিতে, অর্দ্ধ আনা মন শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষায়, এক পয়সা মন দান ধ্যানে, এক আনা মন পুত্র কন্যা পালনে, এবং চারি আনা মন অর্থার্জ্জনে বাকী ছয় আনা মন স্ত্রীর শ্রীপাদপদ্মে বন্দক রাখিয়া, নিজের ষোল আনা মন হারাইয়া, স্ত্রীর নিকট হইতে সেই বন্ধকী মনের ব্যাজ খায়! অর্থাৎ স্ত্রী যাহা বলে, তাই করে। অতএব ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে, ভগবানকে ডাকিবে, কিন্তু তোমার মন কোথা তাহা অগ্রে দেখ। উৎকৃষ্ট সংসারীর মনের জমা খরচ ঐরূপে হয়, আবার কোন কোন সংসারী শুড়িবাড়ী অর্দ্ধেক মন এবং অর্দ্ধেক মন বেশ্যাবাড়ী বন্ধক রাখিয়া, নিজে শূন্য মনে অসভ্য জানোয়ার বিশেষ হইয়া সংসারে বাস করে। যদি তাঁহাকে পাইতে চাও, অগ্রে ছড়ান ষোল আনা মন আদায় করিয়া এক স্থানে কর, তৎপরে সেই মন দিয়া শ্রীভগবানকে ডাক, নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাইবে। ভাবের ঘরের চুরি একটি গল্প দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

কোন দেশে এক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী এক শিবালয়ে বাস করিতেন। সাধুর অনেক শিষ্য ছিল, অনেক রাজাও তাঁহার শিষ্য ছিলেন এমন কি অনেক দেশের রাজা পর্য্যন্ত তাঁহার পদসেবা করিতেন। সেই শিবালয়ের সম্মুখে এক বেশ্যা বাস করিত। সাধু সর্ব্বদাই বেশ্যাকে ধর্ম্ম কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবার উপদেশ দিতেন। বেশ্যা তাহা অগ্রাহ্য করিত, কিছুই বলিত না। সাধু তদ্দর্শনে একদিন অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল "দেখ্ পাপিনি, তুই পাপ করিতেছিস্, তজ্জন্য অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবি! এখনো বুঝিয়া চল, সৎসঙ্গ এবং সাধুসেবা কর, নচেৎ তোর নিস্তার নাই।" বেশ্যা শুনিয়াও শুনিল না। ইহাতে সাধুর আরো রাগ হইল, বেশ্যাকে সৎপথে আনিবার ঝোক পড়িয়া গেল। এই জন্য তিনি প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া বেশ্যার ঘরে যতগুলি উপপতি প্রবেশ

করিত, সাধু ততগুলি ইষ্টক বেশ্যার দ্বারে রাখিয়া আসিতেন। কালক্রমে তথায় স্তূপাকার ইষ্টকরাশি হইল। এমন সময় একদিন বেশ্যা স্নান করিয়া গৃহে যাইতেছিল, সাধু বেশ্যাকে দেখিয়া বলিল, "শোন্ পাপিনি! তুই যে পাপ করিতেছিস্, ঐ ইষ্টকরাশি তাহার সংখ্যা দিতেছে।" বেশ্যা চলিয়া গেল। সাধুর রাগ আরো বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সাধু এবং সেই বেশ্যার কলেরা রোগে এক দিনে মৃত্যু ঘটিল। যখন উহাদের সূক্ষ্ম শরীর দেহ-খাঁচা ছাড়িয়া শূন্য পথে দাঁড়াইল, তখন দেখা গেল, দুই খানি রথ একখানি বিষ্ণুলোক এবং অপরখানি যমলোক হইতে তথায় আসিল, বিষ্ণুলোকের রথখানি অগ্রসর হইয়া আসিল, বিষ্ণুদূতেরা উহা হইতে অবতারণ করিয়া বেশ্যাকে বলিল, "মা! আপনি এই রথে আসুন।" ইহা দেখিয়া, সাধু বলিল, "নাহে না, তোমরা ভুল কর কেন? উহার রথ ঐ যমালয় হইতে আসিতেছে। ওযে বেশ্যা। গোলকে যাইবার উহার অধিকার কি? আমি সাধু; আমিই গোলকে যাইবার অধিকারী, অতএব উক্ত রথে আমি যাইব বলিয়া, শ্রীনারায়ণ দেব পাঠাইয়াছেন। তোমরা ভুল করিওনা।"

ইহা শুনিয়া বিষ্ণুদূতেরা বলিল, "মহাশয়! আমাদের ভুল হয় নাই। ঐ স্ত্রীলোক গোলকে যাইবে, ইহাই প্রভুর আদেশ। এবং আপনার জন্য যমালয়ের রথ ঐ আসিতেছে।"

সাধু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ইহার কারণ কি!" বিষ্ণুদূতেরা বলিল, "ইহার কারণ কিছু আমরা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি, আপনি আমাদের কথায় দুঃখিত হইবেন না।"

সাধু আগ্রহের সহিত বলিলেন, "বলত বাপু! আমি শুনি।" একজন বিষ্ণুদূত বলিতে লাগিল, "মহাশয়! গোলকে জড়দেহের বিচার হয় না। তথায় সূক্ষ্মদেহমনের বিচার হইয়া থাকে। আপনি বাহ্যিক আড়ম্বর করিয়াছেন। সন্ন্যাসের ভেক লইয়া, লোকের নিকট গণ্য মান্য হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কল্পতরু শ্রীভগবান সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। বেশ্যা স্থূলদেহে যদিও বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছে বটে, কিন্তু উহার মনে সর্ব্বদাই ভগবান বিরাজিত ছিলেন, এক দিনের জন্য, এক মূহূর্ত্তের জন্য উনি ভগবানকে মন হইতে নড়ান নাই। বেশ্যার এক এক দিনের উপাসনা শুনিলে, পাষাণ-ফাটিয়া জল বাহির হইত। উনি সর্ব্বদাই নারায়ণকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন, "স্বামিন্ আমি পাপিনী হইয়াছি কাহার নিকট? এই

সংসার-ধর্ম্মের নিকট, এই লোকাচার সমাজের নিকট এই ছেলেদের খেলা ঘরের খেলানীতির নিকট আমি পাপিনী সাপিনী সাজিয়াছি! কিন্তু তুমি পাপ পুণ্যের অতীত; তুমি নারকী এবং পুণ্যবানের ত্রাণকর্ত্তা, তোমার নিকট যেন পতিত না হই। এ সংসারের কুল খাইয়াছি, যেন তোমার না খাই। নাথ! উপায় রহিত, এখন যে পথে দাঁড়াইয়াছি এখন কে আমাকে আর কূলে লইয়া কুল দিবে? কে আমাকে খাইতে দিবে? কাজেই উদরের জন্য আমাকে এ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তজ্জন্য সমাজ আমাকে ক্ষমা না করিলেও আপনি কি ক্ষমা করিবেন না? আপনি কি পুণ্যবানের ঠাকুর, পাপিনীর ঠাকুর নহেন? তবে ঐ পতিতোদ্ধার নাম পাইয়াছেন কেন দেব? দয়া ক'রে, আমায় দয়া কর। আমার স্বামী নাই, জগৎস্বামী তুমিই আমার স্বামী। এস নাথ! আমি তোমায় এই ফুলের মালা দিয়া সাজাই! এস কাছে এস, তোমার সঙ্গে দু'টো কথা কহি।" আহা! বেশ্যার এইরূপ উপাসনায় দিন অতিবাহিত হইত। আর, আপনি জটা জুট রাখিয়া, দেহে ভস্ম লেপন করিয়া, সাধন, ভজন কি করিয়াছেন? সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, বেশ্যার ঘরে যদি একটা ইন্দুর নড়িয়া থাকে, আপনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া, উহার দ্বারে ইষ্টক রাখিয়া আসিয়াছেন। এইত আপনার ধ্যান ধারণা মন্ত্র উপাসনা। অতএব আপনি বিচার করুন দেখি, কাহার স্বর্গে যাওয়া উচিত? তবে স্থূলদেহের বিচার সম্বন্ধে বলিতে পারেন, আপনার দেহটি পবিত্র করিয়াছিলেন বলিয়া, অনেক শিষ্য পাইয়াছিলেন, ঐ দেখুন, তাঁহারা মিলিত হইয়া আপনার পবিত্র দেহকে পুষ্প চন্দন দিয়া জাহ্নবী সলিলে নিক্ষেপ করিতেছে। বেশ্যার অপবিত্র দেহ দেখুন, গৃহ মধ্যে থাকিয়া পচিয়া উঠিয়াছে এবং শৃগাল কুকুরে উহা ভক্ষণ করিতেছে। জড় দেহের বিচার তথায় হইতেছে। এখন চৈতন্য দেহের বিচার হইবে, কাজেই বেশ্যা গোলকে যাইবে এবং আপনাকে নরকে যাইতে হইবে।" ইহাকেই বলে ভাবের ঘরের চোর। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যে,—

সূক্ষ্ম দেহ কি? এ সম্বন্ধে পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ পঞ্চ কৈর্মন সাধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গ মুচ্যতে॥

অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়, গ্রহণেন্দ্রিয়, গমনেন্দ্রিয়, বিসর্গেন্দ্রিয় এবং জননেন্দ্রিয়) ও পঞ্চপ্রাণ (অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান উদান ও ব্যান) ও মন এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সূক্ষ্মাবস্থার সমষ্টির নাম "সূক্ষ্মশরীর।"

ইহাতেও কেহ কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলেন, এই সপ্তদশ অবয়ব অতিরিক্ত ভাবে ধরা হইয়াছে, যেমন স্পর্শেন্দ্রিয় এবং গ্রহণেন্দ্রিয় দুইবার ধরা হইয়াছে, বস্তুতঃ উহাদের প্রভেদ কি? রসনেন্দ্রিয়ে এবং বাগিন্দ্রিয়ে প্রভেদ কি? মন এবং প্রাণ দুইবার ধরিয়াও তবু ক্ষান্ত নাই, আবার বুদ্ধিকেও ইন্দ্রিয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। স্নায়ুর কার্য্য জ্ঞান বা বুদ্ধি; বুদ্ধি যদি ইন্দ্রিয় হইল, তাহা হইলে জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য পুত্র কন্যা উৎপাদন, অতএব পুত্র কন্যাকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরা হয় নাই কেন? আয়ুর্ব্বেদ মতে উদরে বায়ু উৎপন্ন হইয়া রোগের সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য ডাক্তারেরা যেমন "বাসিলাস" রোগের নিদান ধরিয়াছেন, ইহারা সেইরূপ বায়ুকেই রোগের নিদান জানিয়াছেন। এই জন্য ইহাঁদের মতে স্নায়ুর ভিতর উন পঞ্চাশ বায়ু আছে। আভ্যন্তরিক সমুদয় যন্ত্রেই বায়ু আছে। কিন্তু এখানে পাঁচটি বায়ুর নাম করা (অর্থাৎ প্রাণ, আপান, সমান, উদান এবং ব্যান) হইয়াছে। বাকী ৪৯ বায়ু কোথায় গেল? ঐ সপ্তদশ ইন্দ্রিয়ের কথা যাহা বলা হইয়াছে, উহার ভিতর এনাটমি খানি প্রায় সংক্ষিপ্ত ভাবে এক নিশ্বাসে বলা হইয়াছে। উহাতে হস্ত (গ্রহণেন্দ্রিয়) আছে, পদ (গমনেন্দ্রিয়) আছে, নাসিকা (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) আছে, জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়) আছে; এই রূপে কর্ণ আছে, চক্ষু আছে, চর্ম্ম (স্পর্শেন্দ্রিয়) আছে; মোক্ষ (বিসর্গেন্দ্রিয়) আছে। স্নায়ু (বুদ্ধি) আছে। বাকী কেবল উদর এবং ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি নাই কেন? পরন্তু রসনেন্দ্রিয়কে জিহ্বা ধরিয়া বাগিন্দ্রিয়কে না হয় কণ্ঠ ধরিলাম, তাহা হইলেও ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে নাসিকা ধরিয়া তাহার নিম্নে লেরিঙ্গস্‌কে ধরা হয় নাই কেন? ইত্যাকার অনেক প্রতিবাদ শুনা যায়। ফলে সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলির "কর্ম্ম শক্তির" সমষ্টি নাম "সূক্ষ্ম শরীর।" ইহা বুঝিলেই যথেষ্ট হয়। কথায় যত সূক্ষ্মভাব ধরিবে, ততই সূক্ষ্ম হইয়া নিরাকার ভাব সাগরে তাহার অস্তিত্ব লোপ হইয়া, জ্ঞানের অতীত স্থানে চলিয়া যাইবে। সম্ভব মত কথাকে সূক্ষ্ম করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। বৈষ্ণবে যেমন পাঁটা এবং কাটা শুনিলে রাগ করেন, ব্রাহ্মেরা যেমন কালী,

দুর্গা শুনিলে, কুসংস্কারাপন্ন পৌত্তলিক বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন; সেইরূপ আমার এক বন্ধু "সূক্ষ্মদেহ" চিন্তা করিয়া দুগ্ধ পান ত্যাগ করিয়াছেন, কারণ তিনি বলেন, উহা হিন্দুর অখাদ্য, কারণ গরুর সূক্ষ্ম দেহ দুগ্ধ! পরন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যেমন রক্তের রূপান্তর চুল এবং নখ, সেইরূপ দুগ্ধও রক্তের রূপান্তর। অতএব গো-রক্তের রূপান্তর যে গো-দুগ্ধ, ইহা পান করা কখনই উচিত নহে। এই বন্ধুকে কত লোকে কত কথা বলিয়া বুঝাইয়াছে, কেহ বলিয়াছে "তুমি যখন জরায়ুর ভিতর ছিলে, তখন রক্ত-পিপাসু রাক্ষস হইয়া মাতৃরক্ত পান করিয়া মানুষ হইয়াছিলে, সংসারে আসিয়াও মাতৃরক্তের রূপান্তর স্তনদুগ্ধ শিশুকালে কত খাইয়াছ, তবে মানুষ হইয়াছ; আর এখন তুমি দুধের নাম শুনিলে কানে আঙ্গুল দাও কেন? অভাবে এবং স্বভাবে মানুষের মতি বিভিন্ন হয়। যাহার যাহা নাই, সে উহাতে ঘৃণা করিয়া, মনকে তুলিয়া ধরে, নচেৎ মন যে আছাড় খাইয়া মরে! এইজন্য বড় লোকের নিন্দা, দরিদ্রেরা প্রায়ই করিয়া থাকে, সবলের নিন্দা দুর্ব্বলে করে; পণ্ডিতের নিন্দা মূর্খে করে, কিন্তু তোমার দুধ ক্রয় করিবার অর্থের অভাব নাই যে, দুধের নিন্দা করিবে, অতএব তোমার স্বভাবে যে বিচিত্র জ্ঞান জন্মিয়াছে, ইহা ছাড়।" বন্ধু বলেন, "ইক্ষুর সূক্ষ্ম শরীর চিনি। ভাতের সূক্ষ্ম শীরর ফেন।" ফলে একমাত্র মন আমাদের সূক্ষ্ম দেহ। এই দেহ ইচ্ছা করিলে, ট্রেণের অগ্রে, বাতাসের অগ্রে এই মূহূর্ত্তে কাশী গিয়া যেন মণিকর্ণিকার ঘাটে বসিয়া আছে। এই সূক্ষ্ম দেহ স্বর্গে গিয়া কখন তারকার আবিষ্কার করিতেছে, এক নক্ষত্র হইতে অপর নক্ষত্রে লাফ দিতেছে। কখন চন্দ্রলোকে গিয়া তথায় প্রবল শৈত্য—কেবল পর্ব্বত এবং সমুদ্রময় বলিয়া চন্দ্রলোকে মানুষ নাই, দেখিয়া তথা হইতে মর্ত্তে আসিয়া, কখন বায়ুর ভিতর, কখন স্নায়ুর ভিতর মিলিত হইয়া যাইতেছে, কখন বা পাতালপুরে গমন করিয়া ধাতুর খনি, কয়লার খনি আবিষ্কার করিতেছে। আবার, দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়াও একবার এ যন্ত্রে একবার ও যন্ত্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে অর্থাৎ কখন মস্তিষ্কে, কখন হৃৎপিণ্ডে বা ফুস্‌ফুসে কখন বা অন্ত্র প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতেছে। মন যখন নাভির নিম্নে গমন করে, তখন "কাম" অর্থাৎ কামনা বা বাসনা বলবতী হয়, এই স্থানেই "তমো গুণের" কার্য্য হয়। তৎপরে মন যখন বক্ষের উপর থাকে, তখন মানুষের এই ভাব হয়, যথা

আমি করিলাম কি? এই স্থানে মন থাকিলে মানুষ হতাশ হয়! ইহা রজোগুণের স্থান। তৎপরে মন মস্তিষ্কে উঠিলে, আর কিছুই থাকে না, এই স্থান শান্তি নিকেতন বা নিদ্রা। ইহা স্বত্ত্বঃগুণের স্থান। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

সাধ।

যে বনে হরিণী থাকে একাকিনী
হিংস্র ব্যাধ, ব্যাধি না পশে যায়
লতা সুকোমল নব দুর্ব্বাদল
মনের সোহাগে ছিঁড়িয়ে খায়;
যে নদীর তটে একা ফুল ফুটে
প্রভাত সমীর বিলায় বাস
মত্ত মধুকর পায় না খবর
কোথা কোন্ ফুল হলো প্রকাশ;
যে বনের পাখী কভু নয় দুখী,
সুমধুর ফলে ফিরে না চায়
যে শান্তি কাননে সদা নিশিদিনে
ফুলে ফলে দুলে মহিমা গায়;
যে প্রস্তর পাশে মানব না আসে
যে পথে বহেনা পাপের চল
যে পুলিনে বসে প্রাণের হুতাশে
বিরহী ফেলেনি নয়ন জল;
যে বিজন বনে যে সুখ কাননে
নাই ঋতুভেদ সমানে যায়
যে বৃক্ষের মূলে বসিলে কোকিলে
কুহু কুহু রব ভুলিয়ে যায়;
যে গগনবাসী অকপট শশী
নিতি নিতি হাসে মধুর হাস
ক্ষুধায় কাতর কান্দে না চকোর
করে না ও শশী সুধার আশ;
ডুবাইতে দুখ ভাসাইতে সুখ
মায়ার তুফান যে দেশে নাই,
সেই রম্যদেশে পাগলের বেশে
একাকী পরাণে চলিয়ে যাই,
সেই তরুমূলে সেই মেঘতলে
যতনে রচিয়া প্রেমের ঘর,
সাধি এ রসনা করিতে ঘোষণা
বিরলে বসিয়ে মহিমা তাঁর।
সাধ হয় মনে, সেই সে বিজনে
গায়ে মাখি ধূলা, না দেখে কেউ
সেই নদী কূলে এ যাতনা ভুলে
বসে বসে দেখি নদীর ঢেউ;
পাগলের পারা তালমান হারা
নিজ ভালবাসা গানটি গাই,
তরঙ্গের গায়ে আঁচল পাতিয়ে
ঘুমাতে ঘুমাতে ভাসিয়ে যাই।

শ্রীমহম্মদ আজীজ উস্‌সোভান।
সিউড়ী।

গবাদি পশু ও কৃষিজাত প্রদর্শনী।

বীরভূমের অধিবাসীগণের কৃষিই প্রধান উপজীবিকা। সমগ্র অধিবাসীর তুলনায় শিল্পী নাই বলিলেই চলে। অবস্থা যখন এইরূপ, তখন বীরভূমে যাহাতে কৃষির সম্যক্ উন্নতি হয়, এ চেষ্টা আমাদের সকলেরই করা কর্ত্তব্য। স্মরণাতীত কাল হইতে কৃষকগণ যে প্রণালীতে চাষ করিয়া আসিতেছে, তাহারা সেই প্রণালীই অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, সে প্রণালীর অবনতি বই উন্নতি হইতেছে না। পূর্ব্বে সকলে চাষ করিত না। এখন তাঁতি, গোয়ালা, কলু, ছুতার, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল চাষ না করিতেছে কে? আপন আপন ব্যবসা ছাড়িয়া সকলেই কৃষিকার্য্যে মন দিয়াছে। পূর্ব্বে অপর ব্যবসায়ে কাহারও কাহারও কিছু কিছু আয় ছিল, এখন কেবল চাষের উপরই নির্ভর। সুতরাং চাষের আয় যাহাতে অধিক হয়, ইহার উপায় উদ্ভাবন আবশ্য কর্ত্তব্য।

এদিকে চাষের কথা বলিতে গেলেই কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায় গরুর কথা মনে আসে। গোবংশ একরূপ ধ্বংস পাইবার উপক্রম হইয়াছে। যে সকল স্থলে গোবৎসাদি পরম সুখে বিচরণ করিয়া তৃণাহার করিত, আজ সে সকল স্থান ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। বিদেশে রপ্তানির দরুণ চাউলের দর মহার্ঘ হওয়ায় ধান্যের আদর বৃদ্ধি হইয়াছে। আর এদিকে শিল্পাদি বিলুপ্তপ্রায়। বাধ্য হইয়া সকলকেই কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দিতে হইয়াছে। এই নিমিত্ত যেখানে যাহা কিছু পতিত জমি ছিল, সমস্তই আবাদ হইয়া যাইতেছে। এমন কি গোপথ পর্য্যন্ত ধান্য প্রসব করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহাতে জমিদারেরই বা দোষ কি, প্রজার বা দোষ কি? দোষ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার। প্রজারা না লইলেত আর জমিদার পতিত বিলি করেন না। জমিদার কিছু স্বয়ং পতিত মাঠকে জমি করেন না; প্রজারাই ত করে। আর প্রজাদের ত কোনরূপে দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতেই হইবে। সুতরাং জমি চাই। আবার জমি না পাওয়া গেলে তাহারা যে পতিত জমির উপর লোল দৃষ্টিপাত করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এইরূপে আপাততঃ প্রজা সমৃদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু তাহারা ভাবী উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ

করিতেছে। তৃণাভাবে গোকুল দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। গাভী আর তেমন দুগ্ধ দেয় না; বলদ আর তেমন পরিশ্রম করিতে পারে না। ২০ বৎসরের মধ্যে এই শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে। অনতিদূর ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এখন কিরূপে কৃষির উন্নতি হয়, অথচ গবাদি পশু সবল ও সুস্থকায় থাকে, বুদ্ধিমান স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মাদের তাহাই চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বীরভূমের তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট্ জি, ড্রেকব্রুকম্যান মহোদয়, ১৮৯৭ সালে সিউড়িতে একটি পশু ও কৃষিজাত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহা বলসঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ঐ প্রদর্শনীর কার্য্য যেরূপ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, সেরূপ আর পূর্ব্বে কখন হয় নাই। এবার যে মেলার এরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা কেবল মাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত আমেদ সাহেব ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদাস্ শোভান মহোদয়দ্বয়ের নিরতিশয় যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে। নানা স্থান হইতে পশু ও নানাবিধ কৃষিজাত দ্রব্য আনিত হইয়াছিল। দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নানা ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শিত হইয়াছিল। দলে দলে লোকে নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া মেলায় উপস্থিত হইয়াছিল। এবং প্রতিদিন বহুলোক দর্শক রূপে উপস্থিত হইয়া এই সৎকার্য্যে সহানুভূতি ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হেতমপুরাধিপতি রাজা রামরঞ্জন প্রমুখ জমিদার ও অপর ধনিবৃন্দ মেলার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

হেতমপুরের রাজা বাহাদুরের বড় বাগান নামক সুরম্য উদ্যানে এই মেলার অধিবেশন হয়। নানা জাতীয় মিষ্টান্ন দর্শকের মনোহরণ করিয়া স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। নানা কৃষিলব্ধ দ্রব্যসামগ্রী নয়নের তৃপ্তি বিধান করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত স্থাপিত রহিয়াছে। বহুসংখ্যক সুন্দর পশু পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইয়াছে। হেতমপুর ও কীর্ণাহার প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত চারিটি সুবৃহৎ হস্তী মন্থর গতিতে পরিভ্রমণ করিতেছে; বহু সুরঞ্জিত পতাকা আনন্দে পবনভরে নৃত্য করিতেছে; বনবিহারিণী কুসুমাভরণা সাঁওতাল রমণীগণ বংশী ও মাদল বাদ্য সংযোগে নৃত্য করিয়া দর্শকের মনোহরণ করিতেছে। দুই দল ব্যাণ্ড সুমধুর তানে কর্ণে অমৃত

সিঞ্চন করিতেছে। কতিপয় ইংরেজমহিলা ও সাহেব প্রদর্শনীস্থলে উপস্থিত হইয়া আগ্রহের সহিত ঐ সকল ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

প্রত্যহ প্রাতঃকাল পুরস্কার বিতরণে এবং মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হইয়াছিল।

প্রদর্শনীতে যে সকল জীবজন্তু আনীত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ৫০০ শতেরও অধিক হইবে। উহাদের মধ্যে ষাঁড়, বলদ, গাভী, মহিষ, মেষ এবং ছাগল ছিল। উহাদের জন্য পুরস্কার বিতরণে অনেক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। দূরদেশ হইতে আগত ভদ্রলোকগণ পুরস্কার পাইয়াছিলেন; কিন্তু সিউড়ীয়া অধিবাসী ভদ্রলোকগণ কেবল প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! এইরূপ নিয়ম থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা আপন আপন পশু প্রেরণ করিতে বিরত না হইয়া প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। কমিটীর দুইটী ষাঁড়, জেলের ষাঁড় এবং বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গাভী সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ কয়টী প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট পশু, এবং উহাদের প্রশংসা-পত্রও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সমস্ত পশুই পশুপ্রদর্শনীর মেম্বর বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বাবু ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে, বিনা ব্যয়ে, উৎকৃষ্ট আস্তাবলে রক্ষিত হইয়াছিল।

মেষ এবং ছাগলের সংখ্যা তত অধিক না হইলেও উহাদের মধ্যে কয়েকটী অতীব উৎকৃষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে গৃহপালিত পক্ষীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল এবং উহাদের মধ্যে নানাবিধ মোরগ, পাতিহাঁস ও রাজহংস ছিল। সভাপতি মিষ্টার আমেদ সাহেব বাহাদুর কতকগুলি পরম সুন্দর পক্ষী উপস্থিত করিয়াছিলেন। এবং উহাদের জন্য কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রশংসা-পত্র পাইয়াছিলেন। বাবু পাল দাস কর্ত্তৃক প্রদর্শিত কবুতর গুলি খুব সুন্দর ছিল। এই বিভাগে কয়েক জন সাঁওতালও প্রদর্শকরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা বড়ই সুখের বিষয় বলিতে হইবে।

কৃষি প্রদর্শনীতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ফল ও শাক সবজি আনীত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে কতকগুলির পরিমাণ ও আকৃতি অত্যন্ত অসাধারণ ছিল। বর্দ্ধমানের ডাক্তার ভাউগান সাহেব সুবৃহৎ বেগুনের জন্য পুরস্কার পাইয়াছেন। অধিকাংশ পুরস্কার স্থানীয় ডাফরিন হাসপাতালের সাহায্যার্থ লেডী বম্পাসের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। নানাবিধ উৎকৃষ্ট কপি, সালগম, গাঁজর, মটর প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। কতকগুলি আক দশফিটের অধিক লম্বা এবং দুই ইঞ্চির অধিক স্থূল হইয়াছিল। শাখায় প্রলম্বিত কতকগুলি আশু অর্দ্ধপরিপক্ক আম্র দেখিয়া দর্শকগণের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বাবু দীননাথ সোমের বাগানের কতিপয় সুবৃহৎ বেল অতীব প্রশংসার যোগ্য ছিল।

শস্য প্রদর্শনীতে নানাবিধ শস্য আনীত হইয়াছিল। অতি উৎকৃষ্ট ধান্য, চাউল, কলাই তিল এবং সরিষা প্রদর্শিত হইয়াছিল। বাবু পাল দাস শস্য প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গুটিপোকা, উহাদের ডিম্ব এবং রেশমী সূতা প্রদর্শন করিয়া রেশম শিল্পের উৎকর্ষ প্রমাণ করা হইয়াছিল। এই বিভাগে গগটিয়ার রেশম কুঠীর অধ্যক্ষ মিষ্টার ডুবয়েস্ সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি দেখাইয়াছেন যে, গুটিপোকার পীড়ার জন্য রেশম শিল্পের অনিষ্ট হইতেছে; ইনি কতকগুলি নীরোগ ও কতকগুলি রোগাক্রান্ত গুটিপোকা আদর্শস্বরূপ উপস্থিত করিয়াছিলেন। আশা করা যাইতে পারে যে, ব্যবসায়ীগণ সুস্থ পোকা সংগ্রহ করিয়া উক্ত রোগের শান্তি করিতে পারেন। এই উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে প্রদর্শনী দ্বারা প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

গুটিপোকার খোসা সিদ্ধ করিয়া সূতা প্রস্তুত করিবার প্রণালীও প্রদর্শিত হইয়াছিল। রেশম শিল্পের সামান্য যন্ত্রের উন্নতিকল্পে দর্শকগণের নিকট অতি সরল কার্য্যক্ষম যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। অতি সুন্দর তসরের কাপড় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। দেশীয় খৃষ্টান মহিলাগণও তুলা ও উল দ্বারা সুন্দর সুন্দর বস্তু প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলেন।

মুরসিদাবাদ নিবাসী বাবু রাখালচন্দ্র দুগার কর্ত্তৃক আনীত রেশমী জিনিস এবং দুষ্প্রাপ্য মণি মুক্তা দ্বারা একটী বৃহৎ গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। দুই খানি শাল বাস্তবিকই অতীব সুন্দর ছিল। উহাতে মোগল সম্রাটদিগের প্রতিমূর্ত্তি এবং তাহাদের নাম পার্শী অক্ষরে বুনান হইয়াছিল। উহাদের এক এক খানির মূল্য ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা বলিয়া উক্ত আছে।

ইলাম বাজারের গালার খেলনা, নানা প্রকার গালার ফল, দোয়াত, পক্ষী ও ফল পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষ অনেক আমদানী হইয়াছিল। ঐ গালার

খেলনার কেহই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই এবং অনেকে প্রচুর পরিমাণে খরিদ করিয়াছিলেন।

প্রদর্শিত দ্রব্যের যাহা তালিকা দেওয়া হইল, তাহা সম্পূর্ণ নহে। তবে ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, তাহাদের সংখ্যা বড় কম নয়।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ ও সিউড়ীর অন্যান্য কতিপয় প্রধান লোক প্রদর্শনীর পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সি এইচ বম্পাস, ডিঃ জজঃ; মিঃ ফরবেস, পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বেঙ্গল; এইচ এম প্যারিস, পুলিস সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট; ডবলিউ এইচ টমসন, রামপুর হাটের সবডিবিজানেল অফিসার; মিসনরী টি আর এডওয়ার্ডস; ডাঃ ভাউলান; হেতম পুরের রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

প্রথম দিবস বৈকালে সিউড়ী স্কুলের ছাত্র, পুলিস কনেষ্টবল, গ্রাম্য চৌকিদার এবং জেল প্রহরীদিগের দ্বারা নানাপ্রকার ব্যায়ামাদি দেখান হয়। ইহার মধ্যে একটি বড়ই আমোদজনক দৃশ্য হইয়াছিল অর্থাৎ চৌকীদার-গণের মাথায় জল পূর্ণ ঘড়া দিয়া ও চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া দৌড়িতে বলায় কাহারও মস্তকস্থিত জল সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া গেল, কেহ কেহ বা পরস্পর সংঘর্ষনের বিকট চিৎকার করিয়া পড়িয়া গিয়া দর্শকদের হাস্যরসের অবতারণা করিতে লাগিল। কিন্তু যখন ঐ সকল চৌকিদার নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া দর্শকদিগের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল ও তাহাদের মধ্যে একজন যেখানে ভদ্রমহিলাগণ দাড়াইয়াছিলেন, সেই স্থানটি তাহার লক্ষ্যস্থান বিবেচনা করিয়া ঘড়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল। তদনন্তর প্যারিস সাহেব ম্যাজিক লণ্টনে নানা প্রকার ক্রীড়া প্রদর্শন করান। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর কেনেডি মহোদয় সস্ত্রীক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে ঘোড় দৌড় হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কমিশনর কেনেডি সাহেবকে বিদায়-ভোজ দেন। এ উপলক্ষেও খুব ধূমধাম হইয়াছিল।

তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে হাতীর দৌড় ও গরুর গাড়ীর দৌড় হয়।

হেতমপুর, কীর্ণহার, সাহাপুর ও রাজনগর হইতে চারিটি হাতী আনীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকারের হস্তীটীই সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পর গরুর গাড়ীর দৌড়। ছয়

খানি গাড়ি ছিল। একখানি কেবল ধীরভাবে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসে। অপর গুলির গরু ভয় পাইয়া নানা দিকে চলিয়া যায়।

এইবার সকলে চন্দ্রাতপতলে সমবেত হইলেন। শ্রীমতী বম্পাস স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন। মাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত আমেদ সাহেব শ্রীমতী বম্পাসকে ধন্যবাদ দেন, এবং ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদাস শোভান বাহাদুরের প্রচুর প্রশংসা করিয়া বলেন, তাঁহার যত্নেই মেলার এতাদৃশী উন্নতি হইয়াছে। শেষে " মধুরেণ সমাপায়েৎ "। হেতমপুর নাট্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনয় হয় ও আতসবাজি পোড়ান হয়।

এইরূপে মহাড়ম্বরে পশু ও কৃষি প্রদর্শনীর কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইহাতে স্থায়ী উপকার কি হইবে? দর্শকবৃন্দ কেবলমাত্র আমোদ দেখিয়া তৃপ্ত মনে গৃহে ফিরিলেন, না—কৃষি ও পশুর উন্নতিকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চিন্তাকুল হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন? যদি বাঙ্গালী চরিত্র ঠিক বুঝিয়া থাকি, তবে শেষটিই সম্ভব। যাহাহউক, রাজার কর্ত্তব্য রাজা করিলেন। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অনেক কাজ। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট ও অতীব প্রশংসার্হ। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমাদের বলিলে আমাদের মধ্যে ধনি-সম্প্রদায়কে বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের উচিত, স্বীয় জমিদারী-কেন্দ্রে এক একটি করিয়া আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সৃষ্টি করা। তথায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করা। নিরক্ষর কৃষকগণ দেখুক যে, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ক্ষেত্র সকল অধিক শস্য প্রসব করিতে পারে। জমিদারের দৃষ্টান্তে ও উৎসাহ বাক্যে তাহারা উৎসাহিত হইয়া তাঁহাদের অবলম্বিত প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে চাষ করিতে আরম্ভ করুক। অচিরাৎ কৃষকগণের গৃহ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবে। ইহাতে জমিদারগণ এক শরে দুই শীকার করিতে পারিবেন। দেশের উপকারও হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রজাগণ সমৃদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা নিজেই লাভবান হইতে পারিবে। পীড়ন অপেক্ষা অন্য উপায়ে প্রজার নিকট অর্থ সংগ্রহ করা চলিতে পারে।

দ্বিতীয় কথা গবাদির উন্নতি সাধন করা। জমিদারগণকে নিজে গোপালন করিয়া দেখাইতে হইবে যে, কি উপায়ে গোকুল উৎকৃষ্ট, সুস্থ ও ও সবল হইতে পারে। এরূপ করিলে তবে ফল হইবে। নচেৎ বৎসর বৎসর এক একবার মেলায় গেলে বেশী ফল হইবে না। জমিদারগণ

কিছু দিনের জন্য এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন কি? ভরসা করি, আমাদের ইহা অরণ্যে রোদন হইবে না।

সংবাদ।

বীরভূম লাভপুর গ্রাম নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কোন নামজারীর মোকদ্দমায় সাক্ষীর সমন পাইয়া ধার্য্য দিনে উপস্থিত না হওয়ায় জেলার মাজিষ্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারানুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার নামে সমন জারী হয়। আসামী হিরণ্যভূষণ বাবু এ ক্ষেত্রেও আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পরন্তু, অসুস্থতাই অনুপস্থিতির কারণ উল্লেখে, উপস্থিত হইবার জন্য কিছু সময়ের প্রার্থনা সম্বলিত এক আবেদন পত্র, কোন মোক্তার দ্বারা মাজিষ্টর বাহাদুর সমীপে দাখিল জন্য, কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা স্বাক্ষরযুক্ত মোক্তারনামা পত্র পাঠাইয়া দেন; স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত মোক্তারনামা পত্র গ্রহণ করত, উল্লিখিত মর্ম্মে এক আবেদন পত্র মাজিষ্টর বাহাদুর সমীপে দাখিল করেন; ঐ দিন জেলার মাজিষ্টর বাহাদুর মফস্বলে থাকায়, ডেপুটী মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের হস্তে জেলার কার্য্যভার সমর্পিত ছিল। সময় সমাগমে উল্লিখিত দরখাস্ত পেস হইলে হিরণ্যভূষণ বাবু মোক্তার দ্বারা হাজির হইবার অনুমতি পাইলেন এবং তাঁহাকে ৫০৲ টাকা পরিমাণে জামিন দিবার আদেশও হইল; কিন্তু আসামী অনুপস্থিত এবং মোক্তারই আসামীরূপে অবতীর্ণ; সুতরাং মোক্তার মহাশয়কে পুলীসের হেফাজাতে কোর্টে যাইতে হইল, অনন্তর তিনি উক্ত পরিমাণে জামিন দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। যথাসময়ে জেলার মাজিষ্টর বাহাদুর সদরে উপস্থিত হইলে সুরেন্দ্র বাবু উক্ত জামিনের হুকুমের আবশ্যক পরিবর্ত্তন জন্য তৎসমীপে আপীল করিলেন; এবং আবশ্যক পরিবর্ত্তনের আদেশ দিয়া, মাজিষ্টর বাহাদুর উক্ত দরখাস্ত ডেপুটী বাহাদুরের নিকট দাখিল জন্য ফেরৎ দিলেন; অনন্তর ডেপুটী বাহাদুরের সমক্ষে উক্ত দরখাস্ত দাখিল হইলে, তিনি অবিলম্বে

জামিনের হুকুম রহিত বা পরিবর্ত্তন করত আসামীর নামে ওয়ারেণ্ট জারীর আদেশ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, হিরণ্যভূষণ বাবুর দরখাস্তে মোক্তার দ্বারা হাজির হইবার অনুমতির প্রার্থনা ছিল না। উক্ত দরখাস্তে লিখিত বিষয় অযথারূপে নিবেদিত হওয়ায় তিনি ভ্রমবশতঃ উক্তরূপ আদেশ দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। *

নিজ সিউড়ী সহরের আবদুল সোভান নামে এক মুসলমান যুবক স্থানীয় ডাকঘরে পিয়নের কার্য্য করিত। তাহার এক বন্ধু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন সংবাদ পত্রের গ্রাহক হইবার জন্য, পত্রের বার্ষিক মূল্যের টাকা সম্পাদকের নিকট মণিঅর্ডার দ্বারা প্রেরণার্থ আবদুল সোভানের হস্তে অর্পণ করে। কিন্তু আবদুল সোভান ঐ টাকা আত্মসাৎ করত, বন্ধুর মনস্তুষ্টির জন্য, দুই একবার পুরাতন সংবাদপত্র মোড়কবদ্ধ করিয়া আনিয়া দেয়; ক্রমে তারাপদের মনে সন্দেহ জন্মে এবং সম্পাদকের নিকট অনুসন্ধান লইয়া সে বন্ধুর প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হয়। অনন্তর আবদুল সোভান ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ডেপুটী শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদাস সোভান বাহাদুরের বিচারে আসামীর ১০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

বীরভূম তেঁতুলডিহি গ্রামের জনৈক কৃষক পীড়িত ও শয্যাশায়িত হইলে কৃষকরমণী পতির মৃত্যু আশঙ্কায় অতিশয় কাতরা হয়; এবং আহার নিদ্রা ত্যাগ করত স্বামীর শুশ্রূষায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া মৃত্যুর ২ দিন পূর্ব্ব হইতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে। অনন্তর স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার চরণতলে শয়ন করত চরণ-সেবা করিতে করিতে সাধ্বী কৃষকরমণী

ইহাই আমাদের সংবাদদাতা বলিতেছেন। আমরা কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে অন্যরূপ শুনিয়াছি। হিরণ্য বাবু এজেণ্ট দ্বারা উপস্থিত হয়েন। জামিন না দিতে পারিলে এজেণ্টকে কেন পুলিশের হেফজাতে যাইতে হইবে না, তাহাত বুঝিতে পারি না। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রভৃতি কোন কোন সংবাদ পত্রে যে অতি অসম্ভব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অতীব দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। হরিশ বাবুকে আমরা অতি ধীর প্রকৃতির হাকিম বলিয়া জানি; খামখেয়ালি তাঁহাতে সম্ভবে না। বীঃ সঃ

ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে এবং স্বামীও পরক্ষণেই সতীর অনুগমন করত সতীর কামনা পূর্ণ করিয়াছে।

বীরভূম জেলা স্কুলের ৪র্থ ইংরাজী শিক্ষক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম, এ মহোদয় রাজসাহী কলেজের প্রফেসার নিযুক্ত হইয়া বিগত ৭ই আষাঢ়, পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকার সময় বীরভূম পরিত্যাগ করত রাজসাহী যাত্রা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ছাত্রবৃন্দ মুদ্রিত কবিতা পাঠে তাঁহার ভাবী মঙ্গল কামনা প্রকাশ করত সম্মান ও গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। শিক্ষক মহাশয়ের পদোন্নতি জনিত হর্ষ ও বিচ্ছেদ জনিত বিষাদে ছাত্রমণ্ডলী যুগপৎ নিমগ্ন হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জনের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিয়াছে। স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহোদয় এতদুপলক্ষে দুইদিন হাফ্ স্কুল করিয়াছিলেন।

সমালোচনা।

দারোগার দপ্তর, ১৩০৭, বৈশাখ।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, দারোগার দপ্তরের পূর্ব্বের ন্যায় সে মোহিনী শক্তি নাই। মাসে মাসে পাঠকগণকে একটা যেমন তেমন গল্প শুনাইয়া দিলেই যে দারোগা মহাশয়ের কর্ত্তব্য শেষ হইল, ইহা আমরা মনে করি না। দেখাইতে হইবে যে, দুষ্টগণ কিরূপ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে, এবং পুলিশে কিরূপে সেই সকল কৌশল জাল ছিন্ন করিয়া দোষীকে ধৃত করে। ইহাতে সমাজের উপকার আছে, পাঠকেরও তৃপ্তি হয়। সমালোচ্য সংখ্যায় গুলজার বেগমের কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অপরাধী ধৃত করিতে দারোগা মহাশয়ের যে বিশেষ কৃতিত্ব কিছু ছিল, এমন ত বোধ হয় না। যাহা হউক, প্রিয়নাথ বাবুর নিকট আমাদের অনুরোধ, যেন তিনি তাঁহার দপ্তর হইতে ভাল ভাল শিক্ষাপ্রদ গল্প বাহির করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দেন। প্রিয়নাথ বাবুর লেখার মাধুর্য্য আছে, বর্ণনার চমৎকারিত্ব আছে; অতি সামান্য বিষয়কেও তিনি চিত্তাকর্ষক করিতে পারেন। এবার "বুয়ার যুদ্ধের ইতিহাস" দারোগার দপ্তরের উপহার। একেত আমরা উপহারের পক্ষপাতী নহি, তাহাতে "বুয়ার যুদ্ধের ইতিহাস" উপহার দেওয়া হইবে শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি। বুয়ার যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। এখনও এই যুদ্ধের অনেক কথা অপ্রকাশিত আছে; অনেক ভ্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে কি এই যুদ্ধের ইতিহাস লেখা চলে? যাহা হউক, আমরা ভরসা করি, উপহার যুক্ত দারোগার দপ্তর পাঠকগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হউক।

নির্ম্মাল্য। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।

বিগত বৈশাখ মাস হইতে নির্ম্মাল্যের ছাপা, কাগজ ও চিত্রের সমধিক উন্নতি দেখিয়া আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। বিষয় নির্ব্বাচনও ভাল। তবে আমরা অত গল্প দেওয়ার পক্ষপাতী নহি। এখন আমাদের গল্প করিবার সময় নহে। কাজের কথা বেশী কহিতে হইবে। সত্য বটে বাঙ্গালী পাঠকের গল্পে রুচি অধিক। কিন্তু তাই বলিয়া লাভের আশায় পাঠকের রুচি অনুসারে চলিতে হইবে, এমন কিছু কথা নয়। পাঠকের মনের গতির সহিত না চলিয়া, যাহাতে ঐ রুচি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা করিতে হইবে। শীকার-কাহিনী যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ত শীকারের কথা বেশী কিছু দেখিলাম না। "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ও চন্দ্রনাথ বাবু" প্রবন্ধে লেখক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। তবে তাঁহার কোন কোন কথার সহিত আমাদের মতের মিল হইতেছে না। লেখক বলেন, "ইংরেজী শিক্ষিতগণ পিতা মাতাকে ভক্তি করেন না, এ কথা সমর্থনে আমরা অসমর্থ।" ভক্তি করিবেন না কেন? করেন, তবে হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ ভক্তি করিতে বলা হইয়াছে, সেরূপ করেন কি? শাস্ত্র বলেন,—

"পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

এরূপ ভক্তি কেহ করেন কি? কিরূপেই বা করিবেন? তাঁহাদের শিক্ষা যে তেমন হয় না। আমাদের ধর্ম্মের সহিত নীতি বিজড়িত। একটি বাদ দিলে অপরটিও বাদ পড়িবে। সেই ধর্ম্ম শিক্ষা আমাদের নাই। ইংরাজী শিক্ষিতগণ পিতার প্রতি যতই ভক্তি দেখান না কেন, তাঁহারা পিতাকে দেবতা বিবেচনা করেন না; কেন না, তাঁহারা দেবতা কি, তাহা যে জানেন না। সুতরাং এক হিসাবে চন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। আর এদিকে ইংরাজী শিক্ষিতগণ যে পিতাকে অশ্রদ্ধা করেন,

এরূপ বলা চলে না। পিতাকে তাঁহারা মানুষ বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং মানুষকে যতটুকু কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখাইতে হয়, তাহা দেখান, মোটের উপর পিতৃভক্তি আমাদের আর পূর্ব্বের মত নাই। এই প্রবন্ধের আর এক স্থানে লেখক প্রাচীন কবিগণের সহিত আধুনিক কবিগণের তুলনা করিয়া আধুনিকগণের উৎকর্ষ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সকল কথার আলোচনা অসম্ভব হইলেও একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস অপেক্ষা মধুসূদন উৎকৃষ্টতর রাধিকা-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আজ আমরা এই বলিতে চাহি যে, লেখক চণ্ডীদাসকে আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি জানেন না যে, চণ্ডীদাসাদি খাঁটী কাব্য লেখেন নাই। তাঁহারা কাব্যের ভাষায় ধর্ম্মকথা অতি নিগূঢ়—সাধারণের দুর্ব্বোধ্য কথা গাহিয়াছেন। তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে, তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলে, তাঁহার কথা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। চণ্ডীদাস অনধিকারীর আলোচ্য নহে। সুতরাং প্রাচীন ভক্তকবিগণের সহিত আধুনিক কবিগণের তুলনাই হইতে পারে না। আমরা সময়ক্রমে বীরভূমিতে এবিষয়ের আলোচনা করিব।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ] ভাদ্র। [১১শ সংখ্যা।

অমৃত তুসনিকা। *

৭ শ্রীহরিঃ ॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রায় নম। শ্রীনিত্যানন্দ্রঐ নম॥

শুনহ অপূর্ব্ব কথা দেহের নির্ন্নয়।
জার জৈছে:স্থিতি তাহা কহিব নিশ্চয়॥
চৌর্দ্দপুয়া দেহ হয় আপন প্রমান।
তাহে জত নাড়ি আছে শুনহ কারন॥
অষ্টপদ্ম নয় কোটা আছে স্থানে ২।
ইন্দ্ররিপু দিগ বিদিগ তাহা কহি এ প্রমানে॥
তথাহি॥ আদৌ নাড়ি শুসম্মাঞ্চঃ গতিত পূর্ব্বঃ
চতুর্থ নাড়ি তিন এই গুর্হ্যান্নিত ভব॥
সুসর্ম্মা নাড়ির কথা শুন এক মনে।
একাসি হাথ হয় নাড়ি কহিল প্রমানে॥
সেই নাড়ি মুল দেহে শক্তি রূপা হয়।
পদ্ম কোটা জেহি সব তাহার আশ্রয়॥
নাভি পদ্মমুলে ডাঁটি হয়ত সুসম্মা।
লাল পদ্ম তার বামে অর্দ্ধ যঙ্গুলি সিমা॥

* ইহা এক খানি বৈষ্ণবধর্ম্ম মূলক দেহতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। পাঠক একটু ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিয়া দেখিবেন, গ্রন্থখানি উপাদেয়। সাহিত্যের হিসাবেও এ গ্রন্থ প্রচারে লাভ আছে। গ্রন্থের কিছুই পরিবর্ত্তন করিলাম না। বর্ণাশুদ্ধি যেমন ছিল, অবিকল তাহাই রাখিলাম। এইরূপে আমরা ক্রমে অনেক দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিত করিব। বীঃ সঃ।

তাহার উর্দ্ধেতে দল য়ঙ্গুলি প্রমান।
তাহে যত পদ্ম রহে জিবের সেই স্থান॥
তাহার পূর্ব্বেতে পদ্ম কুসুম আকার।
চারি দল ধরে চারি রূপ ধরে আর॥
পর্চ্ছিমে অরুন পদ্ম অরুন বরন।
অরুন সমান তেজ তাহার কিরন॥
তাহার উর্ত্তরে পদ্ম নিল কান্তি য়াভা।
সড়দল সেই পদ্ম দেখিতে য়তি শোভা॥
তাহার দক্ষিণে পদ্ম চন্দ ভানু নাম।
চন্দর্জোতি হৈতে সেই অতি অনুপাম॥
তার যগ্নি কোনে কোঠা বাই স্থিতি করে।
জামলতা নাম তার পাকে ২ ফিরে॥
দক্ষিন বামেতে পদ্ম অর্দ্ধ য়ঙ্গুলি আড়াই।
তিন পাক সেই কোঠা শুন সভে ভাই॥
ইসানে অম্বল কোঠা উর্দ্ধে য়ঙ্গুলি আড়াই।
তাহে পিত্তি সদা স্থিতি করে শুন ভাই॥
বাউব্ব কোনেতে কোঠা হেমাম্বুদ নাম।
হিমালয় সমান সেই য়তি য়নুপাম॥
হিমেতে জেমত করে সর্ব্বাঙ্গে জেকায়।
সেই মত বিলাসে কফ সদা রহে তায়॥
আর এক কথা কহি কর য়বধান।
নৈরিত কুনে অগ্নি সদা দেখ বিদ্যমান॥
এই চারি কুঠা হয় কহি কিছু আর।
পঞ্চ কুঠা আছে যার কহিযে বিস্তার॥
চারি পদ্ম উদ্ধে চারি কুঠা হঅ সিমা।
কহিতে কাহার সক্তি তাহার মহিমা॥
এক পাক দুই পাক তিন পাক বলি।
পাকে পাকে নাড়ি কুঠা গরাসে সকলি॥
তিন ২ অঙ্গুলি উদ্ধে কুঠা ঘর হয়।
রিপুগণ তাহে সদা হর্ষ চিত্তে রঅ॥

মনহর কুঠা এক লাল পদ্ম পরে।
মনের সহিতে কাম তাহে স্থিতি করে॥
তাহার পূর্ব্বেতে পদ্ম সেত তার নাম।
উদ্ধে তার কুঠা মদন নাক্ষ্য তার নাম॥
তাহে স্থিতি করে মোহ রিপুর প্রধান।
মাআ আছাদিঞা যে জিবের হবে প্রান॥
তাহার উত্তর ভাগে পদ্ম নিলোৎপল।
তার উদ্ধে কুঠা হয় পরম উর্জ্জল॥
কিরন তাহার নাম শুন সর্ব্বজন।
মদন নামে রিপু তাহে বৈসে সর্ব্বক্ষন॥
আর এক কথা কহি শুন মন দিঞা।
দক্ষিন কুঠার কথা কহি বিস্তারিঞা।
সড়াক্ষ তাহার নাম সড়ভঙ্গ করে।
তাহে অধিকারি তম বহুতেজ ধরে॥
সদা দম্ফ অতিসয় করে অহংকার।
তাহার কারনে জিব হয় ছারখার॥
আর দুই কুঠা হয় উদ্ধে অঙ্গুলি দুই।
দুই পাসে দুই কুঠা সিথা যে একুই॥
সুরঙ্গ যুলাল কুঠা দক্ষিন বাম ভিতে।
যুলাল দক্ষিনে দেখ যুরঙ্গ বামেতে॥
যুলাল উপরে দম্ফ সদা করে বাস।
রাজপাটে রাজা জেন অধিক উল্লাস॥
তবে লহু যুরঙ্গ কোঠর পরেতে বসিঞা।
রঙ্গ দেখে সভাকার জিবগত হঞা॥
এইত কহিল অষ্ট পদ্মকুঠার নিল্বয়।
অপর কহিব তাহা যুনহ নিশ্রয়॥
যুসন্মা নাড়িতে জৈছে কুঠার গঠন।
তৈছে বৈনিক নাড়ি হয় পদ্ম নিরূপন॥
নাড়ি পথের ডাঁটি মৃণাল দুই হয়।
ডাঁটিজে যুসন্মা বৈনিক মৃণাল নিশ্রয়॥

নাভিপদ্ম চারি দিগে হয় পদ্ম কোটি।
উদ্ধে দক্ষিন বামে আছে কোঠা কুঠি॥
তার উদ্ধ মধ্যম স্থানে সেত পদ্ম হয়।
কমল কলিকা আভা পদ্ম কৈছে প্রায়॥
পদ্মবেড়া দুই ডাঁটি জায় উদ্ধ গতি।
ব্রহ্ম অঙ্গ সংক্ষা করি হয় অব্যাহুতি॥
তাহার মধ্যেতে পদ্ম আছে সহশ্র দল।
সর্ব্বপরি হয় পদ্ম অতি সে বিরল॥
তাহে পরমাত্মা বৈসে করি পুর্ব্বমুখ।
দেখিঞা জিবের আবস্তা মনে হয় যুখ॥
রিপুগন বেষ্টিত জিব মুনের উল্লাসে।
ইন্দ্রিয় যুশ্রসা করে মনের অভিলাসে॥
আর কহি শুন তত্ত দেহের ঘটন।
কার্জ অনুসারে সভে বুঝত এখন॥
জার জেই গত কহি বিভাগ করিঞা।
জার জে সত্তাতে য়াছে অনুগত হঞা॥
জিবাত্মা পরমাত্মা কর্ত্তা দুই জন।
জিব আত্মার গত ইন্দ্র দেখ পঞ্চজন॥
আর পঞ্চ ইন্দ্র দেখ পরমাত্মা নঞা।
সহায় যুমিতা করে হর্ষচিত্ত হঞা॥
সেই পঞ্চজন দেখ চক্ষু কর্ণ নাসা।
আত্মারাম গত হঞা করয়ে যুশ্রসা॥
আর দুই ইন্দ্র যুন জিভ্বা বাক্ হয়।
রসের স্বাশ্রয় রস তরঙ্গে সদায়॥
এই পঞ্চজন পরমাত্মা তুসে সদা।
রমন করায়ে তারা রসেতে সর্ব্বদা॥
আর এক শুন সভে অপূর্ব্ব কথন।
মূল পদ্ম হৈতে পদ্ম সরবরগণ॥
মূলের দক্ষিণে হয় কাম সরবর।
তাহাতে মুদিত পদ্ম কুমল নিরন্তর॥

আর এক সরোবর হয় পূর্ব্বভিতে।
উলটা কমল কত সত য়াছে তাথে॥
এই দুই অধমূল হয় সরবর।
কন্দর্প দপিত অতি দেখিতে সুন্দর॥
সেই সরবরের উত্তর দক্ষিণ দিগ নঞা।
তার ভিতে বন সব আছেত ব্যাপিঞা॥
নদির পূর্ব্বেতে দহ অতল পরস।
পঙ্ক নাহি বালি নাহি যুধু সমরস॥
নদিতে নাহিক জল তাপিতে স্নিগ্ধ করে।
তিষ্ঠিত হইঞা পসে তার তিষ্ঠা হরে॥
বান নাঞি বরিসা নাঞি শ্রুত বয়।
কোথাহৈতে বিন্দু বিন্দু আসিঞা জন্ময়॥
ইহা ভাবি চিত্তে অতি দুঃখমতি হঞা।
রাধাকুণ্ডের পূর্ব্বে তমাল তলাতে বসিঞা॥
অদ্ধ নিদ্রা অদ্ধ বাহ্য ক্ষুধাতে মগ্ন অতি।
রার্ত্তি সেসে আসি মোরে কহিছেন রতি॥
যুনহ মুকুন্দ চিন্তা না করিহ য়ার।
সর্ব্বাভিষ্ট মুনসির্দ্ধ হইব তোমার॥
পক্ষ্যান্তর পরে মাস সেস ভাগ জানি।
উলটা কমল ফুটি নদিতে বহে পানি॥
তিন দিন বহে জুয়ার রক্তবর্ন হঞা।
কমলের সত্তা সেই দেখ বিসেসিঞা॥
জেমত পুষ্পের রূপ জল সেই বর্ন।
সাস্ত্রের প্রমান সত্য কভু নহে অন্য॥
সেই নদি ভাসে জবে কমল ফুটিঞা।
সর্ব্বদেব রস নাগি ধারে বৈসে জাঞা॥
পথমদিবসের বান অমৃত য়াস্বাদন।
সেই দিন য়াসি পান করে দেবগন॥
এই রসে অমর যতেক দেবগনে।
বেদ সাস্ত্র মত নহে য়ন্যমত জানে॥

সমুদ্র মথন করি য়মৃত পাইল।
তাহা পান করি দেব য়মর হইল॥
কুল সমুদ্র মথন করিল ভগবান।
ইহা নাহি জানে জিব সদাই অজ্ঞান॥
মেহিনি হঞা মথন করিল সমুদ্র।
ইহা নাহি জানে ব্রহ্মা বিষ্ণু আর রুদ্র॥
প্রথমে অমৃত ফেনা পরে উদিত চন্দ্র।
অন্ধকার হইল নাস পাইল আনন্দ॥
তদপরে দেখা দিল প্রিকিতি রূপ ধরি।
উঠি ভগবানের তিহো মুন কৈলা চুরি॥
অমৃত পাইল যত দেবতা সকলে।
ছিষ্টিরূপা নারি গেলা নারায়ন কুলে॥
অন্ধকার নাস কৈল চন্দ্র হঞা জে উদয়।
তিমির বিনাসে সিবের মুনে হইল ভয়॥
এতকাল নাহি দেখি যুনি জেই জনে।
কেবা এন্যাছিল কুথা জানিব কেমনে॥
এতেক চিন্তিতে সিব যুণে কলরব।
অমৃত বাটিয়া খায় দেবতা সকল।
সব্দ সুনি অনুসারে গেলেন মহেস।
কৃপালু হঞা সভে কহ উপদেস॥
যুণি দেবগণ কহে যুন তৃলোচন।
অমৃত খাইয়ে মুরা জত দেবগণ॥
এত শুনি পঞ্চানন কহেন গর্জ্জিঞা।
সকলে মথিলে সিন্ধু মোরে না বলিঞা॥
কেবা মথন হৈল দণ্ড হেল কেবা।
কেবা দড়ি হৈল তাহা আমারে কহিবা॥
এত যুনি কহে দেব মথন নিব্বয়।
সর্ব্বকর্ত্তা জিহোঁ তিহো মেহিনিরূপ হয়॥
তবে শিব কহে যুন জত দেবগনে।
জগতের পতি নিঙ্গ খসাইলা কেমনে॥

সেই নিঙ্গ দণ্ড হয় বৈনিক হৈল দড়ি।
কাম সরবর মন্থে মোহিনি বেস ধরি॥
তাহে বহু শ্রম হৈল ঘন স্বাস বহে।
ক্ষেনেকে মন্থন করে ক্ষেণে তব্ধ রহে॥
এমতে মন্থন সিন্ধু কৈল ভগবান।
তাহে জে উপজিল তাহা বুদ্ বুদ্ আক্ষ্যান॥
জৈছে দধি মন্থনতে নবনি উঠয়।
তৈছে কাম সিন্ধু মধ্যে বুদবুদ বিস হয়॥
ত্রিতিয় দিবসে শুনিত তৈছে হৈল প্রায়।
সর্ব্বাঙ্গ জারিঞা বিষে দুর্ব্বল করায়॥
সেই জল সিন্ধু হৈতে নদি জাঞা ভাসে।
পঙ্করূপি বুদবুদে বিস বহে উদ্ধপাসে॥
বিসামৃত সেই দ্রব্য বিশ্বাস নাহি তায়।
অজ্ঞানে খাইলে বাঁচে জ্ঞানি মরি জায়॥
য়েই অতি গূহ্য কথা গুপ্তে বুঝাইঞা।
প্রকাস করিবে অধিকারি সে জানিঞা॥
অধিকারি বিনে য়েই গ্রন্থ জেবা দেখে।
শুকর জোনিতে জন্মদিয়ে নরক ভঞ্জায় তাখে॥
অনাশ্রিত জন জদি য়েই গ্রন্থ ডোর খোলে।
সদগতি না হয় বাউরূপে সেই বুলে।
সহস্র বৎসর ফিরি পুন জন্ম পায়।
পয়ু জোনি তিন জন্ম পরে শুদ্ধ হয়॥

(ক্রমশঃ)

মনের ত্রিগুণ।

(২)

শীতকালের বাতাসে, দেশের সমুদয় নর নারী শীতে কাঁপিয়া উঠে। আবার গ্রীষ্মকালের বায়ু বহিলে, দেশের সমুদয় নর নারী ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হয়। এই ত জড় দেহের অবস্থা। অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম ঋতুভেদে আমাদের

দেহের রক্ত, মাংস, চর্ম্ম প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু আমাদের 'মর্ম্মের' অর্থাৎ মনের কিছু পরিবর্ত্তন হয় কি? শীতে যেমন দেহ কাঁপে; ভয়েও ঐরূপ দেহ কাঁপে।

শীতে দেহ কাঁপা, হইল জড় দেহের, অর্থাৎ হস্ত, পদ, চর্ম্ম, চুল, রক্ত, মাংস প্রভৃতির লক্ষণ,—ইহার আর এক লক্ষণ, যখন শীত হয়, তখন দেশের সকলেই তাহা ভোগ করে। ইহা হইল জড় জগতের কথা, কিন্তু চৈতন্য জগৎ, অর্থাৎ চৈতন্য দেহ বা মন ভয়ে কাঁপিয়া থাকে। ইহার লক্ষণ, দেশশুদ্ধ লোকের এক সঙ্গে ভয় প্রায় হয় না। আমার যাহাতে ভয় হয়, অপরের তাহাতে ভয় হয় না। এখানে একটু চলাচল ব্যাপার! তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ আমার শোকে তোমার শোক হয় না, এবং তোমার কষ্টে আমি কষ্ট পাই না। এই চলাচল হইল চৈতন্য! আমার স্নায়ু বিকারে আমি কাঁপিলাম, আমার জ্বর আসিল, কিন্তু তোমার জ্বর আসিল না, তাহা বলিয়া তুমি সে ক্ষেত্রে নিস্তার পাইলেও, জন্মের মত নিস্তার পাইলে না,—ইহার তাৎপর্য্য, জগদীশ্বর একটি "দ্রব্য" পৃথক্ ভাবে ব্যবহার করাইয়া থাকেন। জড়ের কার্য্য "এলো ধাবাড়ি," যাহা করিবে, তাহা সকলের জন্য করিবে। এ নিমন্ত্রণ বাড়ী, প্রণামী অনুসারে ভোজন ব্যবস্থা নাই, বা দুঃখী, ধনীর বিচার নাই। পাত্রানুসারে জড়ের জিনিষ তুল্য, কিন্তু জড় এক জিনিষ করিয়া দেয়, চৈতন্য তাহা করে না;—চৈতন্য এককে ঘুরায়,—যেমন পিতা একখানি বস্ত্র আনিয়া কোন সময় বড় ছেলেকে তাহা পরিধান করিতে দেন, কোন সময় বা ছোট ছেলেকে ঐ কাপড় পরাইতেছেন! ইহাই চৈতন্যের কার্য্য। তাহা হইলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, রক্ত মাংসের দেহ এবং মন বা চৈতন্য দুইটা এক পদার্থ নহে। কারণ রক্ত মাংসের দেহে শীত পড়িলে, দেশশুদ্ধ রক্ত মাংসের দেহে শীত লাগে। আবার ভয়ে কিন্তু দেশশুদ্ধ লোকের ভয় হয় না। ইহাতে কি বুঝা যায় না, আমাদের দেহ এবং মন স্বতন্ত্র পদার্থ?

দেশ কালানুসারে যেমন দেহ কাঁপে এবং তাপে, সেইরূপ দেশ কালানুসারে মন কাঁপে এবং তাপে। গৃহস্থালয়ে যে সকল বন্যজন্তু থাকে, তাহাদের মন অনেকটা মানুষের মত শান্ত শিষ্ট হয়, আবার ঐ সকল বন্যজন্তু বনে থাকিলে তাহারা ভয়ানক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এক পাখির দুইটি শাবক। একটি চণ্ডালের বাড়ী প্রতিপালিত হয় এবং একটি ব্রাহ্মণের বাড়ী ছিল।

ব্রাহ্মণ যে পাখিটি পুষিয়াছিলেন, তাহাকে "আসুন" "আসিতে আজ্ঞা হয়" ইত্যাদি শব্দ শিখাইয়া দ্বারে রাখিয়াছিলেন। সে আগন্তুক দেখিলে ঐ সভ্য শব্দ উচ্চারণ করিয়া পথিককে আহ্লাদিত করিত। ঐ পক্ষীর যে ভ্রাতা চণ্ডালের বাড়ী থাকিত, সে চণ্ডালোচিত ব্যবহার এবং শব্দ শিখিয়াছিল; কারণ দেশ কালানুসারে "মন" যথায় পড়ে, তাহার আস্ পাস্ হইতে যাহা বুঝে, সে তাহাতেই গঠিত হয়।

মনের ত্রিগুণ, যথা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। ইহার মধ্যে রজঃ এবং তমঃ গুণ দেহ হইতে উৎপন্ন। এবং সত্ত্ব গুণ প্রকৃত "মনের গুণ।" অতএব মন এক অপূর্ব্ব সত্ত্ব গুণের বস্তু হইলেও হস্ত, পদ, রক্ত, মাংসের সঙ্গে জড়িত হইয়া সাধারণের জ্ঞানে 'ত্রিগুণ" হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ মন এবং দেহ স্বতন্ত্র না বুঝিতে পারিলে, তাহাকে "তমঃ" গুণ বলে।

তমঃ, অর্থে তামস্‌ভাব, অর্থাৎ অন্ধকার। যেমন রজনীর অন্ধকারে আমাদের পরিচিত এবং অপরিচিত কোন বস্তুই দেখিতে পাই না। অতি পরিচিত ব্যক্তি নিকটে উপস্থিত হইলেও পরিচয় ব্যতীত তাহাকে চিনিতে পারিনা, এমন কি আপনাকে আপনি দেখিতে পাই না। অন্ধকারের ধর্ম্মই তাই। সেইরূপ মন আমাদের ভিতর থাকিলেও আমরা তাঁহাকে চিনি না। ঐ বৃক্ষগুলি সজীব বস্তু হইলেও উহাদের বাঁচাইবার এবং দোলাইবার জন্য এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা বৃক্ষের মধ্যে নাই, অথচ সেই পদার্থগুলিই বৃক্ষের জীবন। এই প্রত্যক্ষ ব্যাপার দেখিয়াও কি আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি না যে, এই জড় দেহ ছাড়াও এমন কতকগুলি দেবতা রহিয়াছেন যে, তাঁহাদের দ্বারা আমরা নড়িতেছি, দুলিতেছি, তাঁহারাই আমাদের প্রাণ, অথচ প্রাণকে বুঝি না। ইহাই আশ্চর্য্য—ইহাই তমঃ—ইহাই আমি।

আমি থাকিলেই জগৎ থাকে। আমি হইতেই জগতের উৎপত্তি। জগতের উৎপত্তি বুঝিতে যাওয়া, এবং অন্ধকারে পড়া, সমান কথা। পণ্ডিতেরা বলেন, জগতের উৎপত্তি তমঃ হইতে, এই জন্য হিন্দুদের কাল "কাল।" তমঃ ঠিক যেন, জরায়ু মধ্যস্থ ভ্রূণ। ইহার বর্দ্ধিত অংশ রজঃ। অর্থাৎ আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রজঃ।

রজের লক্ষণ তাই। আমরা হস্ত পদ প্রভৃতি দ্বারা যে কার্য্য করি, তাহা রজের কার্য্য। বিদ্যা, ধন, আত্মীয় স্বজন যাহা কিছু সমুদয় রজের

কার্য্য। মন যত প্রকারে ক্লেশ পায়, তাহার মূল কারণ রজগুণ। রজোগুণ কষ্টের জন্মদাতা। তমঃ মনকে আঘাৎ করে না, অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিয়া, "যাদু" করে। রজঃ মনকে ধরিয়া প্রহার করে, তিরস্কার করে। তমঃ যথার্থ যাদু! মানুষকে শিশুকালের মত খেলায়। রজঃ ঠিক যেন, মানুষের যৌবন সময়,—বাসনা—বাসনা কেবল তাড়না—যন্ত্রণা। রজঃ মানুষের এক কাল, কিন্তু একালে "কাল" নহে, ইহা শুভ্র—ইহা মহাদেব।

এই মহাদেবের গুণে মানুষ বৈজ্ঞানিক হইয়া জগতের কত আশ্চর্য্য কাণ্ডের সৃষ্টি করিতেছে। আবার এই মহাদেবের কৃপায় মানুষ গুলি, গাঁজা খাইয়া কষ্টের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। তমে জগৎ সৃষ্টি, রজে তাহা পালন হইতেছে।

এক কসাই ক্ষুধা তৃষায় কাতর হইয়া পথিমধ্য দিয়া এক গাভী লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু গাভীর বলের সঙ্গে কসাই পারিয়া উঠিতেছিল না, কারণ সে সময় কসায়ের ক্লান্তাবস্থা। নিকটে এক ধনীর অতিথিশালা দেখিয়া কসাই গরুটিকে এক বৃক্ষে বাঁধিয়া অতিথিশালা হইতে ভোজন করিয়া আসিয়া, বল পাইল, সেই বলে উক্ত গাভীকে বাটী লইয়া গিয়া যখন তাহাকে হনন করিল, জগদীশ্বর সেই সময় তাঁহার খাতায় উক্ত গাভী হত্যার পাপের জমা খরচে কসাইয়ের নামে চারি আনা পাপ এবং অতিথিশালার কর্ত্তার নামে চারি আনা পাপ এবং যে গৃহস্থ উহাকে বিক্রয় করিয়াছিল, তাহার নামে আট আনা পাপ জমা খরচ করিয়া লইলেন। ইহাতে জগদীশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, অতিথিশালার কর্ত্তা পুণ্যের জন্য অতিথিশালা করিয়াছেন, তিনি ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করিলেন, ইহাতে তাঁহার নামে পাপ জমা হইল কেন? উত্তরে প্রভু কহিলেন, "উহা রজের কার্য্য। রজের প্রত্যেক কার্য্যেই কিছু না কিছু মন চাঞ্চল্য হইবেই হইবে! মনকে চঞ্চল করাই পাপ। সুখ এবং দুঃখ কি? মনের অবস্থান্তর জনিত চঞ্চলই সুখ দুঃখ নামে অভিহিত। কসাই বল না পাইলে, উহাকে লইয়া যাইতে পারিত না, অতএব অনর্থক উহাকে হত্যা করিতে পারিত না। ব্যবহার জানিলে, ছুরি দ্বারা আমাদের কত উপকার হয়; আবার অসাবধানে থাকিলে বা ব্যবহার না জানিলে তাহা দ্বারাই হস্ত কাটা যায়। সকল কার্য্যেই আলোক আঁধার আছে—পাপ পুণ্য আছে। ব্যবহার জানা

চাই। অতিথিশালার ভিতরেও পাপ এবং পুণ্যের স্রোত চলে, তাহা কি তুমি জান না।"

যাহা হউক, তমঃ এবং রজঃ আমাদের শরীরের কার্য্য দ্বারা উৎপন্ন গুণ বিশেষ। সংসারের যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই এই গুণদ্বয়ের অভিনয় দেখিতে পাইবে। এখানে অর্থাৎ এ সংসারে শুদ্ধ সত্ত্ব (মন) গুণ আসিয়া দেশ কালে পড়িয়া আস্ পাস্ যাহা দেখে, তাহা দ্বারাই, তিনি রঞ্জিত হইয়া উঠেন। এই জন্য মন দেহ লাভ করিয়া তমঃ এবং রজঃ গুণে ভূষিত হয়েন।

সত্ত্বগুণ সুখ প্রদানের হেতু স্বরূপ। সত্ত্বগুণ দ্বারা ছয় প্রকারে সুখ পাওয়া যায়, এই কথা আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। ১ম, প্রসন্নতা; ২য়, সন্তোষ; ৩য়, প্রীতি; ৪র্থ, নিশ্চিত জ্ঞান অর্থাৎ স্থির বিশ্বাস; ৫ম, ধৃতি অর্থাৎ ধারণা; ৬ষ্ঠ, স্মৃতি অর্থাৎ অনুভূত বিষয় জ্ঞান। এই ষড়গুণ কিন্তু তমঃ প্রভৃতিতে দেখা যায় না। কারণ তমঃ প্রকৃত বস্তুতে ভ্রম এবং নিয়ত অজ্ঞানতা জন্মায় বলিয়া আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না; আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে সন্তোষ ভাব একেবারে আসিতে পারে না। পরন্তু স্বার্থযুক্ত থাকিলে প্রসন্নতা আসে না। কাহাকেও কিছু দান করিলে যে সুখ অনুভূত হয়, তাহকেই বলে প্রসন্নতা। অতএব যিনি যত নিঃস্বার্থ হইতে পারেন, তিনি ততই প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার বাসনা নষ্ট হইয়াছে, তিনিই সন্তোষের বিষয় উপলব্ধি করিয়াছেন। সন্তোষের স্থায়িত্ব টুকুর নাম তৃপ্তি। এবং তৃপ্তির স্থায়িত্ব টুকুর নাম শান্তি।

শান্তি সম্বন্ধে একটি গল্প আছে,—এক রাজার, ধন, জন, সম্মান, সৈন্য, পরিষৎ, পুত্র, কন্যা, জামাতা প্রভৃতি যাহা থাকা প্রয়োজন, তাহা সবই ছিল তাহার মনের খুঁৎ খুঁত্‌নি ভাব এবং দুর্ভাবনা যায় নাই; অর্থাৎ শান্তি আসে নাই। এইকথা রাজা তাঁহার গুরুদেবকে জানাইলেন, গুরুদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, "উহা অমন হইয়া থাকে, বিশেষতঃ আমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে প্রায়ই লোকের মন চঞ্চল হয়; ওসব কিছু নয়। স্নায়ু দৌর্ব্বল্যে উহা হয় বটে, কিন্তু একটা কার্য্য করিলে শান্তি আসিতে পারে। শ্রাদ্ধ, শান্তি করা, ভাগবত দেওয়া, রামায়ণ এবং মহাভারত দেওয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান এবং দীন দুঃখীকে অন্ন বস্ত্র দান করিলেই শান্তি আসিয়া পড়িবে।"

"শান্তি আসিবে", ইহা শুনিয়া রাজা বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, "গুরুদেব! ঐ সকল কার্য্য করিতে কত ব্যয় হইবে?"

উত্তরে গুরু বলিলেন, "অন্ততঃ দশ হাজার টাকার কমে আপনারা উহা করিলে ভাল দেখায় না। তাহার পর যত খরচ করিতে পারেন—রাজা পরীক্ষিত এই কার্য্যে নিজের প্রাণটা পর্য্যন্ত খরচ করিয়াছিলেন।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা দশ হাজার মুদ্রা লইয়া কার্য্যারম্ভ করুন, আমার শান্তি আসা চাই।"

গুরু ইহা শুনিয়া যেন হস্তে চন্দ্র পাইলেন, মনে মনে বলিলেন, বাম্নী এইবার তোকে দশভরি স্বর্ণালঙ্কার দিব। এবং প্রভাত আশকে বলিব শীঘ্র এক পাঁজা ইট্ পুড়াইয়া দে। বাড়ীটা একটু শ্রীযুত মত চাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "ব্যয়টা আমার হস্ত দিয়া হইবে ত?

রাজা তাহাতেই মত দিলেন। তৎপরে যথাবিধি কার্য্যারম্ভ হইল। ছয় মাস ভাগবত পাঠ হইল। রামায়ণ, মহাভারত পাঠ হইল, ব্রাহ্মণ-ভোজন হইল, কার্য্য সমাপ্ত হইল। তৎপরে এক বৎসর গত হইল, এমন সময় রাজা পুনরায় গুরুদেবকে ডাকাইয়া বলিলেন, "প্রভো! আপনার কথামত কার্য্য হইল বটে, কিন্তু কৈ আমার অশান্তি গেল না, এখনও সেই দুর্ভাবনায় হৃৎপিণ্ডে যেন আলপিন বিধিতেছে। ইহার উপায় কি? দেখুন, আপনারা যাহা করান, তাহা সব ফাঁকি, এত ব্যয় করিয়াও কিছু ফল হইল না।"

গুরু কহিলেন, "হবে বৈ কি! অধৈর্য্য হবেন না, সময়ে সমুদয় ভাল হইবে।"

রাজা। তা' আমি জানি, সময়ে সব ভাল হয়, তবে চিকিৎসকের সাহায্য কেন? আপনাকে যে এত টাকা দিলাম, তাহার ফল কি হইল? দেখুন বুজরুকি পরিত্যাগ করুন, উপস্থিত আমার শান্তি আনাইয়া দিতে হইবে, বিশেষতঃ আপনি উহা আনাইবেন বলিয়া দশ হাজার টাকা লইয়াছেন, অতএব সাত দিনের মধ্যে যদি আপনি শান্তি আনাইয়া না দিতে পারেন, তাহা হইলে, আপনার স্বপরিবারের সহিত আপনার ছিন্ন মুণ্ড আমি দর্শন করিব। জুয়াচুরী রাজার সঙ্গে করা চলে না; বাঘের বাসায় ঘোগের বাস হয় না।"

গুরু এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া, রাজা রাগিয়াছেন দেখিয়া আস্তে আস্তে রাজসকাশ হইতে বাহির হইয়া পথে আসিয়া নিজ

মূর্ত্তি ধরিয়া বলিতে লাগিলেন "পাজিবেটা, নচ্ছার বেটা, নাস্তিক, অধার্ম্মিক বেটা, বলে, কিনা ব্রাহ্মণ হত্যা করিব, ঐ কথা আর দুই বার বলিলে, নিশ্চয়ই বেটার জিহ্বা খসিয়া পড়িত। অনেক পয়সা খাইয়াছি, কি করিব, তাই আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম; নচেৎ উহার জিহ্বার স্খলিত অবস্থা দেখিতে হইত। আমি অগ্রে জানিতাম, এমন রাজা হয় না। এখন দেখিতেছি, উহার মত মন্দ ভাগ্য রাজা জগতে নাই। আমি হেন পণ্ডিত, মুগ্ধবোধ আমার ওষ্ঠাগ্রে বিরাজিত। আমার মত পণ্ডিত এই বঙ্গদেশে নাই। আমার সম্মুখে এই কথা। তোর সর্ব্বনাশ হবে!! হাকিম নড়ে, তবু হুকুম নড়ে না; রাজা যদি সত্য সত্যই আমাদের সকলকে কাটিয়া ফেলেন। উপায়!!"

এই ভাবিতে ভাবিতে গুরুদেব বাড়ী আসিলেন এবং স্ব শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। গৃহিণী বা ব্রাহ্মণী নিকটে গিয়া অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাহ্মণ সমুদয় কথা ব্রাহ্মণীর নিকট বলিল, ইহা শুনিয়া, বাম্ণী মীমাংসা করিল "তা ভয় কি? এ রাজ্য হইতে আমরা ৭ দিনের মধ্যে পলায়ন করিব।" ব্রাহ্মণ কহিল, "তা কি হয়। রাজার সঙ্গে বিবাদ, ধরিয়া আনিতে কতক্ষণ?"

এমন সময় গোপাল আসিল। ঐ ব্রাহ্মণের এক মাত্র পুত্র ছিল, তাহার নাম গোপাল। গোপাল যুবক, শরীরে বল আছে এবং মনের বল বেশী বলিয়া সে পাগলা মত। জাতি বিচার করে না; যাহা পায়, যে জাতিই হউক, তাহার প্রসাদ খায়। আঁস্তাকুড়ে এঁটো পাতে কিছু উচ্ছিষ্ট খাদ্য থাকিলে গোপাল তাহা খাইতেও ঘৃণা বোধ করে না। গোপাল কখন বাড়ী আসে, কোন দিন আসে না, কখন কাপড় পরিধান করে, কখন উলঙ্গ ভাবে মস্তকে কাপড় বাঁধিয়া হাসিতে হাসিতে পথে বাহির হয়। এই ত গোপালের অবস্থা।

গোপাল আসিয়া বলিল "মা! ভাত কৈ?"

উত্তর "এখনও কর্ত্তা খান নাই।"

"কেন?

উত্তর "রাজা কি শান্তি চাহিয়াছে।"

গোপাল কহিল "কোন্ শান্তি?'

উত্তর "সে কিরে—আবার পাগলাম করিস কেন?'

গানারেল। তোমার এরকম কথা শুন্‌তে আমি চাহিনা।

মুশো রবাট। আঃ! ইহাত অন্য বিষয়। পূর্ব্বের ব্যাপারের সম্বন্ধে এখন আমি কিছু বল্‌ছিনা।

গানারেল। আমার যদি ইচ্ছা হয় তবে আমার স্ত্রীকে আমি প্রহার কর্ব্বো, না যদি ইচ্ছে হয় তবে প্রহার কর্ব্বো না।

মুশো রবাট। ইহা অতি উত্তম।

গানারেল। ইনি আমার স্ত্রী তোমার স্ত্রী নহেন।

মুশো রবাট। ইহাতে কোন সংশয় নাই।

গানারেল। আমাকে হুকুম কর্‌বার তোমার কোন অধিকার নেই।

মুশো রবাট। তাহা মেনে নিচ্ছি।

গানারেল। তোমার সাহায্যে আমার দরকার নাই।

মুশো রবাট। সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাকে একমত হচ্ছি।

গানারেল। তুমি এরূপ একটা বেজায় ঠেঁটা লোক যে অন্য লোকের সাংসারিক ব্যাপারে হাত দিতে এসেছ। এখন সিসিরো কি বলেছেন তাহা জেনে রাখো। তিনি বলেছেন যে বৃক্ষ ও অঙ্গুলীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে বৃক্ষের ছাল স্থাপন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু

গ্রন্থ সমালোচনা।

ব্রহ্ম প্রবাসীর পত্র।

[অর্থাৎ ব্রহ্মদেশের সামাজিক, পারিবারিক, ধর্ম্মনৈতিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্তমূলক সন্দর্ভ। শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান, পাবলিশিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; এণ্টিক কাগজে সুন্দরভাবে মুদ্রিত ১০৩পৃষ্ঠা পুস্তক, এগারখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র আছে, মূল্য আট আনা মাত্র।]

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। বঙ্গের এই জাতীয় জাগরণের দিনে বহির্জ্জগতের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় একান্ত আবশ্যক—যে সমস্ত দিক হইতে সাহিত্য এই জাগরণের সহায়তা করিতে পারেন তন্মধ্যে দেশ দেশান্তরের রীতিনীতি প্রভৃতিকে আমাদের নিজস্ব করিয়া জাতীয় চিত্তের প্রসার সাধন অন্যতম। পুস্তকখানি অদ্যোপান্ত কৌতূহলপ্রদ, ভাষা প্রাঞ্জল; লেখক স্বকীয় সহৃদয়তা ও রচনা নৈপুণ্যে বৈচিত্র্যময় ব্যাপারের মধ্যে যে সনাতন মানব হৃদয় বিশ্বমানবের সুদূরবর্ত্তী ভবিষ্য মহামিলনের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেছে, সেই হৃদয়টুকুর সহিত আমাদের পরিচয় সাধনে সক্ষম হইয়াছেন—এইখানেই লেখকের যথার্থ সার্থকতা। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

নব আহ্বান।

মানবের পবিত্রতা হয়োনা বিস্মৃত
হে আর্য্যসন্তান
কোটি কোটি নরনারী দলিত রণিত!
কি ক্রূর বিধান!
ওই শুন বিধাতার আহ্বানের ধ্বনি
সাম্যমন্ত্র সুগম্ভীর
পতিতে তুলিয়া নিতে শত শত প্রাণ
চঞ্চল অধীর।
নরনারায়ণ রাম এস আরবার
পতিত ভারতে
কোটি কোটি গুহকেরে স্নেহে প্রেমে বাঁধি
লইয়া তাণিতে।
এ বিচ্ছেদ, এ উপেক্ষা, এ ভীষণ ঘৃণা
এযে দানবের
মৈত্রী, প্রেম, বিষ্ণুরে সর্ব্বত্র দেখা
ধর্ম্ম মানবের।
চৈতন্যের পবিত্রতা প্রেমধর্ম্ম তাঁর
আজি প্রয়োজন,
যার স্পর্শে অস্পৃশ্যও হবে অতি প্রিয়
নর নারায়ণ।
প্রতি মানবের হৃদে ঈশ্বরের বাস,
অনিন্দ্য সুন্দর।
ঢেকোনা সে দিব্য জ্যোতি চিন্ময় আলোক
ঘৃণা বশে নর।
'সর্ব্ব বিষ্ণুময় বিশ্ব,' খোলো হৃদি-দ্বার
সঙ্কীর্ণতা ছাড়ি,
অবিদ্যার মহাসিন্ধু হবে সুখে পার
অবসান হবে এই মোহ বিভাবরী।

গোপাল। ন "সে কিরে! আমি যে তোর পিতা; আমাকে বাঁধিবি করে, রাজা

এই বলিল, "পিতা আছেন, বাড়ীতে আছেন, শান্তি লইতে আসিয়া- ক্ষেত্রে কিছু ক্ষণের জন্য অন্ততঃ পিতৃ পদটা ভুলিয়া যাউন। শান্তিকে রাজার গুরু; আপনাকে অগ্রে বাঁধাই আমার উচিত ছিল। এখন প্রস্তুত হউন, আর কেন? শান্তি অগ্রে আপনার নিকট আসিবে, তৎপরে রাজার নিকট যাইবে।" এই বলিয়া গোপাল, পিতাকেও রাজার মত বাঁধিলেন।

তৎপরে গোপাল কিছুদূরে দাঁড়াইয়া করতালি দিয়া অতি ব্যাগ্রভাবে বলিলেন "রাজা! রাজা! শীঘ্র আসুন! শীঘ্র আসুন! ঐ শান্তির বাড়ী! ঐ যে শান্তির মুখ দেখা যাইতেছে! শীঘ্র আসুন! শীঘ্র আসুন!

এই বলিয়া গোপাল কিছু দূর দৌড়াইয়া গেল, তৎপরে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, রাজা তখন বাঁধা রহিয়াছেন, আসিবার নামটিও করিতেছেন না। ইহা দেখিয়া পুনরায় গোপাল বলিলেন, "কৈ রাজা! এলেন না! ঐ যে শান্তির বাড়ী! আসুন, আপনার পা'য়ে পড়ি আসুন!—"

এইবার রাজা বলিলেন "গোপাল! পাগল গোপাল! কেমন ক'রে তোর কাছে যাইব? তুই যে আমাকে বেঁধেছিস্!!"

গোপাল ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তা' বটে! তবে শীঘ্র এক কার্য্য করুন, পিতাকে বলুন, আপনার বন্ধন খুলিয়া দিতে! বাবা! শীঘ্র রাজার বন্ধন খুলিয়া দিউন। রাজা শান্তি নিকেতনে যাইবেন। শীঘ্র খুলিয়া দিউন! আহা রাজার কোমল গাত্রে না জানি বন্ধনের জন্য কতই বেদনা লাগিতেছে। পিতঃ! শীঘ্র রাজার বন্ধন মোচন করুন। উনি আপনাকে দশ হাজার টাকা দিবেন। এখন—শীঘ্র মোচন করিয়া শান্তি নিকেতনে রাজাকে পাঠান।"

এইবার রাজগুরু বলিলেন "গোপাল! তুই পাগলের শিরোমণি! ওরে পাগল! আমাকেও যে তুই বাঁধিয়াছিস্!

গোপাল বলিল, "তাওত বটে! আপনিও বাঁধা যে! পিতঃ এ বন্ধন আপনি কি পূর্ব্বে দেখেন নাই? রাজার প্রত্যেক লোমকূপের সঙ্গে টাকার বাঁধন, সৈন্যের বাঁধন, অহঙ্কারের বাঁধন, স্ত্রী পুত্রের বাঁধন, দেশের প্রত্যেক বালুকা কণা হইতে এই বনের বৃক্ষগুলি পর্য্যন্ত রাজার দেহে বাঁধা আছে।

এই বন্ধনের চাড়ে, কাজেই রাজা অস্থির। তাই শান্তি চাহিলেন। আপনি তাঁহাকে টাকা লইয়া শান্তি দিতে গেলেন, ধিক্ আপনাকে! আপনি একটু বুঝিলেন না যে, আপনিও ঐরূপ সংসারে বাঁধা! আপনিও স্ত্রী-পুত্রের ভালবাসায় বাঁধা! বাড়ীখানাও আপনার গায়ে বাঁধা! খড়ের গৃহের বাঁধা তবু অল্প হাল্‌কা ছিল, কিন্তু এ নূতন বাড়ীর নূতন ইটের চাপের বাঁধা বড়ই গুরুতর। আপনিও সমাজে বাঁধা। আপনারও প্রত্যেক লোমকূপের সঙ্গে সংসারের সমুদয় বস্তুগুলি বাঁধা রহিয়াছে। আপনার বাঁধন আপনি খুলিতে পারেন নাই; আপনি আবার পরের বাঁধন খুলিতে যান? ধিক্ আপনাকে! শত ধিক আপনাকে!! অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া দেয়! হায় রে! এ সংসারে সবই সম্ভব। পিতা, নিজের বাঁধন আপনি খুলিয়া ফেলুন; তৎপরে রাজার বাঁধন খুলিতে পারিবেন।

গুরুদেব কাঁদিয়া বলিলেন, "গোপাল! আর কেন বাবা! তুমি ত সকলেতে আছ, অথচ কিছুতেই মিশ না, এতদিন তোকে চিনি নাই, আজ যদি ধরা দিলি, ও বাপ গোপাল! তবে আমার বন্ধন খুলিয়া দাও বাবা!"

গোপাল হাসিয়া বলিল, "যাহাদের বন্ধন নাই, যাহারা মুক্ত পুরুষ, তাহারাই অপরের বন্ধন খুলিতে পারে। আমার বন্ধন নাই, আসুন, আমি আপনার বন্ধন খুলিয়া দিতেছি।" গোপাল পিতার বন্ধন খুলিয়া দিল, এবং পিতা রাজার বন্ধন খুলিয়া দিলেন। তৎপরে রাজা বলিলেন, "গোপাল! বুঝিয়াছি, সমুদয় না ছাড়িতে পারিলে—সকল বাসনার মূলে কুঠারাঘাত করিতে না পারিলে—সংসারের বন্ধন থাকিতে, শান্তি পাওয়া যায় না। যাহা হউক, গোপাল এখন শান্তি পাইবার উপায় কি?"

গোপাল বলিল, "কার্য্য! যে কার্য্য বলে আপনি জগতে রাজা হইয়াছেন, অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন, সেই কার্য্য বলেই আপনি মনোবিজ্ঞান বুঝিতে পারিবেন।" তৎপরে গোপাল রাজাকে যোগ শিক্ষা দিয়া শান্তি দিয়াছিল।

কষ্ট না পাইলে সুখ কি, তাহা উপলব্ধি হয় না, আঁধার না থাকিলে, আলোক কি, তাহা কেহ জানিত না। কষ্ট এবং সুখ কি, ইহা অভ্যাসের কথা। অভ্যাস দিয়া মীমাংসা করিলে তবে ইহার মীমাংসা হয়। মোট বহন করা ভদ্রলোকের পক্ষে কষ্ট; কিন্তু মুটেরা যদি মোট না পায়, তাহা হইলে সে দিন তাহাদের কষ্ট হয়, সে দিন তাহারা দুঃখ করে।

ভোগের পরই বিশ্রাম। রাজা অনেক ভোগ ভুগিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার বিশ্রাম বা শান্তির প্রয়োজন হইয়াছিল।

সকল পদার্থের যেমন গুণ আছে, সকল দেশের সেইরূপ গুণ আছে। পদার্থ ভিন্ন দেশ নহে এবং পদার্থ ভিন্ন মানুষ নহে। রক্ত, মাংস, নাড়ী, ভুঁড়ি, অস্থি, চর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয়ই পদার্থের রূপান্তর। আবার ঐ সকল পদার্থের প্রত্যেকের গুণ স্বতন্ত্র, কিন্তু ঐ সকল পদার্থের সমষ্টি জীব। পরন্তু ঐ সকল পদার্থের ভিতর মন মাখান আছে। ইহা আমরা কার্য্য দ্বারা বুঝিতে পারি। নাভির নিম্নে মন পড়িলে, তখন আমাদের ভিতর তমঃ গুণের কার্য্য হয়, এবং বক্ষে মন উঠিলে তখন আমাদের রজঃগুণের কার্য্য হয়, আবার ঐ মন ললাটে উঠিলে, সত্ত্বগুণের কার্য্য হয়। কর্ম্মের দ্বারাই মন এইরূপ চলাচল করিয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে আমরা মনকে ভ্রূ মধ্যে লইয়া যাইতে পারি এবং ইচ্ছা করিলে আমরা মনকে বক্ষে এবং কক্ষে লইয়া যাইতে পারি। অথবা মন স্বতঃই এ সকল স্থানে বিচরণ করিতে পারে। থার্ম্মমিটরের পারা যেমন স্বভাবতঃ রোগীর তাপে চলাচল করিতে পারে এবং আমরাও কৃত্রিম তাপ দিয়া উহাকে চলাচল করাইতে পারি, সেইরূপ মনও স্বভাবতঃ অথবা আমাদের জানিত স্বরূপ চলাচল করিতে পারে।

পূর্ব্বের গল্পটির মধ্যে রাজার কথায় তমঃ এবং রজের কথা বিস্তর আছে এবং রাজার ভিতরেও ঐ কথা। কিন্তু গোপালের ভিতর রজঃ এবং সত্ত্বের কথা আছে। এ বিষয় আরো ভাল করিয়া বুঝান যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

অদৃষ্ট না জড়তা ?

(কোন ইংরাজী গল্পের মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত।)

পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল এ জন্মে ভোগ করিতে হয়, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। শাস্ত্র মিথ্যা নহে, সুতরাং অদৃষ্ট বলিয়া যে একটা কিছু আছে, তাহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু আমাদের এমনি স্বভাব হইয়াছে, যে যেখানে দেখি, শাস্ত্রবাক্য আমাদের নিশ্চেষ্টতার অনুকূল, আমরা সেইখানেই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। শাস্ত্রে যে আরও কত কথা আছে, সে গুলি ভুলিয়া

যাই। অদৃষ্টফল ভোগ করিতেই হইবে বলিয়া যে আমাদের এ জন্মে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই, ইহাত সামান্য যুক্তিতেও আসে না। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা সম্পূর্ণভাবে জড়, নিশ্চেষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছি। এ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। এই গল্পে পাঠক দেখিবেন, যে মানুষের যত কিছু বিপদ হয়, তাহা অদৃষ্টের দোষে, না নিজের বুদ্ধির দোষে ?

অদৃষ্ট থাকিবে না কেন, আছে। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল এ জন্মে ফলিবেই ফলিবে। কিন্তু এ জন্মের কর্ম্ম দ্বারা সেই অদৃষ্টের ফল ব্যর্থ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এ জন্মে কষ্টভোগ করিতেছি, আবার এ জন্মে যদি কিছু নাই করি, তবে পর জন্মে ত আর নিস্তার নাই। তাই বলিতেছিলাম, যে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকার ন্যায় মহাপাপ আর নাই। অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটুক না কেন, তাহাত একটা বিঘ্নের মধ্যে ; বিঘ্ন দেখিয়া বুঝি পিছাইয়া আসিতে হইবে ? সে যে কাপুরুষের কর্ম্ম। অনেক দেখিয়া শুনিয়া তবে কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—

"দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"

যাহা হউক, যে গল্পটা বলিব বলিতেছিলাম, সেটি এই :—

মুরশিদাবাদ সহরে বনমালী দত্তের একটি সামান্য দোকান ছিল। দোকানে ঘৃত, মসলা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য বিক্রয় হইত। মুরশিদাবাদের তখন এমন দুর্গতি হয় নাই। নবাবের রাজ্য তখনও যায় নাই। অনেক ধনী, অনেক আমীর ওমরাহ তখন 'সহরে' বাস করিতেন। সুতরাং বনমালীর দোকান ক্ষুদ্র হইলেও একরূপ বেশ চলিত। বনমালীর দুই একটা বড় বড় আমীর বাঁধা খরিদদার ছিল। তাহা ছাড়া, "আধা পয়সাকা ঘিউ" "আধা পয়সাকা গরম মশালা" লইবার খরিদদারেরও অভাব ছিল না।" বনমালীর তখনও সন্তানাদি হয় নাই। কিন্তু স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা—আসন্নপ্রসবা।

যথাকালে একদিন সন্ধ্যার সময় বনমালী-পত্নীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। রাত্রি অবসানপ্রায় তথাপি সন্তান হইল না। সমস্ত রাত্রি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় বনমালীর নিদ্রা হইল না। নিশাশেষে, অবসন্ন দেহে সে যেমন শুইয়া পড়িল, অমনি তাহার তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রাবশে দেখিল, তাহার একটি সন্তান জন্মিয়াছে। সন্তানের মস্তক গর্দ্দভের মস্তকের ন্যায়, অবশিষ্ট শরীর কুম্ভীরের শরীরের ন্যায়। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! শিশু গর্দ্দভমস্তকে

নবাবের পাগড়ি পরিয়া আছে! নবাবের পাগড়ি শিশু কেমন করিয়া পাইল? এই চিন্তায় বনমালী আকুল আছে, এমন সময় নবাবের প্রহরিগণ তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। নবাব তাহার শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বনমালীর শিরশ্ছেদ হইবার পূর্ব্বেই তাহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, তাহার বাড়ীতে লোকারণ্য। পুত্র হই-য়াছে শুনিয়া তাহার হর্ষবিষাদ হইল। উপস্থিত রমণীমণ্ডলীর নিকট সে আপন স্বপ্নকাহিনী বিষাদ কম্পিত স্বরে বিবৃত করিল। সকলেরই মনে একটা ধাক্কা লাগিল—সকলেই ভাবিল, শিশুটি বড়ই দুর্ভাগ্য হইবে। ক্রমে এই কথা সমগ্র সহরে রাষ্ট্র হইল। সকলেরই ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল, ছেলেটির অদৃষ্ট কিছু ভাল নয়।

অদৃষ্ট যেমনই হউক, বনমালী-পুত্র কিন্তু দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। নাম হইল ভরত। লোকে কিন্তু তাহাকে জড়ভরত বলিয়া ডাকিত। ভরত ক্রমে বড় হইতে লাগিল। তাহার পিতা কিন্তু তাহার বিদ্যা শিক্ষার কোন চেষ্টাই করিল না। কেননা, সে জানিত, তাহার ছেলের অদৃষ্ট ভাল নয়। লেখা পড়া হইবে না। বলা বাহুল্য, ভরত মূর্খ হইয়া দাঁড়াইল। কালক্রমে ভরতের একটি ভ্রাতা জন্মিল। তাহার জন্মের পূর্ব্বে বনমালী কোনরূপ দুঃস্বপ্ন দেখে নাই। সুতরাং তাহার অদৃষ্ট ভালই হইবে, সকলেরই এই ধারণা হইল। পাড়ার দৈবজ্ঞও এই ধারণার সমর্থন করিল। সুতরাং ভরতের ভ্রাতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বনমালী তাহাকে তৎকাললভ্য শিক্ষা প্রদানে বিরত হইল না।

ভরত বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছিল, যে তাহার অদৃষ্ট বড় মন্দ। যাহার ভাগ্য মন্দ হয়, কিছুতেই তাহার ভাল হয় না। সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও তাহার মনে এই বিশ্বাস রহিয়া গেল, যে তাহার জীবন বড়ই দুঃখ-ময় হইবে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল হওয়ায় ভরতের বুদ্ধি জড়তা প্রাপ্ত হইল; কোন কার্য্যেই তাহার উৎসাহ দৃষ্ট হইত না।

ভরতের ভ্রাতার নাম নরহরি। নরহরির যে দিন জন্ম হয়, সে দিন একজন ওমরাহের বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত। সেইজন্য তিনি বনমালীর দোকান হইতে অনেক জিনিস ক্রয় করেন; সুতরাং বনমালীর তাহাতে বেশ দশ টাকা লাভ হয়। ইহাতে বনমালী ও অপর সকলের ধারণা হয় যে, নরহরি বড় সৌভাগ্যবান্ হইবে। বাল্যকালে নরহরির বিদ্যাশিক্ষায়

প্রবৃত্তি ও উৎসাহ দেখিয়া সকলেরই মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। জ্ঞান হইলে কিন্তু নরহরির বিশ্বাস অন্যরূপ হয়। সে জানিত, যে মানুষ নিজের অদৃষ্ট নিজেই গঠন করিয়া লইতে পারে। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও পরিশ্রমই উন্নতির একমাত্র উপায়। নরহরি এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, পিতাকে কার্য্যে সাহায্য করিত, আর ভরত আপনার অদৃষ্টের দোহাই দিয়া জড়ভরতের ন্যায় আলস্যে দিন কাটাইত। এইরূপে অনেক দিন চলিয়া যায়। সহসা এক দিন বনমালী দুর্ভাগ্য ও সুভাগ্য দুইটি পুত্রকে রাখিয়া ইহসংসার পরি-ত্যাগ করিল। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদ্বয় হিসাব করিয়া দেখিল, যে তাহা-দের পিতার ত্যক্ত সম্পত্তির মূল্যে ও ঋণে প্রায় সমান। ভরত নিরাশ হইয়া দোকানের মমতা ত্যাগ করিল। নরহরি কিন্তু দোকানের দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিল ও সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহাই লইয়া কষ্টে একটী সামান্য দোকান চালাইতে লাগিল।"

নরহরি ভরতকে অনেক বুঝাইল, অনেক যুক্তি তর্ক দেখাইয়া তাহাকে দোকানের অংশী হইবার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু ভরত বলিল, "ভাই, আমার ভরসা ছাড়িয়া দাও। আমি যদি দোকানে থাকি, তবে তোমার দোকান উঠিয়া যাইবে। এমন হতভাগ্য কি সংসারে আছে?"

দোকানে থাকিবে কি, ভরতের একটা কুঅভ্যাস অনেক দিন হইতে হইয়াছিল। সে অনেক দিন হইতে গুলি খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং এই কদর্য্য নেশায় তাহার উৎসাহ আরও মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল। ভরত ভাবিল, ভাই না হয় দুবেলা দুটি অন্ন দিতেছে। কিন্তু গুলির পয়সা কোথা হইতে হইবে? আর ভ্রাতার গলগ্রহ হইয়াই বা কত দিন থাকা চলে? ভরত এক দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। দুই প্রহর পর্য্যন্ত সহরের পথে পথে বেড়াইয়া ভরত ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া একজন মিঠাই বিক্রেতার দোকানে আশ্রয় লইল। দোকানদার দয়ার্দ্র হইয়া কিছু মিঠাই দিয়া তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। দোকানদারের সঙ্গে এই সর্ত্ত হইল যে, ভরতকে একটা চেঙ্গারিতে মিঠাই লইয়া সহরের রাস্তায় রাস্তায় বিক্রয় করিয়া আসিতে হইবে। ভরত আহারান্তে চেঙ্গারি লইয়া রাস্তার বাহির কিছু দূর গিয়া যেমন একটা গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া 'চাই মিঠাই' বহিয়া ডাকিয়াছে, অমনি বহু-সংখ্যক লোক 'মার মার' শব্দে তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। বিনা-

মেঘে এইরূপ বজ্রাঘাত দেখিয়া ভরত স্তম্ভিত হইল। বেগতিক দেখিয়া মিঠাইয়ের চেঙ্গারি ফেলিয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু পলাইবে কোথায়? চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। ভরত অনন্যোপায় হইয়া বসিয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি কখন মিঠাই বিক্রয় করি নাই। আজ পেটের দায়ে এই কুকর্ম্ম করিয়াছি। আমাকে কেহ মারিও না।" কাহার কথা কে শুনে? কীল, চাপড়, লাথি, মূষলধারে ভরতের উপর পড়িতে লাগিল। লোকটা মারা যায় দেখিয়া একজন ভদ্রলোক দয়ার্দ্র হইয়া ভরতকে ভিড়ের বাহির করিয়া আনিল এবং সকলকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিল। ভরত প্রাণ লইয়া পলাইল। যাইতে যাইতে সে এই নির্য্যাতনের কারণ বুঝিতে পারিল। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন ফিরিওয়ালার মিঠাই খাইয়া ঐ পাড়ার একজন লোক মারা যায়। লোকে সেইজন্য মিঠাই বিক্রেতা ফিরিওয়ালার উপর খড়্গহস্ত হয়। ভয়ে কোন ফিরিওয়ালা সেই অবধি আর সহরে বাহির হইত না। ভরত এ কথা জানিত, কিন্তু অতটা খেয়াল করে নাই। এখন সে এই নির্য্যাতনের জন্য নিজের বিবেচনার নিন্দা না করিয়া স্বীয় মন্দ ভাগ্যের প্রতি শত ধিক্কার দিতে দিতে চলিয়া গেল। পাঠক, ইহা অদৃষ্ট না নির্ব্বুদ্ধিতা?

প্রহার খাইয়া ভরত প্রতিজ্ঞা করিল, আর সহরে থাকিব না। যে দিকে চক্ষু যায়, সেই দিকে চলিল। কিছুদূর যাইয়া দেখে যে, একদল সৈন্য কোথায় যাইতেছে। ভরত তাহাদের দলে মিশিয়া গেল। ভাবিল, তাহার যেরূপ অদৃষ্ট, তাহাতে তাহার মৃত্যুই মঙ্গল। অদৃষ্টে যদি মৃত্যু থাকে, কে নিবারণ করিবে? সৈন্যগণ ত যুদ্ধে যাইতেছে। গুলির আঘাতে তাহার যদি মৃত্যু লেখা থাকে, তবে তাহাই হইবে। এই ভাবিয়া ভরত সৈন্যদলের সহিত চলিল।

সৈন্যগণ একদিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গার চড়ায় ছাউনি করিল। আহারান্তে সকলেই নিদ্রিত হইল। ভরতের কিন্তু ভাল নিদ্রা হয় নাই। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাহার তামাক খাওয়ার বড় ইচ্ছা হইল। হুঁকাটি হাতে লইয়া সে শিবিরে অগ্নির অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সহসা চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল, কি একটা উজ্জ্বল পদার্থ বালির উপর পড়িয়া আছে। কুড়াইয়া দেখিল, একটা হীরক অঙ্গুরীয়। ভরত আংটীটা কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে

পরিল। তাহার পর যেমন তাড়াতাড়ি আগুণ লইতে যাইবে, অমনি আংটীটা পড়িয়া গেল। ভরত খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু যেখানে খুঁজিতেছিল, সেইখানে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা ছিল। একটা ঘোড়া এমন বেগে ভরতের মস্তকে পদাঘাত করিল যে, সে চীৎকার করিয়া বহুদূরে পড়িয়া গেল। ভরতের চীৎকারে সৈনিকগণের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় অনেকেই তাহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার নিকট একটা ভাল আংটী আছে, দেখিয়া সকলেই তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল ও প্রহার করিতে করিতে সেনাপতির নিকট লইয়া গেল। সেনাপতি একজন হিন্দু। বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি ভরতকে ছাড়িয়া দিলেন। ভরত আংটীটি পাইল না; প্রহারটা যাহা লাভ হইল। ভরত ভাবিল, এ সকলই তাহার অদৃষ্টের দোষে ঘটিল।

কিছুদিন শয্যাগত থাকিয়া ভরত পুনরায় উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল। একস্থানে দেখিল, কতগুলি সৈনিক কর্ম্মচারী কাফি পান করিতেছে। ভরত সেইখানে যাইয়া দাঁড়াইল। একজন কর্ম্মচারী একটি অঙ্গুরীয় হারাইয়া যাওয়ায় বড় দুঃখ করিতেছিলেন। ভরত তাঁহাকে অঙ্গুরীয়কের কথা সমস্ত বলিল। তিনি সেনাপতির নিকট প্রার্থনা করায় সেটি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। কর্ম্মচারী মহাশয়, অতীব সন্তুষ্ট হইয়া ভরতকে শতমুদ্রাপূর্ণ একটি থলিয়া দিলেন। ভরত মহানন্দে থলিয়াটি লইয়া প্রস্থান করিল।

পাঠক মনে করিবেন না যে, টাকা পাইয়া ভরতের দুঃখ ঘুচিল। এই টাকা কয়েকটি তাহার আরও দুঃখের কারণ হইয়া উঠিল। একদিন শিবিরের সকলকে নিদ্রিত বিবেচনা করিয়া ভরত টাকা কয়েকটি গণিতে আরম্ভ করিল। বেশ করিয়া গণিয়া দেখিয়া আবার নিজের কাছে রাখিল। পরদিন সন্ধ্যার সময় জনকতক লোক ভরতকে গুলি খাইবার নিমন্ত্রণ করিল। ভরত মনের সুখে অহিফেন ধূম পান করিল। অতিরিক্ত ধূমপানে সে চেতনা হারাইল। যখন চেতনা হইল, তখন দেখিল যে, সে এক বৃক্ষতলে শুইয়া আছে। তাড়াতাড়ি দেখিল থলিয়াটি আছে কি না? হাঁ, থলিয়া আছে—পূর্ণই আছে—যাহা হউক, ভরতের ধড়ে প্রাণ আসিল, কিন্তু ওকি, টাকার মতত বোধ হইতেছে না। সর্ব্বনাশ! টাকা কোথায়? সব যে পাথর! হাহাকার করিয়া হতভাগ্য ভরত কাঁদিল। হায়! কেন সে দুষ্ট লোকের কথায় ভুলিয়াছিল! ইহা তাহার অদৃষ্টের দোষ সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, সৈন্যদের গোলে আহার একরূপ চলিতেছিল, কিন্তু গুলির

পয়সা কে দিবে? গুলির মৌতাত হইলে যে মহাবিপদ উপস্থিত হয়! সৌভাগ্য-ক্রমে একটা উপায় হইল। সৈন্যদলে যে সকল বণিক আহার্য্য যোগাইত, তাহাদের একজনের সহিত ভারতের ভ্রাতার পরিচয় ছিল। সে ভরতকে কিছু কিছু টাকা ঋণ দিতে লাগিল। বণিক ভাবিয়াছিল, নরহরি ভরতের ঋণ পরিশোধ করিবে। এইরূপে টাকা পাইয়া ভরত মহানন্দে একদিন প্রচুর পরিমাণে গুলি খাইল। নেশায় বিভোর হইয়া সে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল। সৈন্যগণ সেই সময় লক্ষ্য ভেদ শিক্ষা করিতেছিল। লক্ষ্যটি যে দিকে ছিল, ভরত সেই দিকে উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতেছিল। একটি ভদ্রলোক তাহার এই নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, যে দৈবাৎ গুলি লাগিয়া তাহার ভবলীলা শেষ হইতে পারে। কিন্তু সে হিতৈষীর কথায় কর্ণপাত করিল না। সৈনিকগণ বন্দুক তুলিতেছে দেখিয়া ভদ্রলোকটি সরিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই ভরত এক গুলির আঘাতে ভূতলশায়ী হইল।

নবাবীকাণ্ড, কে কাহার খবর রাখে? তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত দয়ালু ভদ্রলোকটির যত্নে একজন চিকিৎসক ভরতের শরীর হইতে গুলি বাহির করিয়া দিল। শুশ্রূষাও একরূপ হইতে লাগিল। এদিকে সৈন্যগণ শিবির ভাঙ্গিয়া পাটনা যাইতে আদিষ্ট হইল। রুগ্নদিগের নিয়ম এইরূপ ছিল, যে যাহাদের পীড়া উপশমের সম্ভাবনা খুব কম, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা হইত। ভারতের চিকিৎসক তাহাকে শয্যা হইতে উঠিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ভরত সে নিষেধ শুনে নাই। জ্বর যখন ছাড়িত, তখন সে একবার বেড়াইয়া আসিত। ইহাতে ফল এই হইল যে, যেদিন সৈন্যগণ শিবির ভঙ্গ করিল, সেদিন ভরতের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে, যে তাহাকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং সে সেই স্থানেই পরিত্যক্ত হইল।

সেই জনহীন গঙ্গা-সৈকতবক্ষে ভরত রুগ্নশয্যায় একাকী। কলস্বনা ভাগীরথী আপন সুখে বিহ্বলা হইয়া চলিয়াছে। ভরতের দুঃখে দুঃখী হইবার কেহ তথায় নাই। হায়! নিশাগমে নিশ্চয়ই শৃগাল কুক্কুরে তাহার জীবনের লীলা শেষ করিয়া দিবে! শতবার ভরত আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করিল। আগতপ্রায় মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি তাহার সমক্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। যন্ত্রণায়, ভয়ে ও নিরাশায়, ভরত চক্ষু মুদিত করিল। সহসা পদসঞ্চারের শব্দ তাহার শ্রুতিগোচর হইল। তন্দ্রাবশে ভরত ভাবিল,

যেন যমদূত তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। ভরত চক্ষু মেলিল না। পরক্ষণে কে যেন করুণামাখা স্বরে ডাকিল, "কে তুমি এ অবস্থায় এখানে?" ভরত চক্ষু মেলিয়া দেখিল, একটি সৌম্যমূর্ত্তি তাহার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান। ক্ষণেকের জন্য তাহার হৃদয়ের ঝড় থামিয়া গেল। ভরত মৃদুস্বরে তাঁহার নিকট নিজের দুরদৃষ্টের কথা বিবৃত করিল। ভদ্রলোকটি দয়াপরবশ হইয়া ভরতকে নিজের নৌকায় লইয়া গেলেন। তিনি বণিক। বাণিজ্য উদ্দেশে আগরা যাইতেছিলেন।

উক্ত বণিকের যত্নাতিশয়ে ভরত শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিল। তিনি তাহাকে মাসিক বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া, নিজের অধীনে একটি কর্ম্ম দিলেন। এইরূপে কিছুদিন চলিয়া গেল।

আগরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উক্ত বণিক কিছু তুলা ক্রয় করিলেন। বস্তা বস্তা তুলা নৌকার উপর বোঝাই করা হইতে লাগিল। আগরায় তখন বড় চোরের উপদ্রব ছিল। সেই জন্য ভরতের প্রভু ভরতকে সাবধানে তীরে থাকিতে বলিয়া স্বয়ং নৌকার উপর গেলেন। মজুরেরা নৌকায় তুলা লইয়া যাইতে লাগিল। ভরত আপন মনেই বসিয়া আছে। কত কি চিন্তা করিতেছে। এমন সময় মজুরেরা বলিল যে সমস্ত বস্তা নৌকায় তোলা হইয়াছে। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভরত নৌকায় চলিল। নৌকায় যখন বস্তা গণনা করা হইল, তখন দেখা গেল যে তিন বস্তা তুলা কম হইল। কিরূপে তিন বস্তা তুলা অপহৃত হইল, ভরত তাহার কোন কারণ দেখাইতে পারিল না। তাহার প্রভু অতি দয়ালু, ভরতকে কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া, ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া চলিতে উপদেশ দিলেন। ভরত ভাবিল, তাহার অদৃষ্টের দোষে তুলা অপহৃত হইয়াছে।

যথা সময়ে নৌকা আগরা ছাড়িল। বিনা বিপদে অনেক দিন কাটিয়া গেল। একদিন রাত্রিকালে নৌকাস্থিত সকলে নিদ্রিত হইয়াছে। ভরতের আফিঙের ধাতু। প্রগাঢ় নিদ্রা হয় না। সে হুঁকাটি লইয়া তুলার বস্তায় বসিয়া তামাক খাইতেছে। তামাক টানিতে টানিতে তাহার ঢুল আসিল। অমনি কলিকার আগুণ তুলার বস্তায় কখন পড়িয়া গেল, ভরত ঘুমের ঘোরে তাহা জানিতে পারিল না। ক্রমে যখন ধূমে নৌকা পরিপূর্ণ হইল, তখন সকলে জাগিল। ভরত অবশ্য পূর্ব্বে জাগিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যাহা হউক, সকলের যত্নে অনেক তুলা রক্ষা হইল। ভরতের

"আমাদের ভ্রাতাগণের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেলে এই মধ্যম ভ্রাতা 'যাসনয় পলিয়ানা'র পল্লী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। সে সময়ে দাস (Serfs) দিগের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তিনি সর্ব্বপ্রথম বুঝিলেন ও প্রচার করিলেন যে, দাসগণের সর্ব্ববিধ মঙ্গলসাধনকল্পে যে জমিদার নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় না করেন, তিনি মহাপাপী। দাসগণের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন—রুশিয়া দেশে জমিদারদিগের মধ্যে এই কর্ত্তব্যের বোধ এই প্রথম।

"ইহার পর তাঁহার মনে হইল যে কি প্রকারে তিনি দেশের হিতসাধনে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন। ভাবিয়া দেখিলেন যে আইন প্রণয়ন ব্যাপারের মধ্যে যদি তিনি কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা দেশবাসিগণের হিত হইতে পারে। তদনুসারে তিনি রাজধানী পিটার্সবর্গে গমন করিলেন; অনেক বড়লোককেই জিজ্ঞাসা করিলেন 'এমন কি কার্য্য আমি করিতে পারি যাহার দ্বারা দেশের যথার্থ হিত সাধিত হইতে পারে?' তিনি যাঁহাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারা রুষদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, দেশের হিতসাধন করা যে একটা অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য কার্য্য, এই বৃত্তি যে মানবাত্মার একটা স্বাভাবিকী ও অনিমিত্তা বৃত্তি, আমরা কেবল বহুশতাব্দীব্যাপী কুশিক্ষা, কুআদর্শের অনুবর্ত্তনে স্বার্থপর হইয়া কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সুখ স্বচ্ছন্দতার অন্বেষণে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিতেছি। দেশের সেবার জন্য, সাধুব্যক্তির প্রাণ সত্য সত্যই কাঁদিয়া উঠিতে পারে, এ কথা ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের কখনই মনে হয় নাই এবং এমন প্রশ্নও পূর্ব্বে কেহ তাঁহাদের করে নাই। সুতরাং তাঁহার এই নূতন ধরণের প্রশ্ন শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরিশেষে তিনি এই উপদেশের জন্য এক বন্ধুর শরণাপন্ন হইলেন, তিনি বলিলেন 'দেখ তুমি রাজসরকারে চাকুরি করিয়া দেশের হিত করিতে চাও, কিন্তু তাহা পারিবে না, তোমার যদি কিছু ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ইহাতে তাহারই পরিতৃপ্তি হইবে।' এ প্রকারের কথা পূর্ব্বে কেহ তাঁহাকে বলে নাই। তিনি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার বন্ধুর কথাই যথার্থ। তিনি একেবারে নিরাশ হইলেন; জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট, আশ্রয়শূন্য ও আনন্দবিহীন হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় রাজধানী হইতে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। শূন্য, সমস্তই শূন্য—অসাড় জীবন উপযোগিতাহীন, সাধু-সঙ্কল্প অন্তরে উঠিয়া অন্তরেই মিলাইয়া গেল—তাহারা আর এ জীবনে সফল হইবে না!

"দেশে ফিরিয়া তাঁহার জীবন পূর্ব্বের মতই কাটিতে লাগিল, সাধু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের লোক সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গতায়াত করিত এবং তিনি এই প্রকারের লোকের সহিত মিশিতে বড় ভাল বাসিতেন। এই ভাবে যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার জীবনে এক ভীষণ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তাঁহার এক অসৎ প্রকৃতির বন্ধু জুটিল, তাহার সহিত মিশিয়া অল্প অল্প মদ খাইতে লাগিলেন, ক্রমশঃ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের সহিত মিশিতে ও অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। 'মাসা' নাম্নী এক গণিকাকে নিজের গৃহে আনিয়া রাখিলেন। এই ভাবে পাপাচরণের মধ্যে থাকিতে থাকিতে তিনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া মস্কো হইতে দেশে ফিরিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। এই প্রকারে উপযুক্ত কার্য্যের অভাবে এক প্রতিভাশালী মহৎ জীবনের শেষ হইল।"

যাহা হউক, আমরা লিও 'টলষ্টয়'এরই জীবনী বর্ণনা করি।

চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে একুশ বৎসরের মধ্যে লিও টলষ্টয় যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করেন তন্মধ্যে ইংরাজী প্রসিদ্ধ লেখক ডিকেন্সের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ডিকেন্সের বিখ্যাত মত বিশেষ ভাবেই আলোচ্য। যাঁহারা ডিকেন্সের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে ডিকেন্স পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যাবলীর উপর বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তথায় যে সমস্ত বক্তৃতা হয় ও কার্য্যাদি হয়, তাহাকে "Formal piling of words" বলিতেন। কেবল 'কথার' পরে কথা'।

টলষ্টয়ের অন্তর্জীবন গঠনে, ডিকেন্সের প্রভাব অপেক্ষাও ফরাসী লেখক বিখ্যাত 'রুশো' (Rousseau)র প্রভাব অধিক। এই লেখক সম্বন্ধে টলষ্টয় স্বয়ং বলিয়াছেন—

"I have read the whole of Rousseau—all his twenty volumes including his Dictionary of Music. I was more than enthusiastic about him, I worshipped him. At the age of fifteen I wore a medallion portrait of him next my body instead of the Orthodox Cross. Most of his pages are so akin to me that it seems to me that I must have written them myself."

"আমি রুশো'র সমস্ত গ্রন্থ—তাঁহার কুড়ি খণ্ড গ্রন্থই পড়িয়াছি। এমন কি তাঁহার সঙ্গীত বিষয়ক অভিধানও আমি পড়িয়াছি। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে আমি কত আনন্দিত হইতাম, তাহা আর কি বলিব। আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম

কোল্লিখিত বিবরণের উল্লেখ ও তাহার আলোচনা প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ হইবে।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের ধারণা যে, বীরভূমির অধিকৃত স্থান সমূহ শ্বাপদসঙ্কুল, জঙ্গলাবৃত ও অসভ্য বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল। একথা আমরা একবারে অস্বীকার করিতে পারিব না ; তবে মধ্যে মধ্যে যে সমৃদ্ধিশালী সুসভ্য জনপদ এবং শ্রমজীবী ও নানাবিধ শস্যোৎপাদনকারী কৃষকদিগের বিরলবসতি গ্রামের সংখ্যা যে নিতান্ত ন্যূন ছিল, তাহাও বলিতে সাহস করি না। পরন্তু, যে সকল স্থানে সত্য সত্যই নিবিড় অরণ্যরাজি বিরাজিত ছিল, প্রবাদ বা জনশ্রুতি, তত্তৎ স্থানের সহিত, ভগবত্তুল্য ঋষিগণের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত করিয়া অরণ্যের শ্বাপদশঙ্কা দূরে নিক্ষেপ করতঃ যেন তপোবনের যজ্ঞধূম বিচ্ছুরিত পূত ঘ্রাণে আমোদিত ও সশিষ্য ঋষিগণের বেদগানে মুখরিত করিয়া তুলে।

এই সকল বিবরণ প্রবাদ মূলক হইলে ও অবশ্য পৌরাণিক যুগ অথবা তাহার আরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বলিয়া স্পর্দ্ধা করে এবং আমরাও কোন মতে ইহাদিগকে আধুনিক যুগের অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রস্তুত নহি।

অদ্য আমরা এইরূপ বীরভূমির অন্তর্নিবিষ্ট ও ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থান সম্বন্ধে কয়েকটি পুরাবৃত্ত মূলক প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। *

তারাপুর—মহাঋষি বশিষ্ঠ তারামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বহু সাধনার পরও সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। পরে, নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কামরূপ হইতে তারাদেবীকে আনয়ন করিয়া তারাপুর বা চণ্ডীপুরে স্থাপন করেন এবং উত্তর বাহিনী দ্বারকা নদীর তীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া অনেক অসাধ্য সাধনার পর সিদ্ধি লাভ করেন।

গোপালপুর—লাভপুর থানার অধীনে গোপালপুর নামক গ্রামের নিকটস্থ স্থানে দুর্ব্বাষা ঋষির তপস্যাভূমি ও আশ্রম ছিল। এখন তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন। ঋষি-পূজিতা শিলারূপী দেবীও এখন পর্য্যন্ত বিরাজমানা। দুর্ব্বাসা ঋষির আশ্রমের

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবাদগুলির মধ্যে অধিকাংশ প্রবাদ বীরভূম জজকোর্টের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। লেখক।

সান্নিধ্য অনুসারে, গোপালপুর 'দুব্‌সো গোপালপুর' * বলিয়া ধ্বনিত হইয়া থাকে।

মুলুক—বোলপুর থানার অন্তর্গত মুলুক নামক গ্রামের প্রান্তরে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

সুপুর ও বোলপুর—এই স্থানে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীবর্ণিত সুরথ রাজার বাসভূমি বলিয়া কথিত হয়। মৃত্তিকাতলে এখনও অনেক বৃহৎ বাড়ীর ভগ্নাবশেষের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সুরথ রাজার পূজিত সুরথেশ্বর শিব এখনও বিরাজমান। কথিত আছে, তিনি ভগবতী সুভিক্ষা দেবীর নিকট লক্ষ বলি প্রদান করিয়াছিলেন ; সেই লক্ষ বলি যে স্থানে সংগৃহীত হইয়াছিল, সেই স্থান ক্রমশঃ গ্রামে পরিণত হইয়া 'বলিপুর' বা বোলপুর বলিয়া খ্যাত হয়।

কোটাসুর—(আসুরের কোষ্ঠ বা কোঠা) মহাভারতোক্ত বকাসুর নামক অসুরের আবাসভূমি। এই অসুর ভীম কর্ত্তৃক নিহত হয়। যতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া পাণ্ডবগণ কোটাসুরের সন্নিহিত স্থানে একচক্রায় আসিয়া উপস্থিত হন। বকাসুরের নিধনের কথা, আর বিশেষ করিয়া বিবৃত করিবার আবশ্যকতা নাই।

ভাণ্ডীর বন—এই ভাণ্ডীরবনে এক অনাদিলিঙ্গ শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনি 'সিদ্ধনাথ' বলিয়া খ্যাত ছিলেন। রামায়ণোক্ত বিভাণ্ডক ঋষি বহুকাল ধরিয়া এই শিবপূজা করায়, ঋষির নামানুসারেই 'ভাণ্ডেশ্বর' বলিয়া অভিহিত হন। বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম ও তপস্যাভূমি বলিয়া এই স্থানও 'ভাণ্ডীরবন' বলিয়া ধ্বনিত হয়। এই বিভাণ্ডক ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির পিতা।

এই ভাণ্ডীরবনে ও তৎসংলগ্ন বীরচন্দ্রপুর গ্রামে যথাক্রমে শ্রীশ্রী৺গোপালজী ও কালীর বিগ্রহ মূর্ত্তি বিরাজমান। এই উভয় দেবতা সম্বন্ধে এক পৌরাণিক প্রবাদ প্রচলিত আছে। মহাভারতোল্লিখিত জরাসন্ধ রাজা মগধ বা বিহারে রাজত্ব করিতেন ; কালিকা দেবী তাঁহার কুলদেবতা ছিলেন। জরাসন্ধ নিহত হইলে, কালিকাদেবীর বিগ্রহমূর্ত্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিবারবর্গকে স্থানান্তরে গমন করিতে নির্দ্দেশ করেন ; এবং অভাব হইলে, নিজে তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এক্ষণ যেস্থলে রাজনগর বর্ত্তমান আছে, তৎসন্নিহিত স্থানে আসিয়া তাঁহারা নির্জ্জনে অরণ্য মধ্যে সেবা প্রকাশ করিলেন। ইঁহাদেরই শেষ বংশধর বীররাজা। মুসলমান

* গোপালপুরের অতি নিকটে দুব্‌সা নামে স্বতন্ত্র একখানি গ্রামও আছে। বীঃ সঃ।

সুতরাং আমার অনেক উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ প্রকারের অবস্থা আমার জীবনে এই নূতন। যদি কোনও উদ্যমশীল যুবক জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে রুশিয়া দেশের মধ্যে পিটার্সবর্গই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান।"

১লা মে তারিখে তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাকে আর একখানি পত্র লেখেন;—অবশ্য এই পত্রের সুর পূর্ব্বোক্ত পত্রের সুর হইতে বিভিন্ন।

"তুমি অবশ্যই মনে করিতেছ যে আমি অত্যন্ত অসাড়। বাস্তবিকই তাই। আমি যে কি করিয়াছি তাহা ভগবানই জানেন! আমি যে কেন পিটার্সবর্গে আসিয়াছিলাম, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—এখানে আসিয়া অবধি এপর্য্যন্ত কাজের মত কাজ কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই, কাজের মধ্যে কেবল অকারণ অজস্র টাকা খরচ করিয়াছি; এখন দেনার দায়ে বিব্রত। হায় আমি কি ভয়ানক মূর্খ! এখন আমার যে কিরূপ মনস্তাপ হইতেছে তাহা আর তোমাকে কি বলিব! এখন কথা এই যে এই সমস্ত দেনা অবিলম্বেই শোধ করিতে হইবে, যদি শীঘ্র শোধ করিতে না পারি, তবে টাকা ত তাহারা আদায় করিবেই, অধিকন্তু আমার সম্মানটুকুও সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে তুমি আমার কথায় খুব রাগিয়া উঠিবে। কিন্তু এখন উপায় কি? এরকমের ভুল মানুষ জীবনের মধ্যে কেবল একবারই করে। এখানে আসিয়া আমি একেবারে স্বাধীন হইয়া পড়িলাম, নিষ্কর্ম্মা হইয়া কেবল বড় বড় কল্পনা করিতে লাগিলাম, সেইজন্যই আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। এখন দয়া করিয়া এই দেনার হস্ত হইতে যাহাতে আমার অব্যাহতি ঘটে শীঘ্র শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা করিও; আমি একেবারে কপর্দ্দকশূন্য ও দেনায় বিব্রত জানিবে।"

যাহা হউক পিটার্সবর্গে থাকিবার সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু শেষ পরীক্ষা আর দিলেন না, তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি অশ্বারোহী সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের কথা। হাঙ্গেরী প্রদেশে বিদ্রোহ হইয়াছে, তাহাই দমন করিবার জন্য রুশিয়ায় সৈন্য-সজ্জা হইতেছিল।

শেষে নানা কারণে তাঁহার সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করাও হইল না, আইনের তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি গ্রহণ করাও হইল না। তিনি রাজধানী হইতে এক সঙ্গীতাচার্য্য বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া 'য়াসনয়'এর পল্লীভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৮৪৮ হইতে ১৮৫১ পর্য্যন্ত এই তিন বৎসর তিনি কখনও 'য়াসনয়'এ, কখনও বা মস্কো নগরে থাকিতেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনের আদর্শগত কোনরূপ স্থিরতা ছিল না। কখন কখন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার মত ব্রহ্মচর্য্য ও কঠোর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইতেন, আবার কিছুদিন যাইতে যাইতে সে প্রকারের নিবৃত্তিমূলক জীবন আর ভাল লাগিত না, তখন একেবারে ভোগের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, খুব মদ খাইতেন, শিকার করিতেন, জুয়া খেলিতেন। ইহা ছাড়া আরও একটা উপসর্গ ছিল, তাঁহাদের দেশের একদল নিম্নশ্রেণীর সুন্দরী স্ত্রীলোক দল বাঁধিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়;—তাহাদের দলে যথেচ্ছাচারী হইয়া কয়েক দিন বেড়াইতেন। তাঁহার জীবনের এই তিন বৎসর একেবারে উপযোগিতাবিহীনতার ফল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও তাঁহার আত্মসম্বরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তাঁহার দৈনন্দিন লিপি আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, প্রথমেই নিজেকে তিরস্কার করিতেছেন, অনুতাপ করিতেছেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আর এমন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিব না, বিশেষভাবে সংযমের সহিত নিজের উন্নতি বিধান করিব। সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক কার্য্যের এক কঠোর তালিকা প্রণয়ণ করিলেন, কখন কি করিবেন সমস্তই স্থির হইয়া গেল। এই নিয়মে অবশ্য কিছুদিন চলিল, কিন্তু এ সংযম স্থায়ী হইল না, উদাস প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি আবার বিপথগামী হইলেন।

সাধারণ প্রজাবৃন্দের শিক্ষার জন্য তিনি এই সময়ে একটী বিদ্যালয়ও স্থাপনা করিয়াছিলেন। দুই বৎসর ইহার কার্য্য কোনরূপে চলিল, কিন্তু শেষে অর্থাভাবে ইহা বন্ধ হইয়া গেল। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নানারূপ অমিতব্যয়িতার ফলে তাঁহার অর্থ কষ্টও অত্যন্ত অধিক হইল।

লিও টলষ্টয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাস্ সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। তিনি ককাশাস্ প্রদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি ছুটি লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার জীবনে আর এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল।

৪

বলিস্‌না তোরা আর সে যে ধন আদরের,
বাঙ্গালার বুক জোড়া,
ভারতের মাটী খোঁড়া,
বিন্দু অমঙ্গলে তার বুকে এসে বাজে ঢের ;
এখনো তাহার কত,
অনুচর শত শত,
পারে বিসর্জ্জিতে প্রাণ, বিন্দু সুখ তরে তার ;
সে কিসের দুঃখী তার বহু আছে আপনার !

৫

এখনো নবীন আছে কুরুক্ষেত্রে নিমগন,
বরদার অবসরে,
এখনও মধু ঝরে,
রবীন্দ্রের বীণা তানে মেয়ে ছড়া আলাপন ;
ওই আরো শত শত,
সোদর সোদরা কত,—
তারি মুখ পানে চাহি "মালঞ্চ" গ'ড়েছে সুখে ;
"প্রদীপ" "কনকাঞ্জলি" তুলিয়া রেখেছে বুকে।

৬

এখনো তাহার আছে, অনেকের যাহা নাই,
কবি অন্ধ ! সেকি কথা ?
শুনি বুকে বাজে ব্যথা,
কবির সহস্র নেত্র বিস্ফারিত সব ঠাঁই ;
কবির আনন্দ মন,
অমরের নিকেতন,
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী কবি, কবির উন্নত প্রাণ ;
ভাণ্ডারে, ভাণ্ডারে হেম কবি মহাধনবান !

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ] আশ্বিন। [১২শ সংখ্যা।

প্রবাদ প্রসঙ্গ।

৩। অর্জ্জুন রায়।

দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত খয়রাশোল আউট্ পোষ্টের চারি মাইল পশ্চিমে রসওয়া নামক একটি গণ্ডগ্রাম আছে। উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে সুবিস্তৃত প্রস্তরময় ভাঙ্গায়, অনাদিলিঙ্গ শিবের মন্দির বিরাজ করিতেছে। তিনটি প্রস্তর গঠিত উচ্চ মন্দির ; প্রথমটিতে অনাদিলিঙ্গ শিব, দ্বিতীয়টিতে কালী-মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে ; তৃতীয়টী শূন্য,—সম্প্রতি কোন দেবতার অধিষ্ঠান আছে বলিয়া মনে হয় না। এই শূন্য মন্দিরের উপরিভাগে বটবৃক্ষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া মন্দিরগাত্রে মূল প্রবেশ করাইয়া ইহাকে একবারে জীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কালীর মন্দিরের উপরিভাগ বটবৃক্ষটি এমনিভাবে আপনার মূল দ্বারা আবৃত করিয়াছে যে, কেবল মাত্র অতি ক্ষুদ্র প্রবেশদ্বার ভিন্ন বাহির হইতে মন্দিরের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হয় না। উপরন্তু, ঘনপল্লব বিশিষ্ট সুদীর্ঘ শাখাসমূহ আপনাপন অঙ্গ বিস্তার করিয়া সৌরকর প্রবেশের পথ একবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। অনাদিলিঙ্গ শিবের মন্দিরটি তত ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। এই মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে খোদিত লিপিযুক্ত একটি বৃহৎ প্রস্তর-ফলক সংলগ্ন আছে। অতি কষ্টেও সমগ্র পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই। প্রস্তরফলকে এইরূপ লেখা আছে ;—

শ্রীঅর্জ্জুনরায়েন... ... ...
... ...শকাব্দা
... ... যু ... ...
ফাল্গুনে ...১৫৬৪

মন্দির-প্রাঙ্গণের পূর্ব্বোক্ত তিনটি বৃহৎ একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ শিবলিঙ্গ বিরাজমান। এই মন্দির গাত্রেও অতি স্পষ্টভাবে এই কয়টি কথা খোদিত আছে।

ত্রিপার্শ্বে স্বল্পোর্দ্ধ ইষ্টকময় প্রাচীর গ্রথিত আছে। প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ব্যতীত প্রাচীর সংলগ্ন আর ও ছাদ বিশিষ্ট ইষ্টকময় মন্দির আছে। ইহাতেও

"শকাব্দ ১৫৬১ শ্রীঅর্জ্জুন রায়স্য"

এই অনাদিলিঙ্গ শিব সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের সম্প্রতি সে সকলের আলোচনা আবশ্যক হইতেছে না। আমাদের আবশ্যক, এই অনাদিলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা অর্জ্জুন রায় চৌধুরী সম্বন্ধীয় প্রবাদের অনুসন্ধান করা।

এই অর্জ্জুন রায় চৌধুরীর বাটী অধুনা রাণীগঞ্জ সবডিবিজনের অন্তর্গত সর্পী নামক গ্রামে। ইঁহার বংশধরেরা এক্ষণ সর্পী ও কোমরডিহী উভয় গ্রামেই বাস করিতেছেন। শিলালিপিতে ১৫৬৪ শকাব্দার কথা খোদিত আছে; তাহা হইলে অর্জ্জুন রায় খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক (১৬৪২ খৃঃ ও ১৩৪৯ সাল)। ইনি অতি বিষয়বৈভবশালী লোক ছিলেন এবং নানা স্থানে মন্দির স্থাপন প্রভৃতি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

উপকথা—কোন্দা গ্রামের ঘনশ্যাম গোস্বামী, তৎকালে, একজন তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। 'কারণ' সেবন করার জন্য ইনি অর্জ্জুন রায় কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভাবে নিন্দিত হন। এই নিমিত্ত তিনি তাহার 'কারণ'-বাহককে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে দুগ্ধ বলিয়া উত্তর করিতে অনুমতি প্রদান করেন। একদিন, ঘটনাক্রমে, বাহক কারণ লইয়া যাইবার সময় অর্জ্জুন রায়ের সম্মুখে পতিত হয় এবং অর্জ্জুন রায় কি আছে জিজ্ঞাসা করিলে দুগ্ধ আছে বলিয়া উত্তর প্রদান করে। গোস্বামীর ক্ষমতা প্রভাবে 'কারণ,' দুগ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। ইতিমধ্যে ঘনশ্যাম গোস্বামী সেই স্থানে উপস্থিত হন। অর্জ্জুন রায় এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াও কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া সদর্পে বলিলেন যে, যদি উহা প্রকৃত দুগ্ধই হয়, তবে জ্বাল দিয়া উহা হইতে ঘৃত উৎপাদন করা হউক। গোস্বামী মহাশয় ইহাতেও অকৃতকার্য্য হইলেন না। কিন্তু তিনি অতিশয় রাগান্বিত হইয়া বলিলেন যে, এই ঘৃত লইয়া আমি পূর্ণাহুতি প্রদান করিব এবং আমাকে যে তুমি অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছ, তজ্জন্য তাহার প্রতিফল স্বরূপ তোমাকে হয় "নিঃসন্তান"

নয় "নির্ভূম" করিব। অর্জ্জুন রায় অনন্যোপায় হইয়া, শেষোক্ত বিধানই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন। কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। *

অর্জ্জুন রায়ের বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই এখন সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু অর্জ্জুন রায়ের সাক্ষাৎ বংশধরগণ তত বর্দ্ধিষ্ণু নহেন।

৪। ঘনশ্যাম গোস্বামী।

নাড়া নাচে, পাঁঠা কাটে,
দেখে এলাম কোন্দার পাটে।

পূর্ব্ব প্রবাদে ঘনশ্যাম গোস্বামীর কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইনি একজন তান্ত্রিক-সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি যে কেবল তন্ত্রমতের 'গোঁড়া' ছিলেন তাহা নহে; বৈষ্ণব-ধর্ম্মেও তাঁহার সমধিক আস্থা ছিল। তিনি গোপাল ও কালিকা দেবীর বিগ্রহ মূর্ত্তি একত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার 'শাসন'ও যথেষ্ট ছিল এবং সেই জন্য তিনি পরস্পর দুই বিভিন্ন মতের সমন্বয় রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলিতে কি, শাক্ত মতে কালিকা দেবীকে উৎসর্গ করিয়া বলী প্রদানের সময়েও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী গোপালভক্তগণ নৃত্য করিতে থাকিত—মনে আদৌ বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইত না। এই কথা, ললাটোদ্ধৃত শ্লোকটি এখনও আমাদের মনে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

ঘনশ্যাম গোস্বামী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রবাদ এই যে, তিনি জীবন্ত অবস্থায় সমাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই সমাধি এবং যে কাষ্ঠ-পাদুকা তিনি ব্যবহার করিতেন, তাহা এক্ষণ পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

উপকথা—পূর্ব্ব প্রবাদে বর্ণিত উপকথা ব্যতীত ঘনশ্যাম গোস্বামীর সম্বন্ধে, তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয়ক আরও একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। কোন এক শিষ্য তাঁহাকে একটী গোবৎস প্রদানে উৎসুক হইলে, তিনি এই বৎস কালে দুগ্ধবতী হইলে গ্রহণের অভিমত প্রকাশ করেন। শিষ্য গাভীর আশাতীত দুগ্ধের সঞ্চার দেখিয়া মায়াবশতঃ অন্য এক গাভী গোস্বামী মহাশয়ের সমীপে আনয়ন করেন। গোস্বামী মহাশয় ইহা বুঝিতে

* কেহ কেহ এই ঘটনা, মাধবচন্দ্র রায় চৌধুরীর সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া, 'মাধবো নির্ভূমো-ভব' স্বীয় মতের পোষকতা স্বরূপ এই শ্লোকার্দ্ধ আবৃত্তি করেন। লেখক।

পারিয়া শিষ্যকে এই গাভী পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শিষ্য কিন্তু আপনার চাতুরীর কথা কোন মতেই স্বীকার করিল না। গোস্বামী মহাশয় এই নিমিত্ত তাহার উপর বিরক্ত হইয়া—'য', তোরে বাঘে ধরিবে'—এই বলিয়া অভিসম্পাত বা তিরস্কার করেন। তদন্তর, এই ব্যক্তি সন্ধ্যার সময়, গোস্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যখন অরণ্য অতিক্রম করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে, তখন এক ভয়ঙ্কর ও অতি বৃহৎ ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহাকে পাতিত করিয়া তদুপরি দণ্ডায়মান হয়। তখন এই গোপশিষ্য "গোস্বামী মহাশয় 'ধরিতে' বলিয়াছেন, 'খাইতে' বলেন নাই, এই কথা বলায় স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে ব্যাঘ্রের আশু করালগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইল। পর দিন প্রত্যূষে প্রতিশ্রুত গোপশিষ্য গাভী সমভিব্যাহারে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হন। গোস্বামী মহাশয়, তাহার দোষ স্বীকার করিবার পূর্ব্বে, স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা বলে, পূর্ব্ব রাত্রের সমগ্র ঘটনার কথা জানিতে পারেন। গোপশিষ্যের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া অতিশয় তুষ্টি লাভ করেন এবং তাহাকে তাহার স্বকৃত দোষের জন্য আর দণ্ডবিধান না করিয়া একবারে অব্যাহতি প্রদান করেন। *

৫। ছকু বিদ্যাবাগীশ।

বোলপুর থানার অন্তর্গত কামারডাঙ্গাল নামক গ্রামে পণ্ডিত ছকু বিদ্যাবাগীশের বাসস্থান ছিল। ইনি একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এবং দর্শনশাস্ত্রে ইহার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। ইনি, সনাতন প্রণীত শ্রীগোবিন্দ বিরুদাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ ও টীকার অনুলিপি, সিউড়ী সংলগ্ন কেন্দুর নিবাসী বিষ্ণু গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে রক্ষিত আছে। এই টীকা হইতে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা উদ্ধার করিতে সমর্থ হই নাই। তবে তিনি যে তত বেশী দিনের লোক নহেন (সন ১১ শতের শেষ ভাগ), প্রবাদ এইরূপ পরিচয় প্রদান করে।

* ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ সংখ্যক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট শ্রুত হইয়াছি। লেখক।

* বাতিকার গ্রামের জমীদারগণ কর্ত্তৃক এই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে, কার্ত্তিক পূজা ও রাস পূর্ণিমার দিবস যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত ও রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মত্তর স্বরূপ ১৮/ বিঘা ও ২/ বিঘা, মোট ২০/ কুড়ি বিঘা জমী প্রদান করা হয়।

উপকথা—তৎকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগকে শিষ্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, বিদ্যাদান করিতে বড় রাজী হইতেন না। কিন্তু ছকু বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এই বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া, তাঁহার উদা- ও মহত্ত্বের পরিচায়ক একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। উলন্‌ডিহী গ্রামের একটী গোপবালক হলকর্ষণ করিতে যাইবার সময় পথে একখানি পুস্তক পতিত রহিয়াছে দেখিয়া, তাহার মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হয় এবং তদবধি বিদ্যাশিক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, সেই গোপবালক স্বকীয় গুরুগৃহে মঙ্গলডিহীগ্রামে গমন করে; কিন্তু তাহার গুরু ব্রাহ্মণেতর জাতিকে বিদ্যাদান করিতে অসম্মত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া গোপবালক পরিশেষে ছকু বিদ্যাবাগীশের নিকট আগমন করে। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাহাকে সাদরে ও সযত্নে শিক্ষা দান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। সন্ধ্যাকাল, বর্ষায় একদিন ঘোরতর বৃষ্টিপাতের সময় বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অন্যান্য শিষ্যবর্গকে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যাপনা করিয়া বালীশ ঠেস্ দিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়েন; এবং রাত্রি শেষে গোপবালককে অধ্যয়ন নিরত দেখিয়া কি পাঠ করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন গোপবালক উত্তর করিল—'শ্রীমদ্ভাগবত।' ইহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাহার উপর ক্রোধান্বিত হইলেন না, বা কোনরূপ তিরস্কার করিলেন না। বরং তাহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের কোন্ অংশ ভাল লাগিল জিজ্ঞাসা করায়, 'শ্রুত্যধ্যায়'—এই উত্তর পাইয়া গোপবালকের উপর আরও অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরিশেষে স্বয়ং তাহাকে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইলেন।

এই গোপবালকের শব্দশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। সমারোহ উপলক্ষে পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা হইলে, বিচারের সময় বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ঠকাইবার ছলে কেহ প্রশ্ন করিলে, এই গোপবালক শ্রাবণমাত্র তাহার সদুত্তর প্রদান করিত, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে আর কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না। ইহাতে তদানীন্তন পণ্ডিতবর্গ, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অপাত্রে বিদ্যাদানের

জন্য নিন্দাবাদ করিতেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কিন্তু তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিতেন না। তৎকালীন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে অবস্থান করিয়া, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এই সাধু দৃষ্টান্ত কত উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচায়ক !*

৬। রুদ্রচরণ রায়।

মুসলমান রাজত্বের বহুপূর্ব্ব হইতে রাঢ়ীশ্রেণীর রায় উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ সিউড়ীর ৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কচুজোড় নামক গ্রামে রাজত্ব করিতেন। এক্ষণ তথায় স্বভাবজাত বন্যবৃক্ষের মধ্যে তন্নাম-প্রসিদ্ধ একটি সামান্য মাত্র গ্রাম রহিয়াছে। এই গ্রামের চতুঃপার্শ্বে এখনও নানাবিধ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত গড় ও গৃহভিত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণরাজদিগের মধ্যে রুদ্রচরণ রায় স্বীয় বাহুবলে আপন রাজত্ব বিস্তার করিয়া বিশেষরূপ বিখ্যাত হন। তিনি লোকরঞ্জক ও প্রজাপালক ছিলেন।

উপকথা—একদিন তিনি আপনার কুলদেবতা কঠ্‌ঠ্‌কাদেবীর পূজাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছিলেন, এমত সময় পুষ্কর নামক মেঘ ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহার বাটীতে ভোজন করেন। কোন অজ্ঞাত কারণে রুদ্রচরণ তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য নহেন জানিতে পারিয়া প্রকৃত পরিচয় অবগত হইবার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ প্রকাশ করেন। এই অনুরোধে পুষ্কর আত্মপ্রকাশ করেন এবং রাজার ভদ্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইবে না, এই বলিয়া বর প্রদান করেন। তদবধি লোকের বিশ্বাস যে, জৈনুজল পরগণা মধ্যে (কচুজোড়ের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি জৈনুজল পরগণার অন্তর্ভূত) বৃষ্টি অভাবে কখন শস্য নষ্ট হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবে না ;—

"পুষ্করে দুষ্করো বারি" প্রবচন, জৈনুজল পরগণায় প্রযুজ্য নহে।

রাজা রুদ্রচরণ রায়ের বাটীতে তন্ত্রোক্ত ধাতুমূর্ত্তি ষোড়শীদেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এক্ষণ তিনি ঐ গ্রামে আর এক ব্রাহ্মণ বাটীতে সেবা প্রাপ্ত হইতেছেন। মুসলমানগণের রাজ্য বিস্তার কালে এই রাজবংশ রাজ্যভ্রষ্ট

* এই প্রবাদটি কতিকারের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দলাল সিংহ মহাশয়ের নিকট শ্রুত হইয়াছি। লেখক।

হয় এবং নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। দুই চারিজন বাজীৎপুরে গিয়া বাস করেন ; তাঁহাদের মধ্যে বীরবল রায় মুসলমান রাজকর্ম্মচারীরূপে হইয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং খাঁকর নামক এক দুরন্ত দস্যুকে ধৃত করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও ঐ গ্রামে বাস করিতেছেন তাঁহারা এক্ষণ জমীদার।

রুদ্রচরণ রায়ের সহিত মুসলমানগণের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার প্রবাদ আছে। কচুজোড়ের সন্নিকট যে স্থলে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই স্থল এখন "সংগ্রাম পুর" বলিয়া খ্যাত আছে। এই গ্রাম পূর্ব্বে ভাঙ্গা মাত্র ছিল।

রুদ্রচরণের বংশাবলীর মধ্যে যাঁহারা কচুজোড়ে রহিয়াছেন, শুনিতে পাই, তাঁহারা এখন অতি হীনবেশে কালাতিপাত করিতেছেন।

শ্রীশিবরতন মিত্র।
সিউড়ী বীরভূম।

সুন্দর।

নশ্বর এ দেহ ধরে এসেছি দু'দিন তরে,
মৃত্যুমুখ জীবের জীবন,
জানি এ সংসারময় চিরস্থায়ী কিছু নয়,
প্রীতি,স্নেহ সব অকারণ ;
শুধু সে মায়ায় ভুলে পাপ এ সংসার-কোলে
শিশুসম করি ছুটাছুটী,
খেলা যবে সাঙ্গ প্রায় সময় ফুরায়ে যায়,
স্তব্ধ করে কালের ভ্রুকুটী।
তবু সে মনের দোষে দুষ্য এ আঁখির বশে
সুন্দর যা দেখি ভালবাসি।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সকলি সুন্দর দেখি,
তরুলতা, তারা, সূর্য্য, শশী।
মায়ার কুহক বলে দিবানিশি থাকি ভুলে,
অন্তিমের ভাবিনা ভাবনা।
ভাবি কিন্তু দিন যাবে, আমার কিছু না রবে,
রূপ, প্রেম, অন্তিম যাতনা।

এই সে মমতা স্মরি নয়নে ঝরিবে বারি
এইরূপ ভাসিবে নয়নে ;
সকলি কণ্টক হবে আপন কিছু না রবে,
একা রব মৃত্তিকা শয়নে।
মৃত্যুত সকলে সয়,— শুধু মনে ভয় হয়,
কি করে ভুলিব ভালবাসা ;
সংসারে সুন্দর রাখি কি করে মুদিব আঁখি,
বুকে ধরে মধুময় আশা ?
চতুর শমনে যদি মানব করিত বিধি,
তবে কি সে পারিত আমারে ;
রূপের সাগর জলে ডুবিয়ে অতল তলে
লুকাতাম জনমের তরে।
অনুরোধ প্রিয়জনে আমার মরণ দিনে
সুন্দর সলিলে স্নান দিয়া,
মৃত্তিকা শয়নে রাখি খুলে দেয় লিপ্ত আঁখি,
মরে থাকি আকাশ চাহিয়া।
উচ্চ বৃক্ষতল ছায় যেথানে বিহঙ্গ গায়,
দিবা-নিশি সঞ্চারে সমীর,
সুন্দর ফুলের বাসে অসময়ে অলি-আসে,
ঝরে না দুখের আঁখি-নীর ;
সুন্দর চাহনি দিয়া শান্ত হাসি মাখাইয়া
রূপভরা প্রকৃতি প্রতিমা,
হাতে ভালবাসা লয়ে চিরকাল সুখে চেয়ে
দাঁড়াইয়ে রহে মনোরমা।
(কিন্তু) প্রতিমা ত ভেঙ্গে যাবে, আমার(ও)কিছু না রবে,
কেমনে বা রবে সে বিজনে,
আমি যেন দেখে যাই, সংসারে সুন্দর নাই,
মৃত্যুকালে শান্তি পাই মনে।

শ্রীমহম্মদ আজীজ উস্ সোভান।

সজাতিপ্রীতি ও স্বদেশ ভক্তি।

যে দিন হইতে ইংরাজী শিক্ষার সমধিক প্রচলন হইয়াছে, সেই দিন হইতে "দেশভক্তি" "স্বাধীনতা," ইত্যাদি নানা কথা শুনা যাইতেছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, আমাদের সকল কার্য্যেই, ভাণ আছে, সত্য নাই ; কথা আছে, অর্থ নাই ; শরীর আছে, প্রাণ নাই। দেশভক্তির বেলায় তাহা হইবে না কেন ? ইংরাজের নিকট Patriotsm নামক কথা শুনিলাম। অমনি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, চট্টগ্রাম হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সকল স্থানের প্রতি আমাদের একটা মমতা জন্মিয়া গেল। অমনি আমরা কবিতায়, বক্তৃতায় বলিতে লাগিলাম, ভারতের ন্যায় দেশ নাই, হিমালয়ের ন্যায় পর্ব্বত নাই, গঙ্গার ন্যায় নদী নাই। কল্পনার মোহিনী শক্তিবলে আমরা ইংরাজকে ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে দূরীকৃত করিলাম ; হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী মান্দ্রাজী, পঞ্জাবী মারহাট্টা সকলকেই এক জাতিতে পরিণত করিয়া সাধারণ-তন্ত্র প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলাম। হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। ভাবিলাম, আমরা একটা Patrist জাতি হইয়া গিয়াছি—সভ্যতার চরমসীমায় সহসা উন্নীত হইয়াছি। কিন্তু হায়! কার্য্যে কি হইল ? দেশভক্ত হইবার পূর্ব্বে যাহা ছিলাম, তাহাই রহিয়া গেলাম। ফল এই মাত্র দাঁড়াইল, যে কল্পনার আতিশয্যে আমাদের কার্য্যকারিণী শক্তি বিনষ্ট হইয়া গেল ; আমরা আরও অসার, অপদার্থ হইয়া দাঁড়াইলাম। ইহার কারণ এই যে, আমরা একবারেই স্বদেশকে ভালবাসিতে গিয়াছিলাম।

স্বদেশকে ভালবাসিবার পূর্ব্বে যে সজাতিকে ভালবাসিতে হইবে, একথাটা আমরা আদৌ মনে করি নাই। এক দিকে যখন আমরা দেশ উদ্ধারের বক্তৃতা করিতেছি, আবার ঠিক সেই সময়েই ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের রীতি নীতি, আমাদের ধর্ম্ম কিছুই নহে ; পাশ্চত্য রীতিনীতি উন্নতির—দেশ উদ্ধারের অনুকূল। ইহাকে কি সজাতিপ্রীতি বলে ? ইহা কি বিজাতি প্রীতি নহে ? দেশের পর্ব্বত, নদী, তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি নির্জ্জীব পদার্থে মানবের প্রীতি স্বাভাবিক, না আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন ও অপর দেশবাসীর প্রীতি স্বাভাবিক ? সহজেই বলা যাইতে পারে, মানুষ মানুষকেই প্রথমে ভাল-

বাসিতে থাকে। সজাতি প্রীতি জন্মিলে তবে সজাতি অধ্যুসিত-জনপদ বা দেশ আমাদের প্রীতির পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। নচেৎ যে দেশের লোককে আমি ঘৃণা করি, অথবা স্নেহ না করি, তাহারা যথায় বাস করে, সে স্থানের প্রতি আমার মমতা জন্মিবে কিরূপে? কিন্তু হায়! এই সজাতিপ্রীতি আমাদের কতটুকু আছে? প্রীতির কথা দূরে থাকুক, আমরা আজি কালি বিদ্বেষের পরিচয়ই অধিক দিতেছি। পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ছাত্রে শিক্ষকে, জমিদারে প্রজায়, সংবাদপত্রে সংবাদপত্রে, দেশভক্তে দেশভক্তে, আজকাল তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। ইহা বড়ই বিসদৃশ দৃশ্য! মুখে বলিতেছি, আমরা সকলেই স্বদেশভক্ত; কিন্তু কার্য্যে সজাতি বিদ্বেষের চূড়ান্ত পরিচয় দিতেছি!!

এই পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে, এমন সময় শ্রাবণের "নব্যভারত" হস্তগত হইল। দেখিলাম, শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় "দলাদলি" নামক প্রবন্ধে আমাদের দেশভক্তদিগের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষের উল্লেখ করিয়া প্রাণস্পর্শিণী ভাষায় কত আক্ষেপই করিয়াছেন! তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি না থাকাতেই এই অনর্থ ঘটিতেছে। আমিও সেই কথা বলিতেছিলাম।

সজাতিপ্রীতি না থাকায়, আমাদের স্বদেশ-ভক্তিও নাই। কাজেই স্বদেশের উপকারের ভাণ করিয়া আমরা যে সকল কার্য্য করিতেছি, তাহার মূলে কিন্তু অন্য উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। এইরূপ মুখে এক ও ভিতরে অপর উদ্দেশ্য থাকায়, কোন কাজেরই ঠিক ফল হইতেছে না॥ দুই একটা দৃষ্টান্ত দিই। সকলেই বলিয়া থাকেন, যে তাঁহারা দেশহিতকল্পে সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাহাই যদি হইল, তবে সংবাদপত্র মহলে প্রতিযোগিতা কেন? সকলে সমবেত চেষ্টা করিয়া অগ্রে একখানি সংবাদ-পত্রকে প্রভূত শক্তিশালী কর না কেন? তাহা না করিয়া 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইয়া সকলেই দুর্ব্বল হও কেন? গ্রাহক অভাবে সকলগুলিই সমান দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় কেন? মিরর থাকিতে অমৃতবাজার, অমৃতবাজার থাকিতে বেঙ্গলী কেন? নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, মতিলালের মিলিত শক্তি, এক অপূর্ব্ব শক্তিশালী সংবাদ-পত্র সৃষ্টি করিতে পারিত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা না হইয়া পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিয়া পরস্পরের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিতেছ কেন? বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়িক পত্র সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে।

ইহাতে কি বুঝিলাম? বুঝিলাম না কি, যে দেশহিতকল্পে এই সকল সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয় নাই? আর যদিই প্রচারকদিগের মনে সেই উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলেও সজাতির প্রতি যে প্রীতি নাই, ইহা নিশ্চয়। আবার একটা উদ্দেশ্য আছে; সেটি যশঃ ও অর্থলোভের ইচ্ছা বলিয়াই বোধ হয়! শুধু সংবাদপত্রে কেন, সকল কাজেই আমাদের এইরূপ!

সজাতিপ্রীতি বাদ দিয়া স্বদেশের উন্নতিকল্পে কার্য্য করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাতে খাটি কাজ হয় না; লক্ষ্য ঠিক হয় না। আমি যদি স্বজাতির বেদনা না বুঝিলাম, তবে কেমন করিয়া তাহাদের অভাব দূর করি বা করিতে চেষ্টা করিতে পারি? বিলাতী দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় কোটি কোটি ভারতবাসী স্বকীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া মহা কষ্টে পতিত হইয়াছে; ব্রাহ্মণের অধঃপতনের সহিত হিন্দু সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, কন্যাদায়ে লোকে 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়িতেছে; আমাদের দেশহিতৈষীদিগের এদিকে কিন্তু লক্ষ্য নাই, কেবল কিসে লাট সাহেব হইব, সেই চেষ্টা! ইহাকে কি বলে? দেশের কোন্ খানে প্রকৃত ব্যথা, ইহা বুঝিতে না পারা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যদি প্রকৃত দেশহিতৈষী হইতে, তবে বুঝিতে পারিতে, কি জন্য দেশের লোক অধিক কষ্ট পাইতেছে।

জন কতক ইংরাজ এদেশে চাকুরী করিয়া অর্থ লইয়া যাইতেছে; তাহাতে দেশের অধিক ক্ষতি, না, ইংরাজগণ ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা যে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ইহাতে দেশের অধিক ক্ষতি? যদি হৃদয়ের সহিত স্বদেশকে ভালবাসিতাম তাহা হইলে এমন মহাভুল করিয়া বসিতাম না। দেশ দরিদ্র হইয়া যাইতেছে বলিয়া কংগ্রেসমণ্ডপে ও পার্লিয়ামেণ্টে চীৎকার করা হইতেছে, অথচ কংগ্রেস মণ্ডপে গিয়া দেখুন, কয়জন দেশহিতৈষীর গাত্রে দেশী কাপড় ও চরণে দেশীয় জুতা আছে? তোমরা যদি নিজের টাকা হাতে তুলিয়া সাহেবদিগকে দাও, তাহারা লইবে না কেন? দেশের সব টাকাগুলা সাহেবেরা লইল বলিয়া যে মুহূর্ত্তে চীৎকার করিতেছি, হয় ত সেই মুহূর্ত্তেই দেশীয় সুগন্ধির পরিবর্ত্তে বিলাতী এসেন্স ব্যবহার করিতেছি, দেশী কাপড় না লইয়া বিলাতী কাপড় ব্যবহার করিতেছি। এই যে আমি স্বদেশ ভক্তির প্রবন্ধ লিখিতেছি, আমার কাগজ টুকু বিলাতী, কালী বিলাতী, দোয়াত বিলাতী, কলমটিও বিলাতী! ইহাই কি দেশভক্তি? তাই বলিতেছিলাম, আমাদের দেশভক্তি মিথ্যা!

অপরকে ভালবাসিতে হইলে আগে আপনাকে ভালবাসিতে হইবে। নিজের দেশের লোককে ভালবাসিতে হইলে আগে আমাদের নিজের পরিবারের সকলকে ভালবাসিতে হইবে। সমাজের বৃদ্ধগণের প্রতি ভক্তি দেখাইবার পূর্ব্বে প্রথমে পিতৃভক্তি দেখাইতে হইবে। ভক্তি, স্নেহ, বিনয়, ঔদার্য্য, স্বার্থত্যাগ, সৌজন্য প্রভৃতি যে সকল গুণে মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে, সেই সকল গুণ পরিবাররূপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে হইবে। যাহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা স্বাভাবিক, তাহাদের সহিত ব্যবহার করিয়া ঐ সকল গুণ লাভ করা সহজ। আমি যদি গৃহে ঐ সকল গুণের ব্যবহার না করিতে পারিলাম, তবে কেমন করিয়া আমি বাহিরে লোক-সমাজে তাহা প্রকাশ করিব? আমি যদি সহোদর ভ্রাতার প্রতি স্নেহ দেখাইতে না পারিলাম, তবে কেমন করিয়া আমি অপরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিব? এইরূপে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করিয়া তবে জাতীয়তা লাভ করিতে হইবে। স্বজাতি-প্রেম শিক্ষা করিয়া স্বদেশ-প্রেম অর্জ্জন করিতে হইবে, নচেৎ "স্বদেশ, স্বদেশ," বলিয়া চীৎকার করিলে কোন ফল হইবে না।

দেশহিতৈষিগণ রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য যে শক্তির অপচয় করিতেছেন, তাহার কিছু অংশ যদি ব্যবসার দিকে নিয়োজিত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক ফল হইত। দেশের লুপ্তশিল্পের উদ্ধার, কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি, ইত্যাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অত্যাবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের প্রতিভাসম্পন্ন মহোদয়গণের পরামর্শ অনুসারে জমিদারগণ যদি ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করেন, তবেই ফল হইবে। কিন্তু আমাদের জমিদারেরা এদিকে বড় একটা মনোযোগ দেন না। ইহা ভাল নয়। তাঁহাদের লোকবল আছে, অর্থবল আছে; তাঁহারা যদি এ সকল না করিবেন, তবে কি উদরান্ন লালায়িত আমরা করিব? আমাদের ত বোধ হয়, ইহাতেই দেশের অধিক উপকার হইবে। আমাদের বীরভূমের কথাই বিবেচনা করিয়া দেখুন। বিলাতী লৌহের প্রতিযোগিতায় বীরভূমের লৌহের কারবারটা উঠিয়া গেল। হেতমপুর, কীর্ণহার, কুণ্ডলা প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ ইচ্ছা করিলেই আবার তাহা পুনর্জীবিত করিতে পারেন না কি? সকল স্থানের শিল্পের এইরূপ দুর্গতি; অথচ জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে অনেকটা কাজ করিতে পারেন। তাঁহারা একটু দয়া করিবেন কি?

শিক্ষা।

আজ কাল আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে বহুবিধ মত প্রকাশিত হইতেছে। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর মহামতি পেড্‌লার সাহেব পাঠশালা শিক্ষায় যুগান্তর ঘটাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা সমূহে নানাবিধ পরিবর্ত্তন করাইলেন। অপর পক্ষে আমাদের ভক্তিভাজন, বহু লোকের প্রাণদাতা ও অন্নদাতা লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর শিক্ষা সম্বন্ধে আমূল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই মহাত্মাদ্বয়ের প্রস্তাব ও কার্য্যসকল পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহাঁরা সকলেই কথঞ্চিৎ রাজনৈতিক চক্ষে শিক্ষা বিস্তারের ফলাফল পরিদর্শন করিয়া স্বস্ব মতের অবতারণা করিয়াছেন। যাহা হউক, ইঁহাদের উভয়েই আমাদের দেশীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিবেন, সন্দেহ নাই।

এই পরিবর্ত্তনের সময় মহাত্মা তাত্বা বাহাদুর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ দান করিয়া প্রকৃত শিক্ষাপথে ভারতবাসীকে অধিরোহণ করিবার উপায় বিধান করিয়াছেন। ভারতবাসী যতই পুস্তক অধ্যয়নে পারদর্শী হউক না কেন, ইউরোপীয় বিদ্যালয়ে যতই উচ্চ স্থান অধিকার করুক না কেন, তাঁহারা স্বীয় মস্তিষ্ক হইতে কোন বিষয়ের উদ্ভাবনা করিতে পারেন না, তাহাদের এই চিরকলঙ্ক বোধ হয়, এইবার তাত্বা বাহাদুরের অনুগ্রহে তিরোহিত হইবে। এত দিন ভারতবাসী পুস্তক অধ্যয়নে জগতের অগ্রণী ছিল, অধুনা ইঁহাদের মৌলিক গবেষণায় (original rearearch এ) অগ্রসর হইবার সূচনা হইল। যথার্থতঃ পুস্তক অধ্যয়নে মানবের প্রকৃত শিক্ষা হয় না। মনুষ্য প্রধানতঃ তিনটী উপাদান গঠিত; যথা, শরীর, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। এই তিনটীর পরিপুষ্টি সাধন করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধ পুস্তক অধ্যয়নে যে এই তিনের সম্পূর্ণতা লাভ হয় না, তাহা সপ্রমাণ করিয়া, যে যে উপায় দ্বারা এই তিনে সম্পূর্ণতা সাধন হয়, তাহা আমি যথাক্রমে তিনটী প্রবন্ধে আলোচনা করিব। পুস্তকে আমরা জীবিত বা মৃত মানবের পরিদৃষ্ট বিষয়গুলি এক স্থানে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। মনে করুন, আমরা এই বিষয়গুলি পাঠ করিলাম ও মস্তিষ্কে তাহাদের ধারণা

করিয়া সযত্নে মনোমধ্যে রাখিয়া দিলাম। ইহাতে আমাদের বহুবিধ ভ্রান্তি ও কুসংস্কার দূরীভূত এবং অনেক বিষয়ে নূতন শিক্ষা হইতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনের সম্পূর্ণতা লাভ হয় না। কারণ কোন বিষয় অবগত হইয়াও তাহার সম্যক্ আলোচনা করিয়া মনোমধ্যে সন্নিবেশ করা এক কথা এবং সেই বিষয়ই প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে উপায় স্বরূপ অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া আর এক কথা। পুস্তক পাঠে আমরা বহুবিধ অজ্ঞাত বিষয় জানিতে পারি বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমরা কার্য্যক্ষেত্রে তাহার সম্যক্ ব্যবহার করিতে পারি না। এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি প্রতিভাশালী ছাত্রও সকল সময়ে সংসারে সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কারণ ভূমি কর্ষণ দ্বারা উপযুক্ত না হইলে, সূর্য্যতাপ ও জলসিঞ্চন দ্বারা তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। পুস্তকার্জ্জিত জ্ঞান পরিদর্শন-জনিত জ্ঞান দ্বারা পরিপুষ্ট না হইলে, মানবের কার্য্যক্ষেত্রে কৃতকার্য্যতা হয় না। যে ব্যক্তি কখনও জীবপ্রদর্শনী না দেখিয়া জীবতত্ত্বের পুস্তকাদি পাঠ করে, সেই জীবতত্ত্বের আলোচনা তাহার পক্ষে কোন বিষয়ে উপযোগী হয় না। কার্য্যক্ষেত্রে সে ব্যক্তির এক জাতীয় জীবের সহিত, তাহার অনুরূপ জাতীয় জীবের ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সম্পূর্ণই সম্ভাবনা। এইরূপ জ্যোতিস্তত্ত্ববিদের পুস্তকার্জ্জিত জ্ঞান মানমন্দিরের যন্ত্রসাহায্যে পরিদর্শন-জনিত জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণ ও দৃঢ়ীভূত না হইলে, ঐ জ্যোতির্ব্বিদের আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। সুতরাং পুস্তক অধ্যয়নে মস্তিষ্কের অনুশীলনই সম্পূর্ণতা লাভ করে না; কারণ তদ্দ্বারা অনেক বিষয়ের আংশিক জ্ঞানের ধারণা হয় মাত্র; অত্যাবশকীয় অবশিষ্টের অভাব থাকে।

মানসিক অনুশীলনের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। নীতি শাস্ত্রে বিশারদ হইলেই লোকের নৈতিক আচার হয় না; ইহা ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায়। ইংরাজ কবি সেক্ষপীর ও আর্য্যকবি কালিদাস ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইঁহাদের উভয়ের পুস্তকাদি পাঠ করিলে বোধ হয়, ইঁহারা নীতি শাস্ত্রে বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু ইঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত ইঁহাদিগকে কদাচারী বলিয়া সপ্রমাণিত করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, এম, এ।

জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ।

ভারতীয় আর্য্যগণের অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রধান নিদর্শন গণিত শাস্ত্রের দশোত্তর সংখ্যা লিখন প্রণালী এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গৃহীত ও অনুশীলিত হইতেছে, তাহাও ভারতের আর্য্যগণের উদ্ভাবিত এবং তাহাই তাঁহাদিগের জ্ঞানের চরমোন্নতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আর সেই গণিত শাস্ত্রের পূর্ণ উন্নতি জ্যোতিষশাস্ত্রে পর্য্যবসিত হওয়ায়, ভারতে জ্যোতিষের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, আবার তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতিপর আয়ুর্ব্বেদেরও উন্নতি সেইরূপ সম্পূর্ণত্ব পাইতে দেখা গিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে আয়ুর্ব্বেদের বা জ্যোতিষের নষ্টাবশিষ্ট গ্রন্থাদির পরিদর্শনে প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের সত্যানুসন্ধিৎসায় যে তৎতৎ তত্ত্বের চরম উন্নতি সাধনে ভারত সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। অপিচ গণিতশাস্ত্র যেরূপ নিশ্চিত ফলদায়ক বলিয়া সকলেরই বিশ্বাসভাজন, জ্যোতিষও আয়ুর্ব্বেদের ফলও সেইরূপ অব্যাহত প্রভাব বলিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই প্রত্যয়ভাক্। সত্যের অব্যাহত প্রভাব সর্ব্বত্রই সুসংস্থিত বলিয়া সত্যমূলক ধ্রুবফল আর্য্যবাক্যে বিশ্বাস না করিবার পক্ষে বিশিষ্ট কারণ কিছুই দেখা যায় না। তাই—

"আয়ুর্ব্বেদ জ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ
পদে পদে প্রত্যয় মাবহন্তি।"

এই প্রবচনটী দেশের অনেকেরই নিকট বিশিষ্টরূপ অধিকার প্রসার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চ্চায় গ্রহগণের প্রভাবে মানবশরীরে প্রত্যক্ষত বিবিধরূপ পরিণাম নিরন্তরই দেখিতে পাই; লোকের জাতচক্রের বিচারে, গণিত সাহায্যে গ্রহগণের সাংস্থানিকী শক্তির সহিত ফলাফলের বিচার করিতে গিয়া অভ্রান্তবাক্ ঋষিগণের বাক্যের সার্থক্যের উপলব্ধি করিতে পারি; আবার সেইরূপ তাহার সহানুভূতিপর আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্যগুণ বিচারে ভৈষজ্য প্রয়োগের ফলে বিবিধ বিপরিণাম দেখিতে পাই; সেই সকল স্থলেও আর্য্যবাক্যের মাহাত্ম্য সুরক্ষিত দেখিয়া মনে তাঁহাদিগের অনন্তজ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে, তন্ময় হইতে হয়।

বেদ অর্থে সত্যমূলক জ্ঞান। তাহাই আর্য্য ঋষিগণের সেব্য ও উপভোগ্য।

সেই সত্যানুসন্ধানপর ঋষিগণের একাগ্রচিন্তায় সত্য তত্ত্বের অনন্ত প্রসূতি প্রকটিত হইয়াছে; সর্ব্বতত্ত্বেই একই সত্যের অব্যাহত প্রভাব সুরক্ষিত দেখিয়া, তাঁহারা তাহারই প্রকটনে যত্নপর হইয়াছিলেন। তাই সত্যবাক্ ঋষিগণের উদ্ভাবিত সার্ব্বদেশিক সত্যের বলেই জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত আর্ষ্যবাক্যের প্রভাব এক্ষণেও অক্ষুণ্ণ দেখা যায়। আর্ষ্যবাক্যে প্রমোণ্যের আস্থাপন করিতে গেলে, আয়ুর্ব্বেদ তাহার অন্যতম প্রমাণ স্থানীয়। তাই গৌতম সূত্রে কথিত আছে:—

"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদ প্রমাণ্যাৎ তৎপ্রামাণ্যং—আপ্তপ্রামণ্যাৎ।"

মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য হইতেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য। আপ্তবাক্যে—ঋষিবচনেও প্রত্যক্ষতঃ তাহার প্রামাণ্য যে স্থাপিত হইতে পারে, তাহা স্থির। অথবা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এই আয়ুর্ব্বেদের সহিত জ্যোতিষের যে একান্ত পরস্পরিত সম্বন্ধে সত্যসম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত, আর তাহার জন্যই যে, শাস্ত্রবচন প্রামাণ্য বলিয়া স্থিরীকৃত, অদ্য তাহারই এস্থলে কথঞ্চিৎ আভাস দিব।

জ্যোতিষে কালভেদ।

যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহাতে মানব জীবনের উপভোগ্য দিন, ঋতু, বৎসরাদির ন্যায় শতায়ুরও বিভাগ একই নিয়মে বিভক্ত। প্রথমতঃ সূর্য্যের (পৃথিবীর) পরিভ্রমণানুসারে বর্ষ দুইটী অয়নে বিভক্ত; উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন। এই দুই অয়নে যথাক্রমে সূর্য্যের বলবৃদ্ধি ও বলহ্রাস হইয়া থাকে। আবার অহোরাত্রের মধ্যেও এই বিভাগ বর্ত্তমান। দিবার সূর্য্য প্রভাত ও রাত্রে চন্দ্রাধিকার-ফলে সূর্য্যের প্রাবল্যে পৃথিবীর রসশোষ ও চন্দ্রের অধিকারে পৃথিবীতে রসবিসর্জ্জন। অয়ন বিভাগেও কার্য্যতঃ এই নীতি মর্য্যাদা সুরক্ষিত। তাহার পর ঋতুবিভাগ। পূর্ব্বে মাকরী সংক্রান্তির দিন ক্রান্তিপাত বা বিষুবচক্রের সহিত অয়নমণ্ডলের ছেদ হইত। উত্তরায়নের প্রারম্ভ এই মাকরী সংক্রান্তির দিন হইতে গণনা করা সঙ্গত হইলেও, তাহা ব্যবহার সঙ্গত নহে; যেমন উষায় পৃথিবীর দৃশ্যমান চক্রফলে সূর্য্যের অবস্থিতি হইলেও, উদয়কাল বলিয়া পরিগণিত হয় না, তেমনই ঐ মাকরী সংক্রান্তি বর্ষের প্রথম হইলেও, ব্যবহারতঃ ঐ দিনে শীতের শেষ বা বসন্তের প্রারম্ভ হয় না। হইতে পারে প্রবল শীতের শেষে এই দিনে বসন্তের সংক্রমণ, কিন্তু তাহার শক্তি কিয়দ্দিবসাতীতে—ফাল্গুন ও চৈত্রে—বিকাশ পায়; আর তজ্জন্যই

আমরা ফাল্গুন হইতে ক্রমে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত—এই ষড় ঋতুর সঞ্চার-ভোগাদির গণনা করি। ঋষিগণ ঋতুগণের অধিপতি গ্রহদিগেরও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পশ্চাৎ প্রকটিত তালিকায় মাসের অধিপতির সহিত ঋতুর অধিপতি প্রদর্শিত হইল।

১।	বসন্তের অধিপতি জীব (বৃহস্পতি)	ফাল্গুনের	অধিপতি	শনি।
		চৈত্র	,,	বৃহস্পতি।
২।	গ্রীষ্মের ,, মঙ্গল	বৈশাখ	,,	মঙ্গল।
		জ্যৈষ্ঠ	,,	শুক্র।
৩।	বর্ষার ,, চন্দ্র	আষাঢ়	,,	বুধ।
		শ্রাবণ	,,	চন্দ্র।
৪।	শরতের ,, রবি	ভাদ্র	,,	রবি।
		আশ্বিন	,,	বুধ।
৫।	হেমন্তের ,, শুক্র *	কার্ত্তিক	,,	শুক্র।
		অগ্রহায়ণ	,,	মঙ্গল।
৬।	শিশিরের ,, শনি	পৌষ	,,	বৃহস্পতি।
		মাঘ	,,	শনি।

আবার জ্যোতিষ শাস্ত্রেগ্রহগণের শক্তি জীবদেহের কোন্ কোন্ ধাতুর উপর কিরূপ কার্য্য করে, তাহারও নির্দ্দেশ করিতে ঋষিগণ ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদিগের অভিমত নিম্নে তালিকায় প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

রবির আধিপত্য পিত্তে। বুধের আধিপত্য বায়ুতে। শনির আধিপত্য অস্থিতে।

চন্দ্রের ,, শ্লেষ্মায়। বৃহস্পতি ,, বাতশ্লৈষ্মিকে।

মঙ্গল ,, রক্তে। শুক্রের ,, শুক্রে।

* কাহারও কাহারও মতে বসন্তের অধিপতি শুক্র ও হেমন্তের অধিপতি বৃহস্পতি। ইহাও ন্যায় সঙ্গত। আর শুক্র ও বৃহস্পতি প্রায় সমধর্ম্মা।

আয়ুর্ব্বেদ মতে রক্ত পিত্তের, শুক্র শ্লেষ্মার ও অস্থি বায়ুর সমগুণ বলিয়া, মঙ্গলের আধিপত্যে পিত্ত, শনির আধিপত্যে বায়ু ও শুক্রের আধিপত্যে শ্লেষ্মার প্রাবল্য প্রকাশাদি হওয়াই সম্ভবপর। সুতরাং—গ্রীষ্মে—পিত্ত সঞ্চয়, হেমন্তে শ্লেষ্মা সঞ্চয়, বর্ষায়—বায়ু প্রকোপ * শিশিরে বাত সঞ্চয়, শরতে পিত্ত-প্রকোপ, বসন্তে শ্লেষ্ম-প্রকোপ হওয়া সঙ্গত ও তাহাই অবশ্যম্ভাবী।

আবার শতায়ুঃ সম্বন্ধেও এইরূপ বিভাগ জ্যোতিষশাস্ত্র সম্মত। যদিও জীবনের বিভাগে অধিপতি গ্রহদিগের অধিকার বিভাগের বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হইবে, তথাপি ফলের ব্যত্যয় না থাকায়, পূর্ব্বোক্ত সত্যমূলা নীতির মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘিত হইবে না। এক্ষণে পরপ্রকটিত তালিকায় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে :—

১ম চন্দ্রের অধিকার—৪ বৎসর। চন্দ্র শ্লেষ্মকর বলিয়া বাল্যে শ্লেষ্ম-প্রকোপ সঙ্গত।

২য় বুধের " ১০ বৎসর। বুধ বায়ুবর্দ্ধক "বায়ুরেব ভগবান্, স চ জ্ঞানদাতা।" এই বাক্যে বুধের অধিকার। বাতগুণে চাঞ্চল্য থাকিলেও, শিক্ষাস্পৃহা বলবতী থাকে।

৩য় শুক্রের " ৮ বৎসর। শুক্র শুক্রবর্দ্ধক। এই সময় শুক্রের বৃদ্ধি ঘটায় যৌবনসুলভ বিবিধ ভোগেচ্ছা বৃদ্ধি পায়।

প্রথম হইতে ২২ বৎসর পর্য্যন্ত শ্লেষ্মারই অধিকার প্রধানতঃ দেখা গিয়া থাকে। ইহার পর নৈসর্গিক নিয়মে পিত্তপ্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী।

৪র্থ রবির " ১৯ বৎসর। রবি পিত্তবর্দ্ধক। পিত্তে রোষের উদ্রেক হয় বলিয়া এই সময়ে সকলেই রোষপর হয়। এবং এই বয়সে পিত্তপ্রাবল্য জন্য ব্যাধিরও সম্ভাবনা।

* চন্দ্রের শীতগুণ থাকায়, শীতে বায়ু বৃদ্ধি সঙ্গত; অপিচ আষাঢ়ের অধিপতি বুধের অধিকার কথঞ্চিৎ থাকায়, বায়ু প্রকোপ সম্ভবপর।

৫ম মঙ্গলের অধিকার— ১৫ বৎসর। মঙ্গলও পিত্তবর্দ্ধক। রক্তের চরমবৃদ্ধি এই সময়ে। এই সময়ে লোক কঠোরব্রত রোষপর হইয়া থাকে। পিত্তজ বিকারও অবশ্যম্ভাবী। ২২ হইতে ৫৬ বৎসর পর্য্যন্ত প্রধানতঃ পিত্তপ্রাবল্য থাকে। ইহার পর নৈসর্গিক নিয়মে বাতপ্রাধান্য।

৬ষ্ঠ বৃহস্পতির " ১২ বৎসর। বৃহস্পতি বাতশ্লৈষ্মিক প্রকৃতির। এই সময় মানব যুগ্ম ঋতুর গুণে কথাঞ্চিৎ বৈরাগ্য ভাবাপন্ন হয়।

৭ম শনির " ৩২ বৎসর। শনি বিতকর গ্রহ বলিয়া, এই সময় ক্রূর বায়ু দ্বারা শ্লেষ্মা আবদ্ধ হয়। ইনি তাই যমসোদর।

৫৬তম বৎসরের পর, শেষের কয় বৎসরে প্রধানতঃ বায়ুপ্রাবল্য হইয়া থাকে। বস্তু বিকারের লক্ষণও পূর্ণ প্রকাশ পায়। ক্রূর বায়ু দ্বারা শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অনেক সময় প্রাণবায়ুর নির্গমের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

আয়ুর্ব্বেদে কালভেদ

অনুসারে দোষচয় প্রকোপাদির যে নির্দ্দেশ আছে, তাহাও ইহার অনুরূপ। ঋতুচর্চ্চার উপদেশ করিতে গিয়া কথিত হইয়াছে, একটী বৎসর দুইটী অয়নে বিভক্ত; তাহাদিগের আয়ুর্ব্বেদ সঙ্গত নাম হইতেছে, আদান (উত্তরায়ন) বিসর্গ (দক্ষিণায়ন)। আদানে রবি পৃথিবীর রস শোষ করেন বলিয়া পার্থিবজীবের পক্ষে বায়ু তীব্র ও রুক্ষ হইয়া যত শুষ্ক হইতে থাকে, ততই শীতাদি ঋতুত্রয় যথাক্রমে তিক্ত, কষায় ও কটু উদ্ভিজ্জ বস্তুর উৎপাদন করিতে থাকে। আর রুক্ষতা বায়ুর গুণ বলিয়া এই সময় প্রধানতঃ লোকের শরীর বায়ুপ্রধান হয়। বিসর্গে (দক্ষিণায়নে) স্বভাবতঃ পৃথিবীতে রসোৎসর্গ হইতে থাকে বলিয়া, স্নিগ্ধরস বাহুল্যে বর্ষা, শরৎ, হেমন্তে যথাক্রমে অম্ল, লবণ, মধুর উদ্ভিজ্জ বস্তু জন্মে, এবং এই সময়ে শ্লেষ্মবৃদ্ধি হয়। ইহারও আবার সূক্ষ্ম অংশাকের বিচার করিলে দেখা যায়, গ্রীষ্মে পিত্ত সঞ্চয়, বর্ষায় বায়ু প্রকোপ, শরতে পিত্ত প্রকোপ, হেমন্তে শ্লেষ্ম সঞ্চয়, শিশিরে বাত সঞ্চয়,

এবং বসন্তে শৈষ্মিক প্রকোপ স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে। আবার এক অহো-রাত্রেও ইহার অনুরূপ বাত, পিত্ত, কফের ক্রম প্রকোপাদিরও নির্দ্দেশ আছে। দিনমানে সূর্য্য প্রাধান্য হেতু রুক্ষতা জন্য, বায়ু প্রাবল্য ও রাত্রে পৃথিবীতে রস বিসর্জ্জন হেতু শ্লেষ্ম প্রাধান্য হওয়াই স্বাভাবিক। আবার তাহার সূক্ষ্ম বিচারে প্রাতে কফ, মধ্যাহ্নে পিত্ত ও অপরাহ্নে বায়ু প্রবল হইয়া থাকে। রাত্রেও আবার যথোত্তর সংক্রমণ হইয়া থাকে। ইহার সহিত ঋতুবিভাগের ফলসাম্য রহিয়াছে।

জীবনের শতায়ুও এইরূপ বাত-পিত্ত-কফাদির ক্রম বিনিবেশময়। তাহাতেও বাল্যে কফ-প্রাধান্য, প্রৌঢ়ে পিত্ত প্রাধান্য, বার্দ্ধক্যে বায়ু-প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাতেও জ্যোতিষ নির্দ্দিষ্ট বিধির বিপর্য্যয় নাই।

সামান্য দোষ বিচার বিষয়ে জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদের সামঞ্জস্য দর্শাইতে যে কয়েকটী ব্যাপার বিবৃত হইল, তাহাই যথেষ্ট। এক্ষণে পাত্রভেদে বাত, পিত্ত, কফ এই দোষত্রয়ের প্রাধান্য ভেদাদি বিষয়ের আভাস দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

পৃথিবীর সকল মনুষ্য সমধাতু হয় না কেন? এমন কি, একই মাতার গর্ভে, একই পিতার ঔরসে সমধাতুর পুত্র উদ্ভূত হয় না কেন? এই বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে, প্রত্যেকের গ্রহসংস্থানের এবং রাশ্যুদয়াদির (লগ্ন) পার্থক্য আছে। জন্মকালীন গ্রহগণ জাত জীবের প্রতি যেরূপ শক্তির প্রয়োগ করিবেন, জাত জীবও সেইরূপ গ্রহশক্তির সমগুণ ধাতুসম্পন্ন হইবে। সুতরাং এইরূপ গ্রহগণের শক্তি সঞ্চালনের পার্থক্য বশে পৃথক্ পৃথক্ ধাতু বিশিষ্ট হওয়ায় প্রত্যেকের স্বাস্থ্য (নীরোগ ভাব) স্বতন্ত্র। এই সকল বিষয়ের প্রতি প্রাচীন ঋষিগণ বিশিষ্ট লক্ষ্য রাখিয়া, এক সূত্র-তত্ত্বময় মহান্ বিষয়ের—চিকিৎসাতত্ত্বের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই তত্ত্বময় ক্রিয়াযোগের সম্যক অবিগমন ব্যতীত মানুষ সুচিকিৎসক হইতে পারে না।

আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষের এই পরস্পরিক সম্বন্ধ থাকায়, প্রাচীন অভ্রান্তবাক্ ঋষিগণ এই উভয়ের বিবাদ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে অভ্রান্ত বিধি বিধানের খ্যাপন করিয়াছেন, তাহা যে কতদূর উন্নত ও সম্পূর্ণ, তাহা এই সামান্য প্রবন্ধে প্রকটিত করা অতীব দুরূহ; তবে আভাসে সেই মহত্ত্বের কথঞ্চিৎ বিকাশ করিবার জন্যই ইহার আবতারণা। কোন আর্ষ গ্রন্থই গুরুমুখ হইতে

শ্রুত না হইলে, তাহার অবরোধ হয় না;—যে বিদ্যা গুরুমুখী নহে, তাহা অবিদ্যা বলিয়া তত্ত্বদর্শীদিগের নিকট এতাবৎকাল উপক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আর তাই কোন প্রবন্ধেই আভাস ব্যতীত তত্ত্বের বিকাশ করা যায় না। সুতরাং এক্ষণে আভাস মহত্ত্বের কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইলেই যথেষ্ট। অলমতি বিস্তারেণ।

কবিরাজ—শ্রীঅঘোরনাথ শাস্ত্রী।

———:০:———

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পাগলের প্রলাপ।

গত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা নব্যভারতে "দ্বিজত্ব" শীর্ষক এক অদ্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক ধরিয়া লইয়াছেন, যে কৃষ্ণবর্ণ, সে অন আর যে গৌরবর্ণ—সে আর্য্য। এই হিসাবে, শ্রীকৃষ্ণ, দুর্য্যোধন, অ অনার্য্য ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভা না থাকিলে কি এরূপ কথা বলিতে পারে? এমন পাগলের প্রলাপ নব্যভারতে স্থান পাইল কির

ভবিষ্যদ্বাণী।

সুপ্রসিদ্ধ বিলাতী জ্যোতিষী জাড্‌কীল গণনা করিয়া বলি "এবৎসর জুলাই মাসের প্রথমার্দ্ধে আমাদের রাজপরিবার শোকগ্র আগষ্টের প্রথমার্দ্ধে ইটালীর রাজার এনার্কিষ্টদিগের হইতে বি অক্ষরে অক্ষরে এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গেল!

পীয়গণ কত উন্নতি করিতেছেন, আর

গ্রহাচার্য্যগণের হস্তে পড়িলে এক শ্রমজীবী সস্ত্রীক বাস র জড়তা? দিনী। একদিন কোন পুষ্পোদ্যানে য়। অনন্তর প্রতাপ, আকবর আলী স্ত্রী-হরণের অভিযোগ উপস্থিত ক য্য প্রণয়িনীকে নব নাগরের হস্ত

আজ কাল মা ব, ডেপুটী বাবু পরমেশপ্রসাদ রায় ব গল্পে নীতিশিক্ষা দে

TORN PAGES.

কথা আছে। যেমন সমাজ, গল্প তাহার অনুরূপ হওয়া উচিত। ইংরাজী গল্পের অনুকরণে লিখিতে গিয়া কেহ কেহ হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর অনেক কথাই বলিয়া ফেলিতেছেন। মনে করুন, একজন লিখিলেন, "ছুটী বালক বালিকায় বড় ভাব, * * * সারাদিন একত্র খেলা করে, কেহ কাহাকেও এক তিল ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। বয়োবৃদ্ধির সহিত উভয়ের ভাব ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল" ইত্যাদি। ক্রমে উভয়ে বড় হইল। হিন্দুসমাজের নিয়ম অনুসারে উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিবাহ হইল, ফ প্রণয়ের জন্য কেহই বিবাহিত জীবনে সুখী হইতে পারিল ... কত কাণ্ড হইল। কেহ যোগিনী হইল, কেহ দেশদেশান্তরে ...ন্যপ্রণয়ীর দর্শন লাভের জন্য কত দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিল, ...ত্যাদি। এখন এক কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, হিন্দুসমাজে কি এরূপ ...পার ঘটে? আর যদিও কোন স্থানে কিছু হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে আছে? বালক ...রা এই সকল গল্প পড়িয়া বা শুনিয়া যে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবে! ...হা যদি হিন্দুসমাজের চিত্র হইত, তবে লেখায় দোষ ছিল না। গল্পে ...ন্যাসে অবশ্যই সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হইবে। কিন্তু ইহা ...ত্য! কয়জন শৈবলিনী বঙ্গীয় সমাজে পাওয়া যায়? পাশ্চাত্য সমা- ...হা, তাহা কেন নিজের বলিয়া গ্রহণ কর? এইরূপ নানা কৃত্রিমতা ...ঙ্গালা সাহিত্য দুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। বঙ্গের প্রধান ঔপন্যাসিক ...ঙ্কমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির অধিকাংশই এইরূপ দোষের প্রকৃষ্ট ... এক কৃষ্ণকান্তের উইল" ভিন্ন অপর কোন পুস্তকে বঙ্গীয় ... হয় নাই। বিমলা, কপালকুণ্ডলা, শৈবলিনী, দেবী- ... অদ্ভুত সৃষ্টি হইলেও, বঙ্গনারীর চিত্র নহে। ... নরনারী কবিপ্রতিভার যথেষ্ট প্রশংসা ...

ধাতু ... পৃথক্ ... এই সকল বিষয়ের ... তত্ত্বময় মহান্ বিষয়ের- ... তত্ত্বময় ক্রিয়াযোগের সম্যক ... উপকার লাভ করিল পারে না।

আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষের এই পরম্পরিক কিন্তু দেখিতে হইবে, ঋষিগণ এই উভয়ের বিবাদ সামঞ্জস্য রক্ষা কাকিনা। সেই আদর্শ থ্যাপন করিয়াছেন, তাহা যে কতদূর উন্নতধীরে ধীরে অগ্রসর প্রবন্ধে প্রকটিত করা অতীব দুরূহ; তবে আমাদিগের এ বিষয়ে বিকাশ করিবার জন্যই ইহার আবতারণা। ...রে অন্যতম কারণ।

সংবাদ।

সিহ্নিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনের আবদুল রক নামে জনৈক রেলওয়ে পুলীশের কনষ্টেবল ভিখারিণী মঞ্জরী বেদেনীকে চাল চুরীর অপরাধিণী বলিয়া ধৃত করত প্রহার ও বস্ত্রহরণ করে বলিয়া, ফৌজদারী আদালতে বেদেনী এক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। কনষ্টেবল প্রভু বেঙ্গল পুলীসেও সংবাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু পুলীস তদন্ত করত চুরী মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট দেন। ডেপুটী মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের বিচারে বেদেনীকে মারপীট করার অপরাধে কনষ্টেবলটীর ১০্ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বেদেনীকে ঐ দশটাকা দিবার আ... হইয়াছে। অন্যায় মতে চুরীর মোকদ্দমা উপস্থিত করায় কনষ্টেবল এখন দণ্ডবিধির ২১১ ধারার ফান্দে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

বীরভূমের অদূরবর্ত্তী কালীপুর গ্রামের বিহারী দাস নামে এক ত... কুমারের বাটীতে একটী বৎসহীনা শ্বেতবর্ণা গাভী আছে। গাভীটী ও... বৎসর দুইটী করিয়া শালগ্রাম প্রসব করে। প্রসবের কিয়দ্দিন পূর্ব্ব হই... গাভীটী হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং মুখবিবর দিয়া শিলা বাহির করে; অনন্তর দু... হয়। শিলাগুলির গাত্রে লোম আছে। ডেপুটী মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত হরি... বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কার্য্যোপলক্ষে কালীপুর গ্রামে যাইয়া উক্ত বি... অবগত হইয়া সাধারণ্যে বিদিত করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত ১৩টী শাল... শিলা বাহির হইয়াছে।

নিজ সিউড়ী সহরে, প্রতাপ মাল নামে এক শ্রমজীবী সস্ত্রীক বাস... স্ত্রীর বয়স ১৬।১৭ বৎসর, নাম বিধুবদনী। একদিন কোন পুষ্পোদ্যানে করিতে গিয়া ঐ রমণী অন্তর্হিতা হয়। অনন্তর প্রতাপ, আকবর আলী এক মুসলমান যুবকের বিরুদ্ধে স্ত্রী-হরণের অভিযোগ উপস্থিত ক... ২।১ দিন মধ্যে, পুলীসের সাহায্যে প্রণয়িনীকে নব নাগরের হস্ত উদ্ধার করে। রামপুরহাটের সব্ ডেপুটী বাবু পরমেশপ্রসাদ রায় ব...

উক্ত মোকদ্দমার প্রথম তদন্ত করেন। নবানুরাগিনী নায়কের দোষ প্রকাশ করিলেন না এবং অন্যান্য সাক্ষীর এজাহারও বিশ্বাসযোগ্য হইল না, সুতরাং সব্ ডেপুটী বাবু মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট দিলেন। এবার প্রতা ২১১ ধারায় বন্দী হইল। ডেপুটী মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদাস সোভান বাহাদুরের বিচারে প্রতাপ অব্যাহতি পাইয়াছে। এখন স্ত্রীধনই পরম লাভ বলিতে হইবে।

বোলপুর রেলওয়ে ষ্টেসনের অনতিদূরবর্ত্তী সুরুল গ্রামে স্বর্গীয় বসাক ংশের প্রতিষ্ঠিত ৬ রাধা বিনোদ দেবের বিগ্রহ পূজা ও নিত্যভোগের বস্থা আছে। উক্ত বংশ বিলুপ্ত হইলে স্থানীয় সরকার মহোদয়েরা দেবোত্তর ত্তি ও পূজাদির তত্ত্বাবধান ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি পূজক সত্য অধিকারী উক্ত বিগ্রহ ও অলঙ্কার হরণের অপরাধে অভিযুক্ত হ মী অপরাধ অস্বীকার করে, এবং পুলীসের আদেশ মাত্র দ্রব্যাদি র ূর্ত্তি বাহির করিয়া দেয়। জেলার মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত আমেদ সাহে হুরের বিচারে আসামী মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু সাহেব বাহাদুর আসা- ক পুনরায় উক্ত দেবতার গৃহপ্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। ভর মধ্যে পূজারীর রুটী মরিল।

র্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর বাহাদুর সম্প্রতি বীরভূম পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে জেলাস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমণ্ডলী নব ত "রাম রঞ্জন টাউনহলে" সমবেত হইয়া মহাসভা সংগঠন করতঃ সম্মানে কমিশনর বাহাদুরকে আহ্বান করেন। জেলার মাজিষ্টর আমেদ সাহেব বাহাদুর ঐ দিন ফৌজদারী আদালত সকল বন্ধ ছিলেন। বিগত ১০ই ভাদ্র, সোমবারে বীরভূম জেলা স্কুলের বার্ষিক তাষিক বিতরণোপলক্ষে বিদ্যালয়ে মহাসভার আয়োজন হয়। স্থানীয় গুলী ঐ সভায় আহুত হইয়াছিলেন। মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্রিকায় অভি-

নয়ের পর্য্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, মুদ্রিত সঙ্গীতমালা সমবেত ব্যক্তিগণ মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল, বালককণ্ঠ নিসৃত ভারতেশ্বরীর জয়কীর্ত্তন সঙ্গীত হারমোনিয়মের সুললিত সপ্তস্বরে সম্মিলিত হইয়া বিদ্যালয়কে ক্ষণ-কালের জন্য রঙ্গালয়ে পরিণত করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত সভ্যগণও এ বৎসর বহুসংখ্যক পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন। কমিশনর বাহাদুর ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বালকগণের মনোহর কবিতা পাঠ শ্রবণে কমিশনর বাহাদুর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার মহোদয় এই সকল বিষয়ে বিদ্যালয়ের সমুন্নতি সাধন করতঃ চিরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বীরভূম-করিধা নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় স্বনামধন্য পুরুষ। এই কেদার প্রায় ৩০ বার ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হইয়া ক্তি লাভ করত, স্বীয় হীনাবস্থা হইতে সমুন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ই বার তিনি সুদৃঢ় জালে পড়িয়াছিলেন, জাল আর কিছু নয়; একটি রেজেষ্টরীকৃত তমসুক পত্র। রেজেষ্টরী আপীসের মোহর, ছাপ, দস্তখত ও দলিলের অপর অংশগুলিও জাল; প্রতি অক্ষর পরিমাপ করত জা ধর হয়; সঙ্গে সঙ্গে কেদারও টানাটানিতে পড়িলেন; ডেপুটী মাজিষ্টর যুক্ত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর মোকদ্দমার তদন্ত করত কেদারকে য়রায় বিচার জন্য প্রেরণ করিলেন, ক্রমে কেদারের হাজত বাস ঘ চারে সেসন জজ বাহাদুর কেদারের দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ কা অর্থ দণ্ড করিলেন। কেদার এবার পাকাপাকিরূপে পাকা ঘ া হইলেন; কিন্তু হাইকোর্টে আপীল করিয়া কেদার জামিনে থা াইলেন; মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে কেদারের কারাদণ্ড অক্ষুন্ন র গেল। এদিকে আবার আর একটী জালেও টান পড়িল।

বড়ই সুখের কথা, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রকৃষ্ণ দেব মাজিষ্ট্রেটের পদে হইয়াছেন। আমাদের শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদাস সোভান রামেন্দ্রকৃষ্ণ

TORN PAGES.

ছুরের পূর্ব্বে ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বংশমর্য্যাদায় তিনি দেব বাহাদুর অপেক্ষা হীন নহেন। তাঁহার দাবী কেন উপেক্ষিত হইল? ভরসা করি, ছোটলাট বাহাদুর দ্বিতীয় সুযোগে তাঁহার প্রতি সুবিচার করিবেন।

উকীলের দণ্ড।—বাবু নিত্যগোপাল সেন বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুর মুন্সেফ আদালতে ওকালতী করিতেন। বাবু অঘোরনাথ বরাট নামক জনৈক ভদ্রলোকের পক্ষে এক উইলের মোকদ্দমায় তিনি উকীল ছিলেন। মতিলাল চৌধুরী এবং রামদাস নামক দুই ব্যক্তি উইলের সাক্ষী ছিল,—তাহারা পাছে বিপক্ষ পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, এই আশঙ্কায় উকীল বাবু তাহাদিগকে ৯০০ শত টাকা উৎকোচ প্রদানের প্রলোভনে হস্তগত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নামে হেণ্ডনোট লিখিয়া দিয়াছিলেন। হেণ্ড নোট লিখিয়া দিয়া ১৮৯৮ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই উৎকোচে টাকা পাঠাইবার জন্য তাঁহার মোক্তেল বাবু অঘোরনাথ বরাটকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। মোকদ্দমার বিচারকালে এই ঘটনা প্রকাশ পায়। মুন্সেফ উইল প্রকৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু উকীলের কার্য্য ব্যবসায়ী আইনের বিধানুযায়ী অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া অভিহিত করেন। ধার্য্য পূর্ব্বে এই উকীলের বিরুদ্ধে আর কোনও অন্যায় আচরণের কথা শুনা পূর্ব্বে নাই, এই বলিয়া দয়া প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। বীরভূমে এই উইল জাল বলিয়া অভিহিত করেন এবং উকীল বাবুর নাম কাটিয়া তন্ত বলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি ডাক্তার তত্ত্বাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের নিকট এই মোকদ্দমার বিচার পাঠেছিল। বারিষ্টার গার্থ সাহেব উকীলের পক্ষ সমর্থন কালে বলিয়াছেন,—যদি সত্য সাক্ষ্য প্রদানার্থ সাক্ষীকে অর্থ প্রদান করিতে কোন ঋষিরাজীবি মোক্তেলকে পরামর্শ দেয়, তাহাতে তাহার আইন বিগর্হিত খ্যাতি করা হয় না। বিচারকদের উভয়েই বারিষ্টার গার্থ সাহেবের এই প্রস্তাব ভ্রান্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং উকীলের আচরণের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। মুন্সেফ উকীলের পূর্ব্ব আচরণ অনিন্দিত বলাতে এবং

প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করাতে বিচারপতিগণ তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন,—তাঁহাকে দুই বৎসরকাল মাত্র ওকালতী ব্যবসায় হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন; নতুবা জজের অভিমতানুসারে চিরকালের জন্য তাঁহার ওকালতী করার অধিকার লোপ হইত।

সঞ্জীবনী।

সমালোচনা।

বীণাপাণি—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭।

নের পর আমরা বীণাপাণির সাক্ষাৎ পাইলাম। "বাঙ্গালা সাহিত্য মাজ" এবং "বুদ্ধদেব" এই দুইটি প্রবন্ধে নূতনত্ব না থাকিলেও ইহারা । বীণাপাণিতে গল্পের ঘটা ও কবিতার ছটা খুব বেশী। হউক, তত ক্ষতি নাই। কিন্তু "জীবনে মরণে" গল্পটি পড়িয়া যে স্তম্ভিত লেখক এ গল্পে কোনরূপ নীতিশিক্ষা দিতে প্রয়াস নাই। াবে গল্পটি বলা হইয়াছে, তাহা অতীব নিন্দনীয়। ভরসা করি, ল্পে আর বীণাপাণির অঙ্গ কলুষিত হইবে না।

রাগার দপ্তর।—আষাঢ় ১৩০৭। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পাই নাই। এ য়েকটি লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রিয়নাথ বাবুর লিখনভঙ্গী বড়ই চমৎকার। এ সংখ্যা এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া পড়িতে হয়। র যুদ্ধের ইতিহাস" লেখা খুব ভাল হইতেছে। তবে আমাদের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ারতি।—মাসিক পত্রিকা ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। আষাঢ়

"মহারাজ অশোক ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তৃতি" উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। অপৌরুষেয়" কি নহে, এ অনধিকার চর্চ্চা না করিলেই ভাল

ছায়া।—মাসিক পত্রিকা, ইহাতে গল্প আছে, সাহিত্য আছে আছে, অনেক কথা আছে। মোটের উপর ছায়া স্নিগ্ধ বলিয়া হইল।

যদুকুল ধ্বংস।—কাব্য। "সাবিত্রী"-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বাগচি প্রণীত। গ্রন্থকার ভক্ত, ভক্তিবশে ভগবানের শেষলীল করিয়াছেন। ভগবৎপ্রসঙ্গ সদাই সুমিষ্ট ও পাপক্ষয়কর। ভক্ত পুস্তক পাঠে প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই।

সাহিত্য সংহিতা।—রাজা বিনয়কৃষ্ণের সাহিত্য সভা প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। ছাপা, কাগজ ও বিষয় নির্ব্বাচন সকল কৃষ্ট। আজকাল যে সকল মাসিক পত্রিকা নূতন প্রকাশিত হইতে দের তুলনায় সাহিত্য সংহিতার স্থান অতি উচ্চে। এবার স বারান্তরে বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পূজার জন্য আমরা কার্ত্তিক সংখ্যা বীরভূমি কার্ত্তিক মাসে এ করিতে পারিব না। সুতরাং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা একত্র মাসের প্রথমেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীনীলরতন মুখোপা
সম্পাদক